ত্রিপুরার সেরা শিশুসাহিত্য

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ও পান্নালাল রায়
সম্পাদিত

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ও পান্নালাল রায় সম্পাদিত
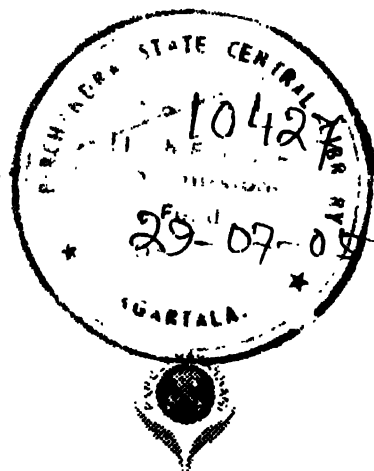
ত্রিপুরার সেরা শিশুসাহিত্য

পারুল প্রকাশনী
৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, ফোন ঃ ২২৪১ ৬৪৭৪
আখাউড়া রোড, আগরতলা-৭৯৯ ০০১, ফোন ঃ ২৩৮ ৬৯৪৭

ত্রিপুরার সেরা শিশুসাহিত্য
পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ও পান্নালাল রায় সম্পাদিত

প্রকাশিকা :
শ্রীমতীরত্না সাহা
আখাউড়া রোড, আগরতলা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :
সুব্রত মাজী

বর্ণসংস্থাপন :
সাপ্লাই সিন্ডিকেট
৮/৩, চিন্তামণি দাস লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রণে :
চৌধুরী অফসেট
কলকাতা- ৭০০০০৬

মূল্য : একশো টাকা

পাতায় পাতায়

রূপকথা-লোককথা

কবিতা ও ছড়া

নাটক ঃ

বিজ্ঞান ঃ

প্রসঙ্গত

ত্রিপুরার বেশির ভাগ মানুষই বাংলায় কথা বলেন। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া বাংলা ভাষার এমন বহুল চর্চা ও সরকারি স্বীকৃতি ভারতের আর কোথাও নেই। অথচ ত্রিপুরার সাহিত্য আজও আলোকিত নয়। এদেশের বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনাকালে ত্রিপুরার প্রসঙ্গ ভুলেও তোলা হয় না। ত্রিপুরার সাহিত্য বৃহত্তর অঙ্গনে একেবারেই অনালোচিত, অনালোকিত। এমনটি হওয়া বোধহয় অনুচিত। ভালো-মন্দ যা-ই হোক না কেন, আসুক আলোচনার আলোয়, আমাদের এই প্রত্যাশা।

মূল বাংলা সাহিত্যের যে ধারা, তা একদা ছিল রাজ-পোষিত। মধ্যযুগের দুই মুসলমান কবি দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওলের হাতে বাংলা-সাহিত্যের যে পালা-বদল, তাও ঘটেছিল আরাকানরাজের আনুকূল্যে। সংকীর্ণতা ধুয়েমুছে বাংলা সাহিত্য এসে দাঁড়িয়েছিল মানুষের মাঝে।

সূচনাপর্বে ত্রিপুরা সাহিত্যও ছিল রাজ-পোষিত। রাজারাই সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাঁদের আগ্রহ-আনুকূল্যে ত্রিপুরার সাহিত্য পুষ্ট হয়েছে। রাজ-আনুকূল্যে শুধু 'রাজমালা'-রচিত হয়নি, রাজা গোবিন্দমাণিক্য অনুবাদ করিয়েছেন একাধিক পুরাণ-গ্রন্থ। রাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য তো নিজেই ছিলেন সুকবি। ভালো ছবি আঁকতেন তিনি। বলা যায়, বীরচন্দ্রের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতা, সক্রিয় প্রয়াসের ফলে ত্রিপুরার সাহিত্যে প্রাণের সঞ্চার হয়। রাজা নিজে লিখেছেন, পরিবারের অনেককেই লেখায় উদ্বুদ্ধ-উৎসাহিত করেছেন। বিশেষ করে বীরচন্দ্র-কন্যা অনঙ্গমোহিনী দেবী কবি হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর কবিখ্যাতি ত্রিপুরার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

রাজাদের সাহিত্যপ্রীতি ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ বারবার তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। একবার দু'বার নয়, সাতবার ছুটে এসেছেন ত্রিপুরায়। প্রথম এসেছিলেন মহারাজ রাধাকিশোরের আমন্ত্রণে, ১৯০০ সালে। শেষ আসেন ১৯২৬-এ। ছাব্বিশ বছরে রাজা বদলালেও কবির প্রতি ভালোবাসায় চিড় ধরেনি। রাজপরিবার থেকে সাধারণ মানুষ — সকলেরই প্রাণের মানুষ ছিলেন কবি। তাঁদের প্রতি কবিরও ছিল অফুরান ভালোবাসা। কিশোর বয়সে ত্রিপুরারাজ বীরচন্দ্রের কাছে যে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন তিনি, তা কখনো ভোলেননি। ত্রিপুরার রাজকাহিনি নিয়ে রাজর্ষি, মুকুট ও বিসর্জন লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। কবির এই অনুরাগ ত্রিপুরাবাসীকে গৌরবান্বিত করেছে।

বীরচন্দ্রের আমলে ত্রিপুরার সাহিত্যে প্রাণের ছোঁয়া লাগে, প্রাণচঞ্চল-প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে সময় লেগেছে ঢের।

মহারাজ রাধাকিশোরের উদ্যোগে গড়ে ওঠে ত্রিপুরা সাহিত্য সম্মিলনী। ত্রিপুরা সাহিত্য সম্মিলনী-র সভায় সভাপতিত্ব করতে আসেন রবীন্দ্রনাথ। এই ঘটনা ত্রিপুরার মানুষকে নিশ্চয়ই স্পর্শ করেছিল। ১৯২৪-এ উমাকান্তএকাডেমির এক সভায় প্রতিষ্ঠিত হয় কিশোর সাহিত্য সমাজ। বছর দুয়েক পরে ওই

প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয় বহু আকাঙ্ক্ষিত পত্রিকা, 'রবি'। নরেন্দ্রকিশোর দেববর্মন ও কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্তর সম্পাদনায় প্রকাশিত এই রবি পত্রিকায় কে লেখেননি! রবীন্দ্রনাথ প্রায় নিয়মিত লিখতেন। রবির মলাট এঁকেছিলেন ত্রিপুরার কৃতী সন্তান ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা। রবি প্রকাশের আগে ত্রিপুরা থেকে কয়েকটি পত্রিকা বেরুলেও সেগুলি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠেনি। সেগুলি ছিল প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর পর্ব। বলা যেতে পারে, রবি-ই ত্রিপুরার প্রথম সর্বাঙ্গীণ সাহিত্য পত্রিকা। সেই শুরু, ধীরে ধীরে বেরিয়েছে আরও কয়েকটি পত্রিকা। নিস্তরঙ্গ সাহিত্যধারায় তরঙ্গ লক্ষ করা গেছে।

সব দেশে সব ভাষাতেই আগে পদ্য, পরে গদ্য। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। বাংলা কবিতার আদি উৎস চর্যাপদ, দশম-একাদশ শতাব্দীর সৃষ্টি। তুলনামূলকভাবে গদ্য অর্বাচীনকালের। বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী। প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে। ত্রিপুরার কাব্যসাহিত্য যথেষ্ট পুরোনো হলেও কথাসাহিত্যের পুষ্টি-সমৃদ্ধি তো হাল-আমলের। বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকে বিচ্ছিন্নভাবে কথাসাহিত্যের চর্চা শুরু, তা বেগবান হয় চারের দশকে, বিমল চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'জাগরণ' পত্রিকাকে ঘিরে। পাঁচের দশকে প্রকাশিত হয় বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা। বহু তরুণ কবি-লেখকের আবির্ভাব ঘটে। কেউ কেউ বেশ শক্তিমান, ধারাবাহিকভাবে তাঁরা ভালো লিখেছেন। প্রতিষ্ঠিতও হয়েছেন। ছয় ও সাতের দশকে আরও নতুন পত্রিকা বেরিয়েছে, সম্ভাবনাময় অনেক তরুণ কবি-লেখকদেরও দেখা মিলেছে। চলেছে নিরন্তর সাহিত্যচর্চা, ত্রিপুরার সাহিত্যধারা প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে। আটের দশকে ত্রিপুরার সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে মুক্ত বাতাস খেলে যায়। এই দশকের গোড়ায়, ১৯৮১ সালে শুরু হয় আগরতলা বইমেলা। এই বইমেলাকে ঘিরে ত্রিপুরার সাহিত্য আরও প্রাণবন্ত-প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। ত্রিপুরার মূল সাহিত্যধারা ধীরে ধীরে এগিয়েছে, লক্ষ্যে পৌঁছেছে। শিশুসাহিত্যের সূচনা হয়েছে বিলম্বে, এগিয়েছেও বিলম্বিত লয়ে।

১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয় ত্রিপুরার প্রথম ছোটোদের পত্রিকা 'কাকলি', পারুল দাশের সম্পাদনায়। কাকলির মূল দায়িত্বে ছিলেন চুনী দাশ। তিনি নিজেও ছোটোদের লেখক। ত্রিপুরার শিশুসাহিত্য প্রাণরসে উজ্জীবিত হয়েছে তাঁর আন্তরিক চেষ্টায়। নিজে লিখেছেন, কাকলিকে ঘিরে একটি শিশুসাহিত্যিক গোষ্ঠীও তৈরি করেছেন। তাঁরা অনেকেই পরবর্তীকালে হারিয়ে যাননি। নিয়মিতভাবে ছোটোদের জন্য লিখেছেন, লিখছেন।

অনঙ্গমোহিনী দেবী, গিরিজাভূষণ চক্রবর্তী বা কামিনীমোহন সেনের দু'চারটি কবিতা ছোটোদের কাছে বোধ্য হয়ে উঠলেও নিরবিচ্ছিন্ন শিশুসাহিত্যের চর্চা তখনো শুরু হয়নি। শুরু হয়েছে ওই কাকলির কালে। ত্রিপুরার বিশিষ্ট কবি অপরাজিতা রায় একটি প্রবন্ধে জানিয়েছেন ১৯৫০ সালের কাছাকাছি সময়ে জাগরণ পত্রিকায় প্রথম শিশুবিভাগ রাখা হয়।

ছয়ের দশকের শেষে উদিতি, দ্যুতি, স্বাগতম ও রাণার পত্রিকায় শিশুদের কথা ভেবে আলাদা বিভাগ রাখা হয়েছে। ১৯৫০-এ শিশু বিভাগের সূত্রপাত, শিশু-পত্রিকার আত্ম-প্রকাশ ১৯৭০-এ। শিশুবিভাগের পূর্ণতা পেতে, শিশুপত্রিকায় পরিণত হতে কুড়ি বছর সময়কাল যথেষ্ট বেশি। শিশুসাহিত্যের প্রাথমিক উপাদান রূপকথা-লোককথা বা লোকায়ত ছড়া মানুষের মুখে মুখে ত্রিপুরাতেও ইতস্তত ছড়িয়ে ছিল। সেগুলির দিকে কারও নজর পড়েনি।

কাকলি এখন আর বের হয় না। ত্রিপুরার শিশুসাহিত্যের বিকাশে এই পত্রিকাটির কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়।

কাকলি যেন খড়-বিচুলি দিয়ে কাঠামো তৈরি করে রেখেছিল। বিমলেন্দ্র চক্রবর্তীর ঝিনুক সেই কাঠামোয় মাটি-রং দিয়েছে, জীবন্ত করে তুলেছে। ঝিনুক প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে। সম্পাদক বিমলেন্দ্র

চক্রবর্তী নিজে ভালো লেখেন। পশ্চিমবঙ্গের শিশুসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ। ঝিনুক সম্পাদনায়, রচনাকর্মে যথেষ্ট আধুনিক তিনি। ত্রিপুরার শিশুসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অনিল সরকারের কথাও বলতে হয়। রাজনীতির এই ব্যস্ত মানুষটি সব ব্যস্ততা ভুলে নিয়ত ছড়া-কবিতা রচনা করে চলেছেন। তাঁর ছড়া-কবিতার বিপুল ভাণ্ডারের অনেকখানিই ছোটোদের।

ত্রিপুরায় ছোটোদের জন্য যাঁরা লেখেন, তাঁরা বেশির ভাগই শিশুসাহিত্যে নিবেদিতপ্রাণ নন। বাংলা শিশুসাহিত্যের মূল ধারার দিকে তাকালে আমরা দু'ধরনের লেখক দেখতে পাই। কেউ কেউ জীবনভর শুধুই ছোটোদের জন্য লিখতে অভ্যস্ত, আবার কেউ কেউ মূলত বড়োদের লেখক, বড়োদের লেখার ফাঁকফোকড়ে কখনো বা সম্পাদকের চাপে লিখে ফেলেন ছোটোদের লেখা। ত্রিপুরায় বিমল চৌধুরী, মীনাক্ষী সেন, জয়া গোয়ালা, সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল ভট্টাচার্য, শঙ্কর বসু, দেবব্রত দেব, নকুল রায় — বড়োদের লেখক হিসাবে চিহ্নিত। এঁরা অনেকেই ছোটোদের জন্যও ভালো গল্প লিখেছেন। কবি হিসাবে খ্যাত এমন কেউ কেউ ছোটোদের জন্যও ছড়া-কবিতা রচনায় সমানভাবে সিদ্ধহস্ত।

কাকলি ও ঝিনুকের পর ছোটোদের কথা ভেবে আরও কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। আবির্ভাব, জ্ঞানাঙ্কুর, শাশ্বত, অর্ঘ্য, সুড়সুড়ি, হাসির হুল্লোড়, কিশোর বার্তা, কিশোর সাথী, কিশলয় প্রভৃতি পত্রিকার অনেকগুলিই অধুনালুপ্ত। কয়েকটি অনিয়মিতভাবে এখনো প্রকাশিত হয়। ত্রিপুরার শিশুসাহিত্য প্রচার ও প্রসারে উল্লিখিত পত্রিকাগুলি কম-বেশি ভূমিকা রয়েছে। পত্রিকাগুলি ছোটোদের কবি-লেখকও অনেক তৈরি করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ নামী দৈনিকে ছোটোদের পাতা এখন আর নেই। এক সময় আনন্দবাজারে আনন্দমেলা বিভাগের পরিচালক বিমল ঘোষ ও যুগান্তরে ছোটোদের পাততাড়ির পরিচালক স্বপনবুড়ো যেভাবে লেখক তৈরি করেছেন, তা এই মুহূর্তে গল্পকথার মতো শোনাবে। ওই দুই দৈনিক এক সময় বহু ছোটোদের লেখক তৈরি করেছে। ত্রিপুরার প্রায় সব ক'টি দৈনিকেই রয়েছে শিশুসাহিত্যের জন্য বরাদ্দ সাপ্তাহিক-পৃষ্ঠা। দৈনিক সংবাদ, ডেইলি দেশের কথা, স্যন্দন, গণসংবাদ, ত্রিপুরা দর্পণ — বৃহত্তর পাঠকের দরবারে শিশুসাহিত্য পৌঁছে দিতে সতত সক্রিয়। এই পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করে সম্ভাবনাময় বহু লেখক উঠে আসছেন, শিশুসাহিত্যেরও প্রচার-প্রসার হচ্ছে। একদা দৈনিক ত্রিপুরা দর্পণ ও দৈনিক গণদর্পণ শারদীয় সংখ্যায় ছোটোদের বিভাগ যুক্ত করে যে দৃষ্টান্ত তৈরি করেছিল, তা আরও দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠেছে ডেইলি দেশের কথা-য়। ডেইলি দেশের কথা এখন শারদোৎসবের প্রাক্কালে 'শিশুমহল' নামে যে সংকলনটি প্রকাশ করে, তা যথেষ্ট আকর্ষণীয়। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের কয়েকজন লিখলেও ত্রিপুরার কবি-লেখকরাই প্রাধান্য পান।

এখন ত্রিপুরার প্রকাশকরা ছোটোদের উপযোগী বইও প্রকাশ করছেন। অধিকাংশ বই-ই বেরুচ্ছে বইমেলায়। বইয়ের অঙ্গসজ্জায় এসেছে আধুনিকতা, মুদ্রণে পরিপাট্য। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি অনুকূল। ত্রিপুরার শিশুসাহিত্য ক্রমেই বিকশিত হচ্ছে। যাবতীয় দুর্বলতা কাটিয়ে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। ত্রিপুরার শিশুসাহিত্য যে একেবারে ব্রাত্য নয়, এই সত্যটুকু বুঝিয়ে দেওয়ার তাগিদে সংকলনটির প্রকাশ-পরিকল্পনা। গ্রন্থ-নামে শিশুসাহিত্য শব্দটি ব্যবহার করা হলেও এ বইয়ের অনেক লেখাই কিশোর উপযোগী। শিশুসাহিত্য ও কিশোর সাহিত্যের মধ্যে আলাদা করে সীমারেখা টানার কোনো মানে হয় না। আমাদের শিশুসাহিত্যের অনেকখানিই তো কিশোর-মনের উপযোগী। শিশু বলতে যা বোঝায়, সেই বয়সের উপযোগী সাহিত্য পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই সুলভ নয়। এই সংকলনে এমন লেখাও রয়েছে, যা কিশোর-বয়সের কাছেই বেশি উপভোগ্য। ত্রিপুরায় ছোটোদের জন্য যাঁরা এখন লিখছেন, তাঁদের প্রায় সকলেরই লেখা রয়েছে। যোগ্যজন কেউ বাদ পড়ে থাকলে আগামী সংস্করণে তাঁর লেখা আমরা সাদরে গ্রহণ করব।
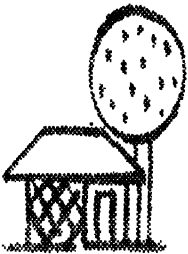
ছোটোদের জন্য আদৌ লেখা হয়নি, অথচ রচনার কোনো একটি অংশ ছোটোদের কাছে বোধ্য, তেমন লেখা আমরা রেখেছি। ত্রিপুরার যাঁরা বড়ো মানুষ, যাঁদের নিয়ে ত্রিপুরাবাসীর গর্বের অন্ত নেই, তাঁদের কারও কারও লেখা রাখা হয়েছে। তাঁদের কথা জেনে, লেখা পড়ে ছোটোরা এখন থেকেই তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবে।

ত্রিপুরার প্রাচীনত্ব নিয়ে কোনোও প্রশ্ন নেই, প্রাগৈতিহাসিককালেও ত্রিপুরার উল্লেখ দেখা যায়। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের যুক্তি ও বিশ্লেষণ মেনে নিয়ে বলা যায়, 'ভারতবর্ষে বর্তমানকালে যত রাজ্য বিদ্যমান আছে, তাহাদের মধ্যে ত্রিপুরার রাজবংশই প্রাচীনতম। আদিকাল হইতে ১৮৪ পুরুষের নাম আর কোনও বংশে একাধারে পাই না।' হোক না ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের এক ক্ষুদ্র রাজ্য, আয়তন ও লোক-সংখ্যার বিচারে ক্ষুদ্র হলেও ত্রিপুরা যথেষ্ট ঐতিহ্যবহ। রয়েছে কালজয়ী এক ইতিহাস।

১৯৪৯ সালে স্বাধীন ভারতের সঙ্গে একীভূত হলেও প্রথমে রাজ্যের মর্যাদা পায়নি ত্রিপুরা। ছিল কেন্দ্রশাসিত। অনেক পরে, ১৯৭২ সালে ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা পায়। পুরোনো ত্রিপুরার নিরিখে ত্রিপুরাবাসী অদ্বৈত মল্লবর্মনকে নিকটজনই ভাবেন। তিতাস একটি নদীর নামের অমর স্রষ্টার ছোটোদের উপযোগী একটি লেখা রাখতে পেরে আমাদেরও ভালো লাগছে। অদ্বৈত মল্লবর্মনের জন্ম ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গোকর্ণে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জন্মেছিলেন লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীও। অবশ্য ছোটোদের জন্য তিনি কিছু লেখেননি, সবই সাবালক পাঠ্য, মননসমৃদ্ধ। কুমিল্লাতে জন্মেছিলেন প্রাবন্ধিক নারায়ণ চৌধুরী। যাঁকে ঘিরে ত্রিপুরাবাসীর গর্বের অন্ত নেই, সেই শচীন দেববর্মনেরও ওই কুমিল্লাতেই জন্ম। দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনী 'সরগমের নিখাদে'-র অংশবিশেষ সংকলনভুক্ত করতে পেরে আমরাও গৌরববোধ করছি। কুমিল্লাতে জন্মেছিলেন আরও কত কৃতী মানুষ। যেমন, স্বল্পায়ু অজয় ভট্টাচার্য। মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বেঁচেছিলেন তিনি। বহু স্মরণীয় গানের স্রষ্টার একটি ছোটোদের উপযোগী কবিতা রাখা হল। পুরোনো ত্রিপুরার সীমা-পরিসীমা অনেক বিস্তৃত ছিল। সেই বিচারে শান্তিদেব ঘোষ ও সাগরময় ঘোষ ত্রিপুরারই মানুষ। তাঁদের জন্ম চাঁদপুরে। সঙ্গীতে শান্তিদেব, সাহিত্যে সাগরময় — দুই কৃতী মানুষের দু'টি লেখা সংকলিত করতে পেরে আমরাও আনন্দিত। শিশুসাহিত্যে নিবেদিত-প্রাণ হরেন ঘটক জন্মেছিলেন বিলোনিয়ায়। সঙ্গত কারণেই তাঁর ছড়াও রয়েছে এই সংকলনে।

এই সংকলনটির প্রস্তুতিকালে কয়েকটি গ্রন্থাগারের প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। আগরতলার রমাপ্রসাদ গবেষণাগার, নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন, কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও বেলুড় পাবলিক লাইব্রেরির সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ বিভাগের জনসংযোগ অধিকর্তা ও যুবমানস পত্রিকার সম্পাদক সৌমিত্র লাহিড়ী কয়েকটি দরকারি বই দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। ত্রিপুরার বিশিষ্ট ছোটোদের লেখক চুনী দাশ ও বিমলেন্দ্র চক্রবর্তীর সাহায্যের কথা ভোলার নয়। তাঁদের কাছে আমরা ঋণী। এ বই প্রকাশের আড়ালে যিনি রয়েছেন, সেই গৌরদাস সাহার কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ত্রিপুরার প্রতি তাঁর সুগভীর ভালোবাসা আমাদের মুগ্ধ করেছে।

আগরতলা বইমেলা,
২০০৫

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
পান্নালাল রায়

ডায়েরির পাতা থেকে

বীরবিক্রমকিশোর মানিক্য
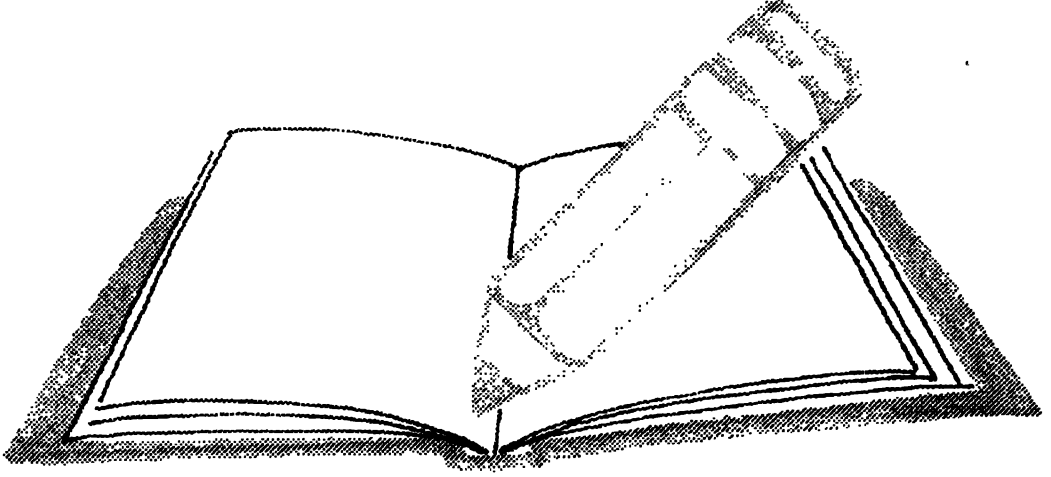
আজ সকালে ৯টায় ৺মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী দর্শন করিতে গমন করি। রাস্তায় অমরসাগর দিঘি দেখি। এত বড় দিঘি আমি কখনও দেখি নাই। আমার মনে হয়, ইহা লম্বায় প্রায় ১ (এক) মাইল। এই দিঘিটির ভিতর ১৬৫ কাণি জমি আছে কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমানে ইহার অবস্থা শোচনীয়। এই দিঘিটিকে পুনরায় তাহার পূর্ব অবস্থায় আনিতে হইলে ৪০।৫০ হাজার টাকার দরকার। রাস্তায় সুখ-সাগর জলাও দেখি। এখন ইহার প্রায় সম্পূর্ণটাই আবাদ হইয়াছে। কিন্তু D. O.-র নিকট শুনিতে পাইলাম যে, গত ২ বৎসর থেকে বর্ষাকালে গোমতীর জল এই জলাটিকে ডুবায় এবং ধান নষ্ট করে। জল নাকি মরা নদী দিয়ে জলায় প্রবেশ করে ; অতএব মরা গোমতী নদীটির সহিত যে স্থানে গোমতীর নদীর যোগ হইয়াছে, সেই স্থানে একটি বাঁধ প্রস্তুত করা হইলে আর জল আসিতে পারিবে না এবং জলাটি একটি প্রকাণ্ড ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইবে। ৺মাতার মন্দির উদয়পুর হইতে প্রায় ২৷৷০ মাইল, বর্তমানে একটি রাস্তা আছে, কিন্তু রাস্তাটি প্রশস্ত কম। ৺মাতার মন্দির ৺মহারাজ ধন্য মাণিক্যের কীর্তি। মার দর্শন করিয়া তথাকার সরকারি ব্রাহ্মণকে পূজার অনুমতি দিয়া দক্ষিণ চন্দ্রপুরের দিকে রওয়ানা হই এবং তথায় চন্দ্রসাগর ও ছত্রসাগর নামে ২টি দিঘি দেখি। দিঘিগুলির অবস্থা বড়োই শোচনীয়। ছত্র সাগরটি শুকিয়ে যাওয়ায় তথাকার (দক্ষিণ চন্দ্রপুরের) লোকের বড়ই জলকষ্ট হইয়াছে। ইহা ছাড়াও জঙ্গলি হাতির অত্যাচারে ঐ স্থানের লোকের ধান চাষ করা বড়ই কষ্টসাধ্য হইয়াছে। মাতার মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করিয়া মাতার নিকট বলি দেওয়া দেখি এবং বলির পর ৺মাতার পূজা করি। পূজার পর কালীবাড়ির পুকুরে গজার মাছের মাংস খাওয়া দেখি। এই সকল মাছ লোককে মোটেই ভয় করে না এবং পারের নিকট আসিয়া মাংস ইত্যাদি লইয়া যায়। ইহারা সর্বদাই যাত্রীদের নিকট হইতে খাদ্য পাইয়া থাকে। ৺রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর এই মন্দিরটিকে মেরামত করিয়া যান, তাহার পর মন্দিরটি মেরামত করা হয় নাই সুতরাং বর্তমানে ইহার অবস্থা একবারে খারাপ না হইলেও ভাল না। শ্রী শ্রীমতী মাতা মহারানিগণ ইচ্ছা করিলে কিছু টাকা দান করিয়া এই মন্দিরটি মেরামত করাইয়া দিতে পারেন।

উদয়পুর ফিরিতে প্রায় ১টা বাজে। দুপুরের খাওয়ার পর ২৷৷০ টায় D. O. আফিস পরিদর্শন করিতে Mr. Dash and Col. Pulley-র সহিত যাই। আফিস ঘরটি টিনের এবং বেশ বড়ো। ক্রমশ এই সকল আফিসগুলি

দালান করিয়া ফেলিলে ভাল হয়। বিকালে হাতিতে করে, একটু বাহির হই এবং রাধাকিশোর বাজার ইত্যাদি দেখি। বাজারটি সুন্দর। মধ্যে একটি প্রকাণ্ড রাস্তা ও রাস্তাটি সোজা। দুই পার্শ্বে দোকান। বাজারটি লম্বায় আধ মাইলের উপর হইবে। বর্তমান বাজারের আয় ৪০০।৫০০্ টাকা। একটি চান্দিয়ানা মহাল স্থাপিত হইলে আয় প্রায় ২০০্ বৃদ্ধি পাইবে। উদয়পুর Division-এ শালগড়া নামে আর একটি বাজার আছে। তাহাতেও চান্দিয়ানা মহাল নাই। সেখানে চান্দিয়ানা মহাল হইলে ৪০০্ টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে।

২৯-১-২৫ ইং

আজ সকালে ৬টায় Mr. Dash and Col Pulley-র সঙ্গে সুখ-সাগর জলায় শিকার করিতে যাই। অনেকগুলি হরিণ আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু একটি মাত্র মারা পড়ে। শিকার হতে ফিরিতে প্রায় ১টা বাজে। খাওয়া দাওয়ার পর আবার ২।৷০ টায় Mr. Dash ও Col. Pulley-র সঙ্গে থানা, স্কুল, ডিস্‌পেনসারি ও জেইল পরিদর্শন করিতে যাই। ঐ সকলের note Mr. Dash লিখেন, বিকালে হাতিতে একটু বেড়াইতে বাহির হই।

৩০-১-২৫ ইং

আজ সকালে ৯টায় ˚গোবিন্দ মাণিক্যের রাজবাড়ি দেখিতে যাই। রাজবাড়িটি একটি উচ্চ পাহাড়ে অবস্থিত, ইহার পশ্চিমদিকে গোমতী প্রবাহিত এবং অন্য দিকে খাল। ইচ্ছা করিলেই গোমতীর জলে খালটী পূর্ণ করা যায়। অতএব এই রাজবাড়িতে শত্রু প্রবেশ করিতে সহজে পারে না। উদয়পুরের পুরাণ দালানের মধ্যে এই রাজবাড়িটি সকলের চেয়ে বড়। ইহার বর্তমান অবস্থা একেবারে খারাপ হয় নাই। এই রাজবাড়িটিকে রক্ষা করা উচিত মনে করি। উদয়পুরে ফিরিতে ১টা বাজে। খাওয়া দাওয়ার পর Mr. Dash এবং Col Pulley-র সহিত আফিস পরিদর্শন করিতে যাই। Mr. Dash inspection note লেখেন। বিকালে হাতিতে করে বেড়াতে বাহির হই।

৩১-১-২৫ ইং

সকাল ৯টা হইতে ১০টা পর্যন্ত স্থানীয় জমিদার এবং ভদ্রলোকের সহিত দেখা করি। এখানে অনেক জমিদার আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই বাঙ্গালী ভদ্রলোক। সুখের বিষয়, জমিদারদের মধ্যে অনেকেই এ রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছেন। উদয়পুরের অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোকও স্থায়ী বসতি করিয়াছেন। ১০টা হইতে প্রায় ১২টা পর্যন্ত পার্বত্য প্রজা ও তাহাদের সর্দারদের সহিত দেখা করি। প্রায় তিনশত পার্বত্য প্রজা আসিয়াছিল।
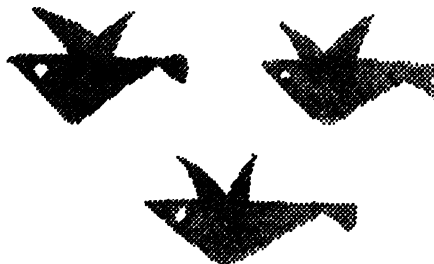
ছেলেবেলার দিনগুলি

শচীন দেববর্মণ
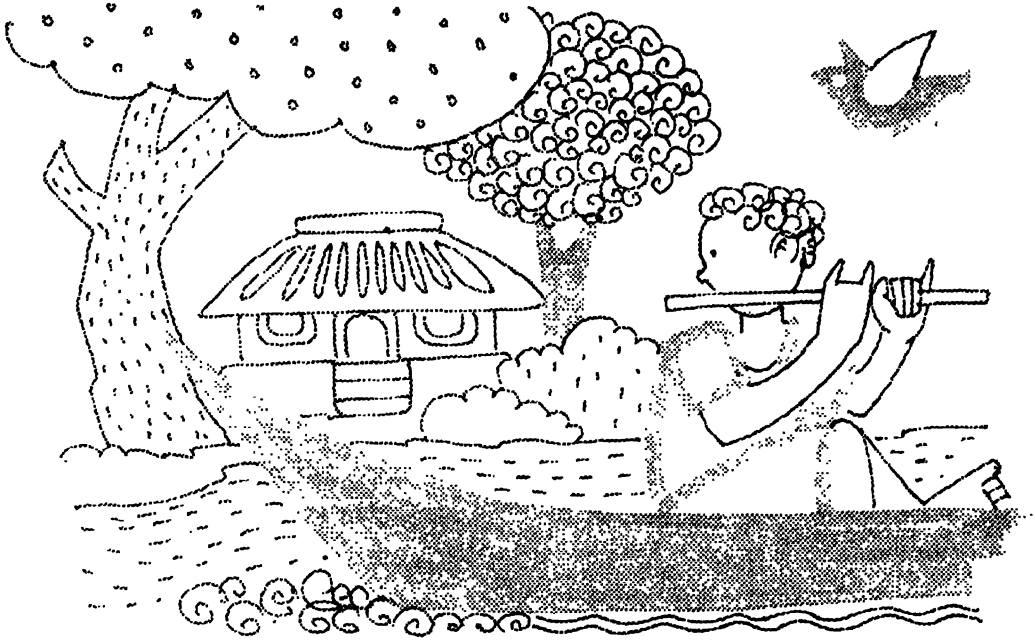
আমাদের প্রত্যেক ভাই-বোনের জন্য আলাদা আলাদা ধাই-মা ছিলেন। জন্মাবধি প্রাণ ঢেলে স্নেহ দিয়ে আমাদের তাঁরা লালনপালন করেছেন। আমার বৃদ্ধা ধাইমার নাম ছিল "রবির মা", নিজের ছেলের পরিচয়ে। আমি অবশ্য 'ধাই-মা' বলেই ডাকতাম। তিনি জন্মাবধি আমাকে সেবা যত্ন দিয়ে বড়ো করেছিলেন, তিনি যে রবির মা, না আমার মা তা কেউ পৃথক করে বলতে পারত না। ছেলেবেলায় আমার রঙ খুব ফর্সা ছিল বলে 'ধাই-মা' আমাকে বলতেন 'ডালিমকুমার'। ২৪ ঘন্টা তিনি আমাকে স্নেহের আঁচলে ঢেকে রাখতেন—জ্ঞান অবধি তাঁর হাতেই স্নান, খাওয়া, শোওয়া সব কিছু। কলেজ জীবনেও বাড়ি থেকে যখন বাইরে যেতাম, আমার পথ চেয়ে বসে থাকতেন। দেরী হলে তাঁর বকুনি শুনতে হত। পরে যখন ১৯২৫ সালে আমি কলকাতাতে স্থায়ীভাবে এসে বাস করছি, ধাই-মাও আমার সঙ্গে কলকাতা এসেছিলেন, কারণ আমাকে না দেখে তিনি থাকতে পারতেন না। দু-বছর আমার সঙ্গে থেকে ১৯২৭ সালে দেশে ফিরে গেলেন। বৃদ্ধা ধাই-মা দেশে ফিরেই রোগে আক্রান্ত হন এবং অল্প কয়েকদিন ভুগে ইহলোক ত্যাগ করেন। শেষ সময়ে আমার সঙ্গে তাঁর আর দেখা হয়নি আমি তখন কলকাতায়।

১৯২২ সালে আই. এ. পাশ করলাম। দাদারা সবাই বিদেশে থেকে লেখাপড়া করেন। আমিও এবার কলকাতা গিয়ে লেখাপড়া করব একথা বাবাকে বললাম। আসল কথা কলকাতা গিয়ে গান শেখার ইচ্ছাটাই তখন আমার প্রবল হয়ে উঠেছিল। বাবা আমাকে কাছছাড়া করতে রাজী হলেন না—"তুমি আমার ছোটো ছেলে, অন্য সবাই বিদেশে অন্তত আরও দুটি বছর তুমি আমার কাছেই থাকবে এটাই আমি চাই।" বাবার মুখ চেয়ে আমি কুমিল্লাতেই থেকে গেলাম তার ১৯২৩ সালে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হলাম, ভিক্টোরিয়া কলেজে। পূর্ববঙ্গের গ্রাম আকাশ বাতাস বোধহয় আমাকে ছাড়তে চাইল না। প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে থাকার আরও অবকাশ পেলাম। আমার পক্ষে একদিক দিয়ে ভালোই হল।

বি-এ পড়া আরম্ভ হল। কৈশোর পেরিয়ে এবার যৌবনে পদার্পণ করছি তা উপলব্ধি করলাম। নতুন উদ্দীপনায় ঘুরে বেড়াতাম গ্রামে মাঠে ঘাটে। ভাসাতাম নদীর জলে নৌকা, চাষি, জেলেদের সঙ্গ-বাউল, বোষ্টম, ভাটিয়ালি গায়ক ও গাজন দলের সঙ্গে ছুটির ফাঁকে কলেজ ফাঁকি দিয়ে সময় কাটাতাম গান গেয়ে, শিখে, শুনে আর তামাক খেয়ে। আমরা সবাই যে এক হুঁকোয় তামাক খেতাম, বাবা তা জানতেন না।

পূর্ববঙ্গের ওই অঞ্চলের এমন কোনো গ্রাম নেই বা এমন কোনো নদী নেই, যেখানে আমি না ঘুরেছি। ছুটি ও পড়াশোনার ফাঁকে আমি গান সংগ্রহ করতাম। আমার এখনকার যা কিছু সংগ্রহ, যা কিছু পুঁজি সে সবই ওই সময়কার সংগ্রহেরই সম্পদ। আজ আমি শুধু ওই একটি সম্পদেই সমৃদ্ধ, যে সম্পদের আস্বাদন করে আমার মনপ্রাণ এখনও ভরে ওঠে। যে সম্পদের জোরে আমি সুরের সেবা করে চলেছি—তার আদি হল আমার ওইসব দিনের সংগ্রহ ও স্মৃতি। সবরকম সুরই আমি রচনা করেছি, কিন্তু লোকসংগীতে আমার আত্মা যেন প্রাণ পায়। আমি যে মাটির মানুষের সঙ্গে তাদের সান্নিধ্যে প্রকাশিত হয়েছি, তাই তাদের সহজ সরল গ্রাম্য সুর আমার গলায় সহজে ফুটে ওঠে। সে সুরই আমার কল্পনার রাজ্য, আপনা থেকেই তা জাগে, গলায় আপনা থেকেই তা বেজে ওঠে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা গলায় এসে যায়। এর জন্য কোনো রেওয়াজ এর প্রয়োজন হয় না—এ সুর নিজের জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে। আমার মধ্যে রাজবাড়ির নিয়ম-কানুন আদব কায়দা বা ফরম্যালিটিজ কেউ খুঁজে পেত না। যে গ্রামের খোলা মাঠের সবুজ আমেজ পেয়েছে, যাকে বড় বড়ো প্রাচীন গাছগুলি ছায়ার আড়াল করে প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে, যে না জানি কিসের আকর্ষণে রাত্রেও গ্রামে গ্রামে কাটিয়েছে যেখানে দু-একটা কেরোসিনের পিদিম টিম্‌টিম্ করে সেই পরিবেশে যে নীল আকাশকে ভালোবেসেছে—যে গ্রামের সরল লোকেদের সঙ্গ মানিয়ে বসে মশগুল হয়ে গেছে—তাকে রাজবাড়ির আবহাওয়া বাঁধবে কি করে?

হিন্দিতে এক প্রবন্ধ আছে, 'রাগ, রসুই পাগড়ি—কভি কভি বন্ যায়।" (মানে গান-বাজনা, ভালো রান্না ও মাথায় ভালো পাগড়ি বাঁধা সব সময় সম্ভব নয়, কখনো কখনো তা হয়)। লোকসংগীতে এই প্রবাদ কিন্তু অচল। গ্রামের পরিবেশে বাউল বা ভাঁটিয়ালি সব সময়েই জমে যায়।

কলেজ-জীবনে প্রতি বছরই আমাদের নাটক প্রযোজনা হত। এই সব নাট্যাভিনয়ে আমি হতাম সংগীত পরিচালক। যতদূর মনে পড়ে আমাদের ইতিহাসের অধ্যাপক হতেন নাট্য পরিচালক। তিনি নিজে গান লিখতেন আমি সঙ্গে সঙ্গে সুর বসিয়ে দিতাম। কলেজে ছাত্রমহলে আমার তখন জয় জয়কার।

১৯২৪ সালে বি-এ পাশ করলাম। বাবা আমাকে কলকাতাতে নিয়ে এসে ১৯২৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়েছিলেন এম-এ পড়ার জন্য। আমি কলকাতায় বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে "ত্রিপুরা প্যালেস"-এ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষায় এম-এ-পড়তে শুরু করলাম। আমার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের পরিবর্তনে প্রথম দিকে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিলাম না। ইংরেজ আমলের জমকালো চমকপ্রদ কলকাতা শহর ঝলমল করতে লাগল আমার চোখে। দেখে অবাক হলাম। নিজেকে বোকা বলেও মনে হল শহরে এসে। মানুষের হাতের তৈরি সব কিছু আমার কাছে অস্বাভাবিক লাগল। সিমেন্ট ও পাথরের তৈরি কলকাতা পিচ ঢালা প্রশস্ত তার রাস্তাঘাট বিজলি বাতির রোশনাই-প্রথমটা এইসব দেখে কেমন যেন কৃত্রিম মনে হয়েছিল সবকিছু, হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। আরও অবাক হয়েছিলাম এই দেখে যে, কলকাতায় মাটি বিক্রি হয়। আমি যে মাটির মানুষ—সেই মাটি কলকাতা শহরে বিক্রি করা হয়—এবং তা লোকেও কেনে—এসব দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। সমস্ত দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে কেটে যেত। বাড়ি ফিরেই আকাশ দেখতে ইচ্ছা

হত। এত আলোর ঝলকে আকাশ যেন ম্লান হয়ে লুকিয়ে যেত। কবেই বা পূর্ণিমা, কবেই বা অমাবস্যা বিজলি বাতির কৃত্রিমতায় তা বুঝতে পারতাম না।

কলকাতায় এই পরিবেশে, সব সময় মনে পড়ত দেশের পুরানো দিনগুলি। আমাদের বাড়ির তিন-তিনটে দিঘির ধারে গান গেয়ে বেড়ান আর বাঁশি বাজান। ত্রিপুরাতে সবাই বাঁশি বাজাতে পারে এটাও একটা প্রবাদ। আমাদের দেশের বিশিষ্ট "টিপরাই বাঁশি" আমি জ্ঞান হওয়া অবধি বাজাতাম। গোড়ার দিকে এই স্মৃতিগুলি আমার মনে ব্যথা জাগাত। এই সব স্মৃতি নিয়েই ঘুমিয়ে পড়তাম। সকালে আবার যন্ত্রচালিতের মতো যন্ত্রের মানুষ হয়ে শহর কলকাতায় দিনের কাজকর্ম আরম্ভ করতাম।

কুমিল্লাতে কলেজে পাঠ্যাবস্থাতেই কলকাতা এসে হিন্দুস্থানী সংগীতের বড়ো বড়ো ওস্তাদের কাছে গান শোনা, তাদের কাছে গান শেখা আমার মনে প্রবলভাবে জেগেছিল। এম. এ. পড়তে আর ভালো লাগে না। এক বছর বাদে ছেড়েই দিলাম পড়াশোনা। ১৯২৫ সালে আমি অন্ধ গায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে-র নিকট হিন্দুস্থানী উচ্চ-সংগীত শেখা আরম্ভ করলাম। বাবার অনুমতি ছিল। কেষ্টবাবু আমাকে তাঁর প্রিয় শিষ্য করে নিলেন ও খুব যত্ন করে শেখাতে লাগলেন। কুমিল্লার টেনিস খেলার নেশাও ছাড়লাম না। চৌরঙ্গী ওয়াই এম সি এ-র সভ্য হয়ে নিয়মিত টেনিস খেলতাম। তখন ওয়াই এম সি-তে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের প্রাধান্য লক্ষ করেছিলাম। গোড়ায় তারা আমাকে খেলোয়াড় হিসেবে পাত্তাই দিত না। একদিন সেখানে এক দক্ষিণ ভারতীয় "মার্কার"-এর সঙ্গে পরিচয় হল। তারই পরামর্শে প্রত্যেকদিন দুপুরে দুটোর সময় মাঠে এসে তার সঙ্গে নিয়মিত অভ্যাস শুরু করলাম। তাকে রোজ আট আনা করে দিতে হত এবং সে আমাকে এক ঘন্টা অভ্যাস করার সুযোগ দিত। এতে আমার খেলার খুব উন্নতি হল ফলে সব সভ্যরাই পরে আমার সঙ্গে খেলতে চাইত। এর পরে আমি সাউথ ক্লাবের সভ্য হলাম। এত বেশি খেলতাম যে খেলার পরে আমার গলা বসে যেত গলা কর্কশ হয়ে যেত। সন্ধ্যার পরে গানের রেওয়াজ করতে গিয়ে দেখতাম আমার গলা বেশ ধরে গেছে। আমার গলার যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে কেষ্টবাবুর খুব লক্ষ ছিল। তিনি আমার গলা ধরার কারণ ধরে দিলেন, বললেন, টেনিস খেলা বন্ধ করতে। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গে টেনিস খেলা ছেড়ে দিলাম। তারপর প্রায় দু-সপ্তাহের মধ্যেই আমি আমার স্বাভাবিক স্বর ফিরে পেলাম। কেষ্টবাবু আমার গলার স্বর বাঁচিয়ে রাখলেন। কেষ্টবাবুর গান শেখানোর পদ্ধতি ছিল অতি সুন্দর। তিনি তাঁর বন্ধুদের কাছে বলতেন যে ভবিষ্যতে আমার গানের উন্নতি অনিবার্য। রেওয়াজ ছিল অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু কখনও অত্যধিক কিছু করা কেষ্টবাবু অপছন্দ করতেন এবং আমাকেও তা করতে মানা করতেন।

বাবা দুঃখ পেয়েছিলেন এম-এ পড়া ছেড়ে দিলাম বলে। এরপর বাবা একবার কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি তখন আমাকে জোর করে 'ল' কলেজে ভর্তি করিয়ে দিয়ে' আগরতলায় ফিরে গেলেন। আইনের মারপ্যাঁচ আমি কি পড়ব, ওইসব বই দেখলেই আমার মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করত। মাথায় আইনের কিছুই ঢুকত না। অল্প কয়েকমাস পর আইন অধ্যয়ন ত্যাগ করলাম। এবার বাবা আমাকে বিলেতে পাঠিয়ে স্টেট-এর কাজকর্ম প্রশাসন শেখাবার জন্য তৈরি করতে চাইলেন। বাবা তখন ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রী। আমার জন্য রাজ্য সরকারে বড় পদ তিনি ঠিক করে রাখলেন। তখন আমার মনে কি প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল, তা বলা যায় না। বাবাকে ভালোবাসি শ্রদ্ধা করি। একদিকে তাঁর ইচ্ছা পূরণ—অন্যদিকে যা আমার দ্বারা কখনও সম্ভব নয়। কিন্তু যাই হোক, বাবা শেষ পর্যন্ত আমার ইচ্ছাই মেনে নিলেন। বিলেতেও গেলাম না রাজ্য সরকারে চাকরিও নিলাম না। কলকাতায় কেষ্টবাবুর কাছে এবং পরে তাঁর অনুমতি নিয়ে তাঁর গুরু ওস্তাদ বাদল খাঁ সাহেবের কাছে গান শিখতে লাগলাম।

আমার শান্তিনিকেতন আগমন

শান্তিদেব ঘোষ

আমার জন্মের ছ'মাস পর ১৯১০ সালে ঠাকুরমা এবং আমার মা-সহ আমি প্রথম শান্তিনিকেতনে আসি। মা'র কাছে শুনেছি, শান্তিনিকেতনে আমরা প্রথম যে বাড়িটিতে উঠেছিলাম, সেটি ছিল নীচুবাংলার দ্বিজবিরাম'-এর পূর্ব দিকে যে রাস্তাটি বোলপুরের রাস্তায় গিয়ে মিশেছে, সেই রাস্তার গায়ে উত্তর দিকে দক্ষিণমুখো খড়ের চালা বারান্দাযুক্ত মাটির বাড়ি। এখনও সেটি আছে। কিন্তু বর্তমানে সেটিকে নানা রকমের বড়ো গাছ ও আগাছায় ঘিরে ফেলেছে, রাস্তা থেকে কেবল চালাটাই দেখা যায়। এখন ওই বাড়িটিকে বিশ্বভারতীর একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী তার গোরু-ছাগল নিয়ে সপরিবারে বাস করছে।

মা'র মুখে শুনেছিলাম, আমরা শান্তিনিকেতনে আসার পর গুরুদেব বাবাকে বলেছিলেন, তাঁর মা-সহ স্ত্রী-পুত্রকে একবার যেন তাঁর কাছে নিয়ে আসেন, তিনি সকলকে দেখতে চান। গুরুদেব তখন থাকতেন 'দেহলি' বাড়ির দোতলায়। পরের দিন বাবা সকলকে নিয়ে গুরুদেবের কাছে যাবার পূর্বে, ঠাকুরমা তাঁর ছ'মাসের নাতির পায়ে, হাতে ও গলায় আমাদের দেশের গ্রামে যেভাবে শিশুদের মুখেভাত বা অন্নপ্রাশনের সময় অলংকার দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হত,

সেইভাবে আমাকে সাজিয়ে দিলেন। মা গ্রামের বধূদের মতো শাড়ি পরে, প্রায় চোখের উপর পর্যন্ত ঘোমটা টেনে, আমাকে কোলে নিয়ে বাবা ও ঠাকুরমার সঙ্গে গুরুদেবের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করার পর, আমার মোটাসোটা কালো চেহারা দেখে গুরুদেব বাবাকে বলেছিলেন, তাঁর পুত্রটি নাকি 'বালকৃষ্ণ'—এ কেষ্টঠাকুরকে কোথায় পেলে! আমাকে তাঁর কোলে নিতে চাইলেন। আমার বাবার মতো ফর্সা রঙ নিয়ে আমি জন্মাইনি। স্বাস্থ্য খুবই ভালো ছিল। বেশ একটু মোটাসোটাই ছিলাম। আমাকে গুরুদেবের কোলে মা খুবই শঙ্কিতচিত্তে তুলে দিয়েছিলেন। কারণ, ছ' মাসের শিশু—মা'র কোল ছেড়ে অন্য কোলে গিয়ে যদি ছটফট করি, কিংবা কান্নাকাটি করি, অথবা যদি গুরুদেবের কোল ভিজিয়ে দিই, তা হলে তাঁর পক্ষে তা যে কতখানি লজ্জার বিষয় হবে, সে কথা ভেবে। আমি যতটুকু সময় গুরুদেবের কোলে ছিলাম, তখন নাকি খুবই শান্ত ছিলাম। ছটফট বা কান্নাকাটি কিছুই করিনি, গুরুদেবের কোলও ভিজিয়ে দিইনি। মা প্রায় দমবন্ধ করে একদৃষ্টে গুরুদেব ও আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। বাবার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আমাকে মা'র হাতে তুলে দিলেন গুরুদেব। মা'র তখন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মতো মানসিক অবস্থা। গুরুদেবের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর মা ও ঠাকুরমা মনে পরম তৃপ্তি নিয়ে সেদিন ফিরেছিলেন।

পরে বাল্যবয়সে ঠাকুরমার কাছে শুনেছিলাম তাঁর সঙ্গে গুরুদেবের প্রথম দর্শনের অভিজ্ঞতার কথা। সেদিন গুরুদেবের ঋষিতুল্য চেহারা এবং কথাবার্তা শুনে তিনি খুবই মুগ্ধ হন। রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণাদির গল্প এবং প্রাচীন কালের মুনিঋষি, তাঁদের আশ্রম সম্পর্কে অনেক কিছু শুনে তাঁর মনের মধ্যে সেগুলির সম্পর্কে যে ছাপ পড়েছিল, শান্তিনিকেতনের চারিপাশের নির্জন বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝে নানাপ্রকার গাছপালা পরিপূর্ণ শান্ত পরিবেশে গুরুদেবকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি যেন সেই প্রাচীন যুগের মতো একজন মুনিঋষিকেই দেখলেন। শান্তিনিকেতন যেন তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি আশ্রম—এখানে ছাত্রদল ও শিক্ষক-কর্মী পরিবেষ্টিত হয়ে প্রাচীন যুগের আশ্রমগুরুরূপে তিনি বিরাজ করছেন। এছাড়া এই বিদ্যালয়টিকে সকলে বলছেন, 'আশ্রম' এবং প্রতিষ্ঠাতাকে বলেছেন 'গুরুদেব'। আমাদের বাবা যে এইরূপ এক আশ্রমগুরুর আশ্রয়ে আছেন, প্রত্যক্ষভাবে তার পরিচয় পেয়ে ঠাকুরমার মন আনন্দে ভরে গিয়েছিল।
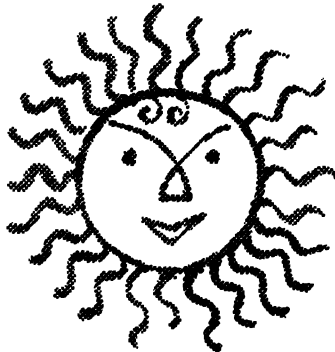
সুজামসজিদ্

সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণ
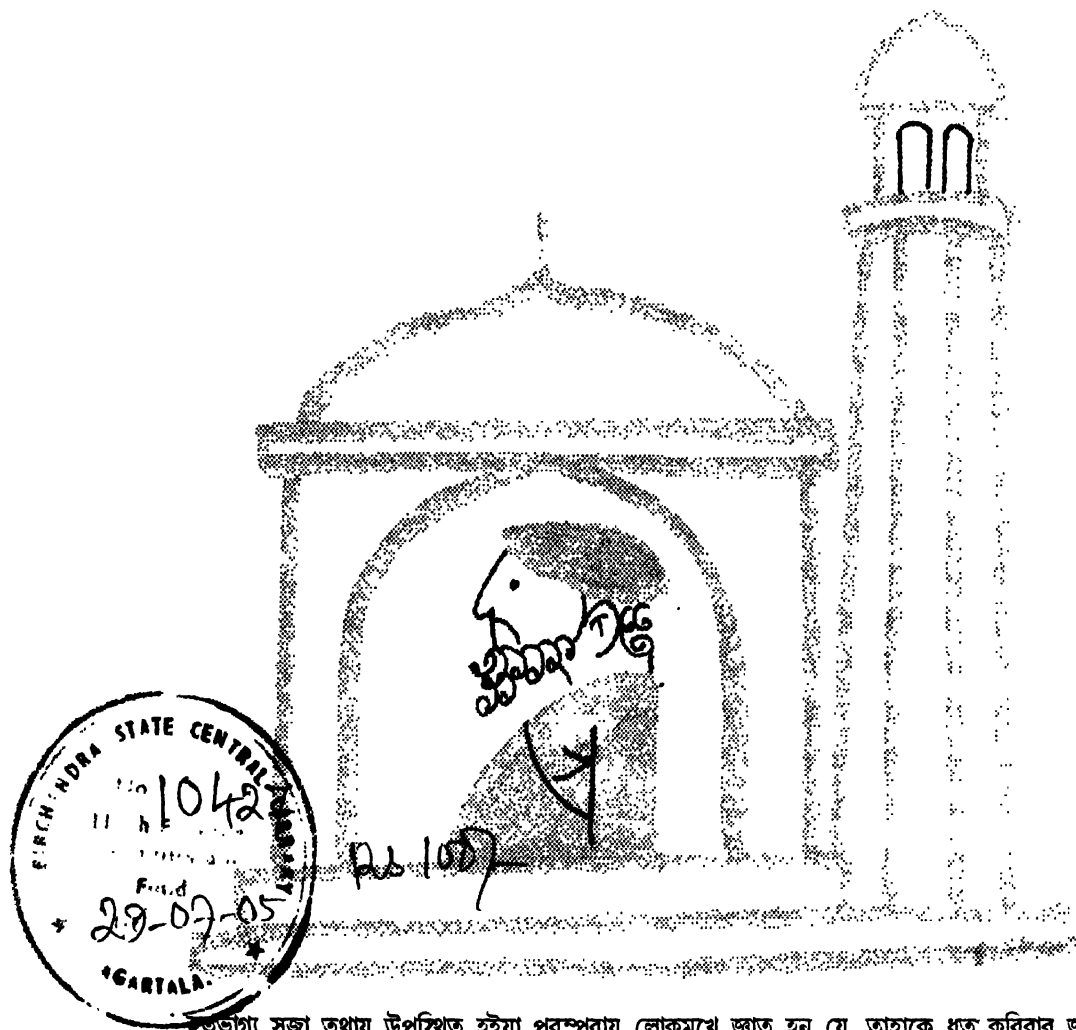
হতভাগ্য সুজা তথায় উপস্থিত হইয়া পরম্পরায় লোকমুখে জ্ঞাত হন যে, তাহাকে ধৃত করিবার জন্য ঔরঙ্গজেব গোবিন্দ মাণিক্যকে সানুনয়ে এক লিপি প্রেরণ করিয়াছেন, এবং সেই লিপি তৎকালের ত্রিপুর-রাজ্যাধিকারী ছত্র মাণিক্যের হস্তগত হইয়াছে। তখন প্রাণ ভয়ে তিনি ত্রিপুরা হইতে পলায়ন পূর্বক রাজ্যচ্যুত গোবিন্দ মাণিক্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া তদীয় আশ্রয় প্রার্থী হন। সে সুজা একদা গোবিন্দ মাণিক্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, কালের কুটিলচক্রে সেই সুজাই আজ জীবনরক্ষার্থে গোবিন্দ মাণিক্যের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইয়াছিল—ইহাকেই বলে বিধিবিড়ম্বনা।

বর্ণিত ঘটনার সময় (১০৭০ ত্রিপুরাব্দ) গোবিন্দ মাণিক্য তাঁহার বৈমাত্রের ভ্রাতা ছত্র মাণিক্যের চক্রান্তে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশে বাস করিতেছিলেন। তথায় তিনি সুজাকে আশ্রয় প্রদান পূর্বক "রসাঙ্গ" বা আরাকান প্রদেশে গমন করেন। ইহার কিয়দ্দিবস পর সুজাও গোবিন্দ মাণিক্যের অনুবর্তী হন।

একদা রসাঙ্গের অধীশ্বর ও গোবিন্দ মাণিক্য একত্রে উপবেশন পূর্ব্বক বাক্যালাপ করিতেছেন—এমন সময়ে সুজা তথায় উপস্থিত হইলে, পূর্বপরিচয় থাকা বশত গোবিন্দ মাণিক্য তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করেন। তাহা পর্যবেক্ষণ করিয়া—জনৈক ম্লেচ্ছ যবনকে এবংবিধ সম্মান প্রদর্শন করিবার কারণ কি—এই কথা রসাঙ্গের অধিপতি গোবিন্দ মাণিক্যকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তৎসমীপে সুজার কুলমর্যাদার পরিচয় প্রদানপূর্বক তাহার সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করেন।

এই বিষয়ে বঙ্গভাষায় রচিত ত্রিপুররাজ-বংশচরিত রাজমালায় নিম্নরূপ লিপিবদ্ধ আছে।

ঔরঙ্গজেব বাদসা তখনে হৈল।
রাজ্য ভ্রষ্ট হৈয়া সুজা রসাঙ্গেতে গেল।
গোবিন্দ মাণিক্য রাজা সেই স্থানে ছিল।
হেন কালে সুজা বাদসা উপস্থিত হৈল।
ত্রিপুর রসাঙ্গ রাজা বৈসে সিংহাসনে।
বাদসা দেখিয়া ত্রিপুর উঠিল তখনে॥
সিংহাসন হৈতে লামে ত্রিপুর-রাজন।
সুজা বাদসা সিংহাসনে করিল স্থাপন॥
রসাঙ্গের মহারাজ বলিল আপন।
কি কারণে ম্লেচ্ছ রাজা দিছ সিংহাসন॥
রাজা বলে নরেশ্বর করি নিবেদন।
এহিত সুজা বাদসা বিখ্যাত ভুবন॥

রাজমালা—গোবিন্দ মাণিক্য খণ্ড

আরাকান অধিপতি সুজার প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে সাদরে সম্ভাষণ করেন এবং এতদ্ব্যতীত গোবিন্দ মাণিক্যের সকরুণ অনুরোধে বশীভূত হইয়া তিনি সুজাকে আশ্রয় প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন।

গোবিন্দ মাণিক্যের এবম্ভূত সৌজন্যের বিনিময়ে সুজা তদীয় কটা-বন্ধ সংলগ্ন দুষ্প্রাপ্য পারস্য দেশীয় তরবারি এবং মূল্যবান হীরকাঙ্গুরী উন্মোচন পূবর্বক এই কথা বলিয়া সবিনয়ে গোবিন্দ মাণিক্যকে প্রদান করেন—"ভারত সম্রাটের পুত্র হইয়াও অদৃষ্ট দোষে আজ আমি পথের ভিখারি, এই দুইটি ব্যতিরেকে আপনাকে প্রদান করিতে পারি এমন কোন দ্রব্য এক্ষণে আমার নিকট নাই, অতএব আপনার অনুপযুক্ত হইলেও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ ইহাই আমি আপনাকে উপঢৌকন প্রদান করিতেছি, অনুগ্রহ পূর্বক এই যৎসামান্য দ্রব্যদ্বয় গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন।"

যে অসিটী সুজা-কর্তৃক গোবিন্দ মাণিক্যকে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি ত্রিপুরাধিপতিগণের নিকট বর্তমান আছে।

শাহজাদা সুজা ও গোবিন্দ মাণিক্য উভয়েই এক সময়ে এবং এক-ই বিষয়ে জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হন। সুজার পক্ষে দিল্লির সিংহাসন লাভ করা দূরের কথা—তাঁহার আর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করা ভাগ্যে ঘটে নাই; আরাকানেই তিনি নিহত হন। কিন্তু ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু নৃপতি গোবিন্দ মাণিক্য পুণ্যবলে পুনরায় রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ত্রিপুরাধিপতি গোবিন্দ মাণিক্য ১০৭৬ ত্রিপুরাব্দে (১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দ) পুনরায় রাজদণ্ড ধারণ করিলে বিবৃত

ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ কুমিল্লা নগরীর উত্তর প্রান্তে প্রবাহিত গোমতী নদীর তীরবর্ত্তী "সুজামস্‌জিদ্" নামক শাহজাদা সুলতান মহম্মদ সুজার নামসমন্বিত মুসলমানগণের সুপ্রসিদ্ধ ভজনালয়টী নির্মাণ করিয়াছিলেন। এবং যে ভূমিখণ্ডের উপর বর্ণিয়মান মস্‌জিদটী নির্মিত, তৎ-কর্ত্তৃক তাহাতে সুজার নামানুসারে একটা গঞ্জ স্থাপিত হইয়া সুজাগঞ্জ আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছিল।

"গোমতী নদীর কুলে মজিদ স্থাপিয়া।
সুজা বাদসার নামে মজিদ করিয়া ॥
সুজা নামে এক গঞ্জ রাজা বসাইলা।
সুজাগঞ্জ নাম বলি তাহার রাখিল ॥"

রাজমালা—গোবিন্দ মাণিক্য খণ্ড

ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িত যে সমূদয় কীর্ত্তিমালা এতদঞ্চলে অবস্থিত তন্মধ্যে ইহা অন্যতম। বর্ণিত মসজিদ নির্মিত হওয়ার পর অবধি এযাবৎ ইহার রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই ত্রিপুররাজ্য হইতে সম্পাদিত হইতেছে।

সুজাকে ধৃত করিবার জন্য ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক গোবিন্দ মাণিক্যের নিকট যে এক লিপি প্রেরিত হইয়াছিল বলিয়া পূবের্ব কথিত হইয়াছে, সেই পত্রের প্রতিলিপি এবং তাহার বঙ্গানুবাদ এই পুস্তকের পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।
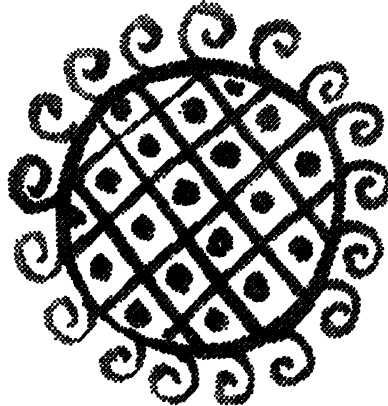
ফুলকুমারী

কালীপ্রসন্ন সেন
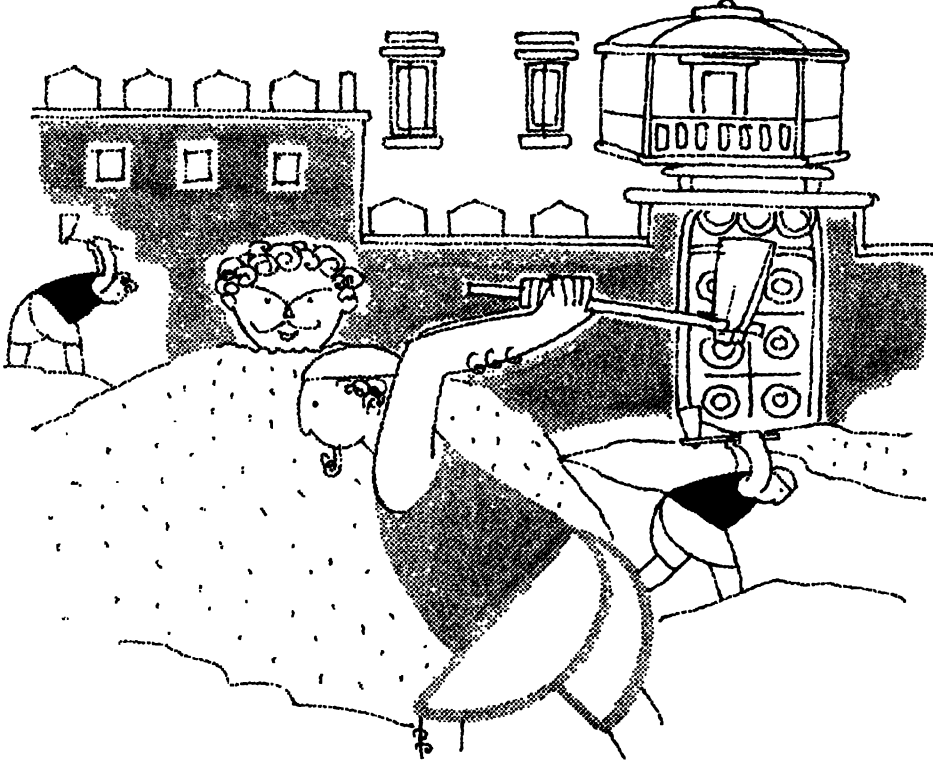
ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত শ্রী রাজমালা তৃতীয় লহরে, অমর মাণিক্য খণ্ডে লিখিত আছে,—

"ফুল কোয়ড়ি ছড়া নাম তাহার নিকট।
তার তীরে দুইবৃক্ষ আছিলেক বট।" ইত্যাদি।

অমর মাণিক্য খণ্ডে—২২ পৃষ্ঠা।

'ফুলকুমারী' শব্দকে এস্থলে 'ফুল কোয়ড়ি' করা হইয়াছে। ১৩০২ ত্রিপুরাব্দের ফাল্গুন মাসে, তদানীন্তন সহকারী রাজস্ব সচিব স্বর্গীয় কিশোরী মোহন ঠাকুর মহোদয়ের সহযাত্রী হইয়া সরকারি কার্যোপলক্ষ্যে প্রথম উদয়পুর দর্শনের সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। তৎকালে নগরীর চতুর্দ্দিক গভীর জঙ্গালকীর্ণ থাকায়, আশপাশের প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি সম্যকরূপে দেখা যাইতে পারে নাই। কিন্তু, সেই যাত্রায়ই ফুলকুমারী মৌজা, ফুলকুমারী ঘাট, ফুলকুমারী ছড়া, ফুলকুমারী কুঞ্জ প্রভৃতি নাম শ্রবণ করিয়া, 'ফুলকুমারী' নামোৎপত্তির কারণ অনুসন্ধানের জন্য কৌতূহলাবিষ্ট হইয়াছিলাম। অনেককে জিজ্ঞাসা বাদের পরে জানা গেল, খিলপাড়া গ্রামে অতি বৃদ্ধ একটা মুসলমান বাস করিতেছেন; তিনি উদয়পুরের অনেক পুরাতন ঘটনার সংবাদ অবগত আছেন, সম্ভবত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে এ বিষয়ের তথ্য জানা যাইতে পারে। কিন্তু তিনি চলচ্ছক্তি বিহীন স্থবির।

রাজস্ব সচিব মহোদয়ের অভিপ্রায়ানুসারে অনেক চেষ্টার পর, পালকি দ্বারা আমাদের অবস্থিতি স্থানে

আনা হইল। তাঁহার নাম মহম্মদ হাছিম, তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম একশত বৎসরের কাছাকাছি ছিল, তিনি শতাধিক বৎসর জীবিত থাকিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্ব পুরুষ লাহোর দেশ হইতে সমাগত বলিয়া সমাজে তৎবংশের সম্মান যথেষ্ট আছে। বৃদ্ধটি উদয়পুরের অনেক প্রাচীন কাহিনি বলিলেন, এই সুযোগে আমি অনেক কথা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, রাজমালা সম্পাদন কার্য্যে তাহা প্রয়োজনে লাগিতেছে।

'ফুলকুমারী' শব্দ উদ্ভবের কোনো বিবরণ জানা থাকিলে তাহা বলিবার নিমিত্ত বৃদ্ধকে অনুরোধ করা হইল। তিনি কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর বলিলেন, "এতৎ সম্বন্ধীয় একটি কিম্বদন্তি আমার পিতার নিকট শুনিয়াছিলাম, তাহাই বলিতেছি।" এই ভূমিকার পর বৃদ্ধ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

ফুলকুমারী নামে এক রাজকন্যা ছিলেন। উদয়পুর নগরীর উপকণ্ঠস্থিত বর্তমান ফুলকুমারী মৌজায় তাঁহার বাড়ি ছিল। একদা মহারাজ (উক্ত কুমারীর পিতা) কুমারীর বাস ভবনের সন্নিহিত স্থানে একটি দীর্ঘিকা খনন কার্য আরম্ভ করেন। খনিত মৃত্তিকা কুমারীর বাড়ির সীমান্তবর্তীস্থানে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। রাজ জামাতা অতিশয় উগ্র প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁহার বাড়ির উপর মৃত্তিকা ফেলিতে দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং খনন কারীদিগকে সেই স্থানে মৃত্তিকা ফেলিতে বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিলেন ; সুতরাং তাহারা কার্য স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইল। এই সংবাদ রাজার গোচর হইলে, তিনি জামাতার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়া আদেশ করিলেন,— "যে স্থানে মাটি ফেলা হইতেছে সেই স্থানেই ফেলা হইবে, এ বিষয়ে কাহারও আপত্তি শুনা যাইবে না।" রাজাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া এবং মৃত্তিকা খনন কারীদিগকে পুনর্বার কার্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া, রাজ-জামাতার ক্রোধের মাত্রা অতিশয় বৃদ্ধি পাইল, যেখানে মাটি ফেলা হয় তিনি সেই স্থানেই যাইয়া বসিয়া পড়িতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন—"যদি এখানে মাটি ফেলাই রাজার অভিপ্রেত হইয়া থাকে, তবে আমার মাথার উপরে ফেল, আমি কিছুতেই এই স্থান ত্যাগ করিয়া উঠিব না।" আবার কার্য বন্ধ হইল, —রাজ দরবারে সংবাদ গেল। অবাধ্যতা দর্শনে মহারাজ কোপাবিষ্ট হইয়া আদেশ করিলেন—"জামাতাকে সরিয়া যাইবার নিমিত্ত বিশেষ করিয়া বলা হউক, তদনুসারে সে স্থানে ত্যাগ না করিলে তাহার উপরই মাটি ফেলিতে হইবে।" জামাতাও ছাড়িবার পাত্র নহেন, এবম্বিধ আদেশ প্রাপ্ত হইয়াও তিনি স্থানত্যাগ করিলেন না, পূর্ব্ববৎ উপবিষ্ট থাকিয়া মৃত্তিকার চাপে নরলীলা সাঙ্গ করিলেন।

এই দুর্ঘটনায় সদ্য শোকসন্তপ্তা রোরুদ্যমানা রাজকন্যা পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন—"আমার সমস্ত সুখ শান্তি চিরজীবনের তরে নির্মূল হইল। আমি নিঃসন্তান, সুতরাং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমার নাম পর্যন্ত বিলুপ্ত হইবে, ইহাই অধিকতর দুঃখের কথা।"

কন্যার দুর্গতি দর্শনে পিতার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল, তিনি কুমারীকে প্রবাধ বাক্যে বলিলেন,—"মা তোমার স্বামীর অবিমৃষ্যকারিতার ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, সেজন্য তুমি দুঃখিতা হইও না, তোমার নাম যাহাতে চিরস্মরণীয় হয়, আমি তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।"

পতিহন্তা পিতার বাক্যে রাজকন্যা প্রবুদ্ধা হইতে পারিলেন না। তিনি স্বীয় ভবনের সন্নিহিত গোমতী নদীতে নিমজ্জিত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। এই ঘটনায় রাজা অত্যন্ত দুঃখিত এবং স্বীয় নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হইলেন। তিনি কন্যার নাম স্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে কন্যার বসতি স্থানের নাম ফুলকুমারী মৌজা, তাঁহার জীবন বিসর্জ্জনের ঘাটের নাম ফুলকুমারী ঘাট, তৎসন্নিহিত একটি ছড়ার নাম ফুলকুমারী ছড়া এবং একটি মনোজ্ঞ টীলায় অবস্থিত কুঞ্জবনের ফুলকুমারী কুঞ্জ নাম প্রদান করিলেন। তদবধি ঐ সকল নাম অক্ষুণ্ণ থাকিয়া কুমারীর স্মৃতি রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

ছোটোদের ছবি আঁকা

অদ্বৈত মল্লবর্মন

শিশুটি আপন মনে কত কি বকে গেল, তার এক বর্ণও বুঝলাম না? কি বা সুর। না আছে খাদ, না আছে নিখাদ আবোল তাবোল কথাগুলো তারই ছকে ফেলে এক দুপুরে বসে বসে গাইল, শেষে আপনি এক সময় গান বন্ধ করে উঠে গেল। তারপর কি বা ছবির ছিরি। মাথা নাই মুন্ডু নাই তার। নখ দিয়ে মাটির উপর তাই বসে বসে আঁকল। চেয়ে চেয়ে দেখল। তারপর মুছে ফেলে উঠে গেল। রইল না কোনো চিহ্ন।

তার কথা বুঝলাম না, সুর বুঝলাম না, আঁকাবুকিগুলো বুঝলাম না। কিন্তু ভালো লাগছে না এটুকুও জোর করে বলতে পারি কি যে, একেবারেই একঘেয়ে, বিরক্তিকর লেগেছে? ভগবান তাকে শিশু করেছেন বলেই, তার ভেতরে যে সম্পদ দিয়েছেন তাও শিশু, তাই তার আয়োজিত আনন্দের পসরা বয়স্কের নিকট অকিঞ্চিতকর, কিন্তু ভালো-লাগার বুদ্ধিটুকু দিয়ে তাকে গৌরবান্বিত করতে সৃষ্টিকর্তার ভুল হয়নি।

সে যতদিন শিশু থাকে, প্রকৃতির সঙ্গে থাকে তার নিবিড় যোগাযোগ। বুদ্ধি পেকে ওঠেনি বলেই সে শিশু। কাজেই কোনো কিছু বুদ্ধি দিয়ে বিচার করার ক্ষমতা তার থাকে না। প্রকৃতি নিজে শিল্পময়ী। তার মধ্যে অনন্ত কালের অফুরন্ত শিল্পের স্রোত বয়ে চলেছে। শিশু তারই সান্নিধ্যের বস্তু, কাজেই তাকেও শিল্পের পরশ দিয়ে প্রকৃতি নিজের আনন্দবোধ কতকটা চরিতার্থ করে নেয়। শিশু যে আপন মনে কথা বলে সৃষ্টি ছাড়া সুরে অর্থহীন শব্দ যোজনা করে গান করে, দেয়ালে মাটিতে সেলেটে অর্থহীন আঁকিবুকি করে, তাতে তার সেই শিল্পপ্রেরণারই উপচানো রস খানিকটা মোচন হয় মাত্র। তাই তাতে অর্থ না থাকলেও সামঞ্জস্য বা সৌষ্ঠব না থাকলেও ভালোই লাগে, কেননা শিশু যে আনন্দময়। শিল্প অর্থই আনন্দ। আনন্দ অর্থই রস। আবার রসেই জীবন।

জীবনে বুদ্ধি যখন পরিপক্ক হয় তখন আমরা যে শিল্প রচনা করি, তা দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চাই, নিজে খুশি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো পাঁচজনকে খুশি করতে চাই। পাঁচজনের প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে সেই শিল্পের উৎস ক্রমে বেড়েই চলে। বারোয়ারি কারবারে আমাদের শিল্পের হয় বেচাকেনা এবং বিস্মৃতিসাধন। শিশুর ব্যাপার ঠিক উলটো। যেই দেখল, আর কেউ তার শিল্পের সুর কান পেতে শুনছে বা তার রূপ চোখ পেতে দেখছে, অমনি তার সহজ ধারাটি যাবে স্তব্ধ হয়ে, উৎসটি যাবে রুদ্ধ হয়ে। এর কারণ অন্যকে খুশি করার তাগিদ তার মধ্যে আসেনি, তার খুশি তার নিজের গন্ডিতেই সীমাবদ্ধ। নিজের মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে মশগুল হয়েই তার শিল্প রচনা। সে তখন মন—সর্বস্ব। অজানা মুলুকের এক রঙিন প্রজাপতির পাখায় ভর করে সে মন তার ঘুরে বেড়ায়। বুদ্ধির এখনও পাখা সেখানে গজায়নি।

বুদ্ধির পাখা যেদিন গজাবে, সে দিন তার মনে ইমপ্রেশনের জায়গায় বিশ্লেষণ এসে ছড়ি হাতে বেঁকে বসবে। বলবে এটা হচ্ছে না, ওটা হচ্ছে, এ ভালো নয়, সে ভালো। বিশেষজ্ঞের মতে তার এ বয়সটা আরম্ভ হয় বারো তেরো বছরের পর থেকে। দুই কিংবা তিন বছর থেকে তেরো বছরের আগের সময়টাই মোটামুটি ভাবে সে থাক মন-সর্বস্ব। এই সময়টাতেও তার ইমপ্রেশন থাকে সজীব। ইমপ্রেশন বলতে এখানে বুঝতে হবে— যখন 'সে বস্তু দেখে চেনে কিন্তু বিশ্লেষণ করে না, চোখকে আকৃষ্ট করে যে বস্তু, তাই প্রধান হয়ে ওঠে।' মন জুড়ে থাকে কৌতূহল, চোখজুড়ে থাকে বিস্ময়। কিন্তু বিশ্লেষণের বুদ্ধি মনের কোণে দানা বাঁধেনি তখনও। শিল্পের সংজ্ঞায় এইটেই শৈশবকাল। এই সময়ে শিশুচিত্রেও শিল্পের যে অঙ্কুর জাগে, তাকে অনুকূল আবেষ্টনীর মধ্যে রেখে. দেখিয়ে শুনিয়ে এবং প্রয়োজন হলে শিখিয়ে পড়িয়ে, বাড়িতে শিক্ষিত হলে, শেষে তা শাখাপল্লব সম্প্রসারিত করতে পারে। দেশের শিল্পশিক্ষকেরা যদি এই সময়টাতে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে শিশুদের মনে প্রেরণা ও পারিপার্শ্বিকের সুযোগ সুবিধা দিতে পারেন তো ছবি আঁকতে তারা পারদর্শী হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু শিশুদের যারা ছবি আঁকা শেখাবেন, তাদেরকে মনের দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে শিশু হয়ে যেতে হবে। বয়সের দরুণ তাদের বুদ্ধি পেকেছে এ বোধ তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে হবে।

শিল্পের ক্ষেত্রে বস্তুত, শিশুমনই ক্রীড়াক্ষেত্র। তাই দেখা গেছে শিল্পীরা প্রায়ই সবাই খেয়ালি। তাদের বয়স যাই হোক না কেন, তাদের আচরণ অনেক ক্ষেত্রেই ঠিক শিশুর মতো। এতেই প্রমাণ করে, মানুষের মনে এক চিরন্তন শিশু রয়েছে। সে সর্বদাই অর্থহীন খেয়ালে মগ্ন। আমাদের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেহ বাড়ে, বুদ্ধি বাড়ে, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর মধ্যে পড়ে আর বাড়ে অভিজ্ঞতা। এসব যতই বাড়ে, ততই যেন আমরা প্রকৃতির স্পর্শ থেকে আলগা হয়ে পড়ি। তখন আমরা যে কে সেই অর্থাৎ শিশু হয়ে যাই। শ্রোতা কাছে না থাকলেও কথা কয়ে উঠি। নির্জন প্রান্তরে পথ চলতে হঠাৎ গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠি। অথচ যখন হাসি, সেটা ওজন করে। আর লোকের সামনে যখন সুরে বা শিল্পে নিজেকে প্রকাশ করি, সেটা সতর্কতার শেকলে জড়িয়ে। তাই সে প্রকাশ সহজের নয় কিন্তু সহজ প্রকাশের মানেই শিশুর প্রকাশ।

শিল্প প্রকাশের প্রধান তিনটি ধারা। এই তিন ধারায় প্রবাহিত শিল্পকে তিনটি নাম দেওয়া যায়—কথাশিল্প, সুরশিল্প, চিত্রণশিল্প। কেবল কথায় যারা শিল্প প্রকাশ করে, এ জগতে তাদের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু সংসারে এমন লোকের অন্ত নাই—যারা অন্তরের শিল্পবোধকে কেবল কথা দিয়ে প্রকাশ করে উঠতে পারে না তাদের অন্যান্য উপায় খুঁজতে হয়। শিল্পবোধকে তারা সুরে সুরে ছড়িয়ে দেয়। কেউ বা লাইনে, রেখায় গতিতে পরিস্ফুট করে তোলে। এই রঙে রেখায় যাদের শিল্পবোধ বিকশিত হয়, মোটামুটিভাবে বলা যায় তারাই বড় শিল্পী, কারণ তারা সমসাময়িক ও ভাবী মানবের উপভোগের জন্য শিল্পের যা কিছু রচনা রেখে যায় বা গিয়েছে, মানুষের কাছে তা শাশ্বত সম্পদরূপে পরিগণিত।

আগেই জেনেছি, শিল্পের ধারা তিনটি ঃ কথা, সুর ও চিত্রণ। প্রকৃতির মধ্যে এই তিন বস্তুর বহুল বিকাশ দেখতে পাই। মানবের কথা ব্যাকরণের সূত্রে বাঁধা, সুর রাগ রাগিনীর জালে আবদ্ধ, আর চিত্রণ রঙ আর তুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতিতে এই তিনটিই অবাধ। বৃক্ষের পত্রমর্মরে সেই কথা, নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে সেই কথা, বেণুবনের হাওয়ায় সেই সুর, মেঠোপথের কিনারে কিনারে, ধান গাছের দোলাতে দোলাতে সেই সুর। আর ফুলে ফুলে সেই রঙ আকাশের মেঘে মেঘে সেই চিত্র। শিশুতো এসবেরই উত্তরাধিকারী। কাজেই তার সব কিছু আমাদের নিকট অর্থহীন বলে মনে হবে বৈ কি? কাজেই তাকে শেখাতে গিয়ে তো অর্থ বলে শেখানো চলবে না। তার মধ্যে যা অবান্তর তার অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে তাকেই অর্থবান মনে করে নিয়ে তাকে শিল্পের পাঠে দিতে হবে। কাজেই ছোটোদের আর সব কিছু শেখানোর চাইতে চিত্রণ শেখানো অধিক দায়িত্বপূর্ণ কাজ।

যাদের স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর তারা নিজেদের শৈশবকে একবার স্মরণ করে দেখতে পারেন। ফুলের পাপড়িতে, প্রজাপতির পাখায়, মেঘেদের গায়ে, যে নিত্য নূতন রঙের সমারোহ ঘটে, তা প্রথম যেদিন চোখে পড়ে, সেদিনের কথা হয়ত মনে আনা যায় না। কিন্তু সেদিন যে আনন্দ হয়েছিল তা কল্পনা করতে পারি। চারপাশের প্রকৃতিদত্ত সম্ভারের নানা রূপ, নানা আকার একটা অভূতপূর্ব অনুভূতি নিয়ে সেদিনকার শিশুমনে ধরা যে দিয়েছিল তাতে ভুল নেই। সেদিন সে শিশু আপনা থেকে শিল্পী হয়ে উঠেছিল। এভাবে সে পৃথিবীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য নিজের মধ্যে অনুভব করতে পারে। এই সময়ে তাকে যে অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প শিক্ষাও দেওয়া দরকার এ বোধ আমাদের দেশে আগে ছিল না বললেই চলে। বিদ্যালয়ের নীচু শ্রেণিতে যে ড্রইং-এর ক্লাস হয় তাতে শিশুদের শিল্প-বোধ বিকশিত হওয়ার বিশেষ কোনো সুযোগ থাকে না। কেননা সেখানে কতকগুলো হাতিঘোড়া বা তৈজসপত্রের রেখাচিত্র এঁকে নকল করতে দেওয়া ছাড়া আর কোনো সুষ্ঠু পদ্ধতিতেই চিত্রণ শিক্ষা দেওয়া হয় না। কাজেই তাতে শিশু শিল্পৈষণা পরিস্ফুট হতে পারে না। আমরা যতদূর জানি শিশুদের কোনো সুষ্ঠু পদ্ধতি ধরে শিল্প শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথের মনেই সর্বপ্রথম জাগে এবং তিনিই এ শিক্ষাকে বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব তাঁর বিশ্ববন্দিত বিদ্যায়তনের শিল্পীবৃন্দের উপর অর্পণ করেন। শান্তিনিকেতনের প্রায় শুরু থেকেই সেখানে ছোটোদের ছবি আঁকা শেখানোর—শুধু শেখানোর নয়—শিশুর প্রকৃতিদত্ত শিল্পবোধ যাতে উপযুক্ত পরিচালনায় বিকাশলাভ করতে পারে তার সর্বাধিক সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। শান্তিনিকেতনের এই দীর্ঘকালের শিল্পচর্চার ফলে দেশে শিল্পের প্রতি অনুরাগ যেমন বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে স্বভাবশিল্পী শিশুকে অবহেলা করে আমরা যে ভুল করেছি, সে ভুল ভাঙবার চেষ্টা।

শান্তিনিকেতনে শিশুদের বহু বিচিত্র পদ্ধতিতে ছবি আঁকা শেখানো হয়। সেখানে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর তত্ত্বাবধানে সেখানকার শিল্পশিক্ষকরা অতি সহজ পথে সে দুরূহ দায়িত্ব বহন করছেন। দীর্ঘকালের, অভিজ্ঞতার দ্বারা এ কাজের চমৎকার সৌকর্যসাধন করেছেন। তাদের এ সকল অভিজ্ঞতালব্ধ পদ্ধতির অনুকরণে অন্যত্রও যদি ছোটোদের ছবি আঁকা শেখানো হয় তা হলে উত্তম ফল যে পাওয়া যাবে তাতে সন্দেহ নেই। তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে যাঁরা নিজেকে ঝালিয়ে নিয়ে শিশুদের শিল্পশিক্ষা দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে চান, তাঁদেরকে প্রথমেই কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। রবীন্দ্রনাথের সব শিক্ষারই আদর্শ হচ্ছে—সহজের সাধনা। বেত মেরে শিক্ষা দেওয়ার নীতি সেখানে অচল। সেখানে, প্রকৃতি শিশুকে বিশ্বদৃষ্টে বিস্ময় লাগার যে মায়াকাঠি ছুঁইয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেইটিই হবে শিক্ষকের হাতের অবলম্বনীয় দণ্ড। শিশু প্রকৃতির মাধুরীতে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে আপনা থেকে শিক্ষিত হয়ে উঠবে—শিক্ষক থাকবে শুধু তাকে পথ দেখিয়ে দেবার জন্য—তাকে নানা ইঙ্গিত দেখিয়ে সাফল্যের পথে চালিয়ে নেবার জন্য। যারা অঙ্কন শেখান তাদের কাজও এই হবে। অবশ্য শিশু যখন আর শিশু থাকবে না, সে যখন তেরো চৌদ্দ বছর পেরিয়ে যাবে, তার মধ্যে 'ইম্‌প্রেশন'

ছাড়িয়ে যখন বিশ্লেষণ বুদ্ধি দেখা দেবে, তখন তার জন্য শেখাবার পদ্ধতিরও হবে কিছু কিছু পরিবর্তন। কিন্তু শিশুকে শেখাতে হলে শিক্ষককেও শিশু হতে হবে, এইটে ভুললে চলবে না।

অধুনা দেশের শিক্ষারীতির পরিবর্তন হতে চলেছে এবং আরো হবে। শিক্ষাকে এখন গ্রন্থ মুখস্থ করানোর মধ্যে আবদ্ধ রাখলে চলবে না। শিক্ষা বলতে এখন আত্মবিকাশ বলে মেনে নিতে হবে। এ বিকাশ তিক্ততার মধ্যে, জটিলতার মধ্যে, অনিচ্ছার মধ্যে হতে পাবে না।

শিক্ষককে শিশুর মনের খবর জানতে হবে। সহানুভূতি ও সমবেদনার আলোকে তার মনের তলদেশটুকু পর্যন্ত দেখে নেবার ক্ষমতা শিক্ষকের থাকা চাই। শিশুমনের শিল্প-লতা বারবার মাথা তুলতে গিয়ে হয়তো এলিয়ে পড়বে। শিক্ষকের কর্তব্য হবে তাকে ঠিক জায়গাটিতে বাহিয়ে দেয়া—যেখান থেকে সে নৈরাশ্যের বাতাসে এলিয়ে পড়বে না কিংবা অত্যুৎসাহের উত্তাপে তার কিশলয়গুলি শুকিয়ে মিইয়ে আসবে না। তার কাছে নানা রকমের রঙ থাকবে, থাকবে ছবি আঁকার যাবতীয় উপকরণ, রঙের প্রাচুর্য নিকটে থাকলে তবেই সে প্রকৃতির সদা পরিবর্তনশীল চিরনূতন রূপ থেকে আহরণ করে তাকে তুলির সাহায্যে ব্যঞ্জনা দিতে সক্ষম হবে। তার আঁকা ছবিকে পাকা মন দিয়ে দেখলে চলবে না। তাহলে তার মধ্যে হাজারো ত্রুটি চোখে পড়বে। দেখাতে হবে তারই সমবয়সী চোখ নিয়ে। বড়োদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার অভিজ্ঞতা তুলনীয় হতে পারে না কিছুতেই। তার শিল্পকে তারই অভিজ্ঞতার মাপকাঠি নিয়ে যাচাই করতে হবে।

ছোটোদের আঁকা ছবিতে বয়স্কজনোচিত পরিবেশ ও আঙ্গিক সৌষ্ঠব আশা করা বাতুলতা। তার মনের মধ্যে যে শাশ্বত প্রেরণা রয়েছে, সেটাই আত্মপ্রকাশের জন্য সর্বদা চেষ্টাপরায়ণ। তার প্রকাশের পথ করে দেওয়া এবং সে পথ নির্মুক্ত করে দেওয়া হলেই যথেষ্ঠ করা হল। তারপর সেই প্রেরণা শিল্পের খাতে আপনা আপনি বেরিয়ে আসবে, আপনা আপনি রূপ নেবে এবং সে রূপ আপনি রসে অবগাহন করে উঠবে। এতে সফলকাম হতে হলে মোটামুটি কি কি উপায় অবলম্বনীয়, বিশেষজ্ঞদের জবানীতে তা এখানে উদ্ধৃত করছি। শিক্ষককে সর্বপ্রযত্নে শিশুর আত্মপ্রকাশের যাবতীয় সুযোগ দিতে হবে।

কাগজ, তুলি, খড়ি, জলরং, তেলরং, যথেষ্ট পরিমাণে তাকে দিতে কার্পণ্য করলে চলবে না। তার মন যখনই যেমনটি চায়, তেমনটি যেন সে কাজে লাগাতে পারে। এতে অভিভাবকের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কেননা, এসব কিনে দিতে খরচা তেমন কিছু বেশি পড়বে না। যারা শিশুর খাওয়া-পরা জুগিয়ে আসছেন, তারা এ খরচাটুকুও অল্পায়াসে জোগাতে পারবেন। শিশুশিল্পীর আবেষ্টনী হওয়া চাই শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেটি শিল্পবিরোধী হলে চলবে না। সেখানে প্রকৃতিদেবীর অনুপস্থিতি না থাকা বাঞ্ছনীয়।

শিল্পী যেন প্রকৃতির অন্তরের স্পর্শ সর্বদাই পায়, তার চিরনূতন রূপ থেকে সে যাতে নূতন নূতন ইমপ্রেশন আহরণ করতে পারে।

শিশু নিজে যেটুকু অভিজ্ঞতা পেয়েছে, কেবলমাত্র তারই আলোকে ছবি আঁকতে শিক্ষক তাকে বলে দেবেন এবং যদি দেখেন সেই অভিজ্ঞতার অনুপাতে বস্তুটুকু বেশ পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে তবে তাতেই তাকে তুষ্ট থাকতে হবে। এরই মধ্যে সময় সময় এমন প্রাণপূর্ণ রূপ বেরিয়ে যাবে যা দেখে শিক্ষক নিজে খুশি না হয়ে পারবেন না।

শিক্ষক লক্ষ রাখবেন, তার ড্রইং-এ যাতে বর্ণিতব্য রেখাগুলি পরিস্কার রূপ পায়, তবে কথায় কথায় ভাল হয় নি, খারাপ লাগছে বলে তাকে নিরুৎসাহ করা চলবে না। কেবল তার অঙ্কনগুলিতে ছোটোখাটো ত্রুটিগুলি

শুধরে দেওয়া যেতে পারে। যতদূর সম্ভব সুন্দর শিশু যাতে তার নিজের শিল্পবস্তুকে প্রকাশ করতে পারে তাতে সাহায্য করাই শিক্ষকের মুখ্য কাজ।

তারপর শিশু যখন শিল্পে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে, তখন কি করে তার শিল্পচেতনাকে অব্যাহত রাখতে হবে সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হচ্ছে—তাদের ছবিগুলি নিয়ে সময় সময় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা। তাদের লিনো-কাট ও উডকাটের প্রিন্ট তুলে নিয়ে এলবাম তৈরি করা। তাদের নিজেদের ম্যাগাজিন বা সাময়িক পত্র থাকবে—তাতে ছবি এঁকে দেবার জন্য তাদের উৎসাহিত করা।

শান্তিনিকেতনে এ সকল দিকে দৃষ্টি রেখেই ছোটোদের ছবি আঁকা শেখানো এবং তাদের উৎসাহ বাড়ানো হয়। সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের আঁকা বহু ছবি কলাভবন মিউজিয়মে স্থায়ীভাবে রেখে দেওয়া হয়েছে, যার থেকে পরবর্তী শিশুরাও উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়ে থাকে।

কোনো অভিভাবক এখানে প্রশ্ন তুলতে পারেন আমরা শিশুদের যে ছবি আঁকা শেখাব তা কেন শেখাব? সব লোক আর্টিস্ট হয়ে গেলে তারা কে কার অন্ন যোগাবে?

অবশ্য আর্ট শিক্ষা দিলেই যে তারা সকলেই বিশেষজ্ঞ আর্টিস্ট হয়ে উঠবে তার কোনো মানে নেই। তবে তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ যদি ভবিষ্যতে ভালো আর্টিস্ট হয়ে বেরিয়ে আসে সে তো হবে আনন্দেরই কথা। তার জন্য বরং তার পিতামাতার ও শিক্ষকের গৌরবান্বিত হবারই কথা। আর যারা তা হল না, তারাও আমোদের সঙ্গে, তৃপ্তির সঙ্গে, প্রকৃতিদত্ত অনুভূতির সঙ্গে একটা সুকুমার কলা সম্বন্ধে যতটুকু সম্ভব অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকল, সেটাই বা কম কিসে। শিল্পী শিক্ষা যে মানুষকে মানুষ করে তোলে, তার মধ্যে রসবোধ রুচিবোধের উদ্রেক করে, তার মনন ও কামনাকে মার্জিত করে, এ কথা তো অস্বীকার করা যায় না। যে শিক্ষার দ্বারা নিজের দ্বারা নিজের ও পরিজনের অন্নবস্ত্রের সমস্যা মেটানো যায় সে শিক্ষার যেমন প্রয়োজন রয়েছে তেমনি যে শিক্ষার দ্বারা নিজের রুচিকে মার্জিত ও উন্নত করা যায় এবং অপরকে আনন্দ দান করা যায় সে শিক্ষারও তো প্রয়োজন আমরা অস্বীকার করতে পারি না। বিশেষত, প্রকৃতি যে জিনিস আপন হাতে শিশুর মনে ছড়িয়ে দিয়েছে, আমরা অভিভাবকেরা তাকে সে জিনিস কেন কুড়িয়ে নিতে সাহায্য করব না।
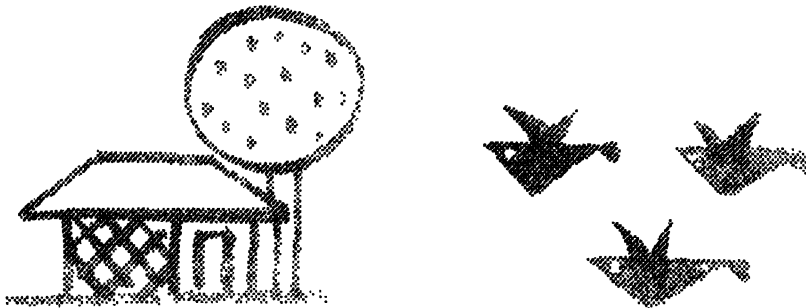
শিল্পী-কথা

ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা
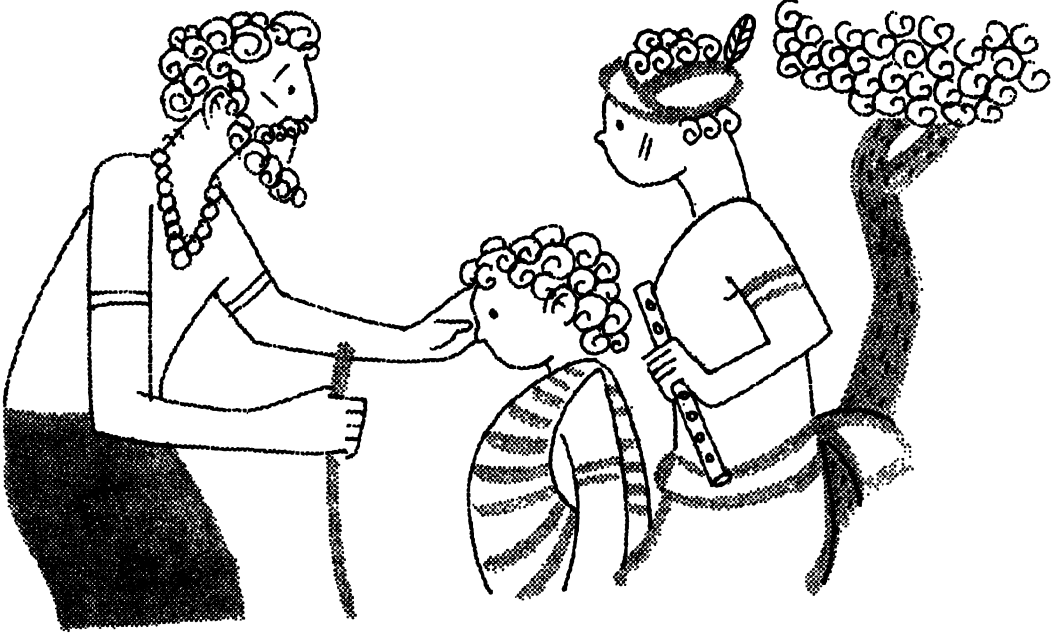
সে অনেক দিনের কথা, সেখানে ছিল এক মস্ত বড়ো কালো পাহাড়। এ যেন আকাশকে ঠেলে স্বর্গে উঠে গেছে। আর তারি পায়ের কাছে ছোট্ট একটি গ্রাম। সেই গ্রামের কাছ দিয়ে ছিল একটি তেমনি ছোট্ট স্বচ্ছ নদী। চারদিকে মস্ত সবুজ একটু উচুঁনীচু ধানের খেত মাঠের শেষে গিয়ে মিশে গেছে, আর তারি মাঝখানে সেই ছোট্ট নীল নদীটি একেবেঁকে কোথায় এক রাজপুত্রের দেশে চলে গেছে।

গ্রামটি ছিল শিল্পীদের। দেখতে ভারী সুন্দর। প্রত্যেক বাড়ির সঙ্গে এক-একটি ছোট্ট বাগান তাতে নানা রকম ফুল গাছ। রাস্তাঘাট তক্‌তকে পরিষ্কার যেন ছবিটি, আর গ্রামের লোকদের মধ্যে খুব ভাব ছিল। তাদের মধ্যে ছিল এক জন বুড়ো ধরনের পাকা শিল্পী সে ছিল তাদের গুরু।

তাদের অনেক রকম উৎসব ছিল। গ্রামের শালবনে যখন প্রথম বসন্তের হাওয়া এসে সব পুরনো পাতা ছড়িয়ে দিত আর রাস্তাঘাটে শুকনো পাতার মাতামাতি হত তখন সবাই মিলে কাজ কর্ম ফেলে ঘুরে বেড়াত। শালবনে ফুলে ফুলে যখন ছেয়ে যেত তখন সবাই মিলে অনেক দূরে পাহাড়ের ধারে বনভোজনে যেত। কত নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নায় তাদের বাঁশির গান পাহাড়টিকে বেয়ে বেয়ে আকাশে মিশে যেত।

এবার যখন শীতের শেষে বসন্ত আসব আসব করছে আর উঁচু উঁচু শালবনের ডগায় ডগায় কচি পাতা আর ফুল ফুটে উঠছে আর শিল্পীদেরও নতুন কাজের পালা শুরু করবার সময় হয়ে আসছে তখন সবাই মিলে ঠিক করলে কাজ শুরু করবার আগে একবার সেই এক পাহাড়ে শালবনে বনভোজনে যাবে।

সবাই মিলে একদিন ভোরে রওনা হল। পাহাড়টি ছিল ভারী সুন্দর সবুজ ছায়াময়। কত রকম পাখি আর ফুল। ঝরনাও ছিল একটি। কেউবা একা একা বনের মধ্যে বাঁশি বাজাতে বাজাতে চলেছে, কেউবা শাল ফুলের

সৌন্দর্য দেখছে, কোথাও বা একদল মিলে গল্পে মশগুল। দুপুর বেলা তখনও শীত একেবারে যায়নি। সমস্ত বন যেন অলস হয়ে রোদের দিকে পিঠ দিয়ে রোদ পোহাচ্ছে। বনময় ফুলের গন্ধে ভরে গেছে। কোথাও ঘুঘু পাতার আড়ালে বসে' বসে' অলসের মতো ধীরে ধীরে ডাকছে। অনেক দূরে বনের ভিতরে কাঠ কাটার আওয়াজ হচ্ছে। একটি বড়ো গাছের ছায়ায় বসে বসে এক তরুণ শিল্পী বাঁশি বাজাচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ বনের ভিতর থেকে একটি ছোটো মেয়ে ঠিক যেন এই বনেরই ফুলটি আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। বাঁশি থামিয়ে সে বললে "তুমি কে?" মেয়েটি বললে "আমি পথহারা, পথ ভুলে বনের মধ্যে এসে পড়েছি। তোমার বাঁশির গান শুনে শুনে এখানে এসেছি।" নবীন শিল্পী বললে "চল তোমাকে বাড়ি রেখে আসি।" সে বললে "আমার বাড়ি ঘর নেই, আমার কেউ নেই, আমি তোমার সঙ্গে যাব।" তখন নবীন শিল্পী মেয়েটিকে তার গুরুর কাছে নিয়ে গেল। গুরু সব শুনে বললেন যে "আমাদের গ্রামেই নিয়ে চল। এ বনের ফুল একে খুব যত্ন করে ঘরে রাখতে হবে।"

শিল্প-গুরু সেই কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েটিকে বড়ো ভালোবাসত। মেয়েটি সেই তরুণ শিল্পীর বাড়িতেই থাকত। কারণ বুড়ো শিল্পীর কেউ ছিল না ; কে মেয়েটির যত্ন নেবে তাই নিজের বাড়িতে রাখল না। মেয়েটিকে দেখবার জন্য গুরু প্রায়ই আসত। মেয়েটি চিত্রকরের মা বাপকে ঠিক নিজের মা বাপের মতো ভালোবাসত। আর তারাও মেয়েটিকে নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসত। এমনি করে দিন কাটতে লাগল। যখন তরুণ শিল্পী ছবি আঁকত তখন মাঝে মাঝে মেয়েটি এসে তাকে কত গল্প এবং গান গেয়ে শোনাত। তাকে সে বড়ো ভালোবাসত। রং গুলে দেওয়া, তুলি ঝেড়ে মুছে রাখা, এইসব কাজ মেয়েটি আস্তে আস্তে ছেলেটির কাছ থেকে নিয়ে নিল। ছেলেটিরও বেশ লাগত। দিন দিন ছবি আঁকা, তার কাছে আরও মধুর হয়ে উঠতে লাগল। ছেলেটিও তার গানে বাঁশির সুরে মেয়েটিকে ভুলিয়ে রাখত। এমনি করে এরা দুজনে ছবিতে, গানে, বাঁশির সুরে বেড়ে উঠতে লাগল।

বই ধার দেওয়া

নারায়ণ চৌধুরী
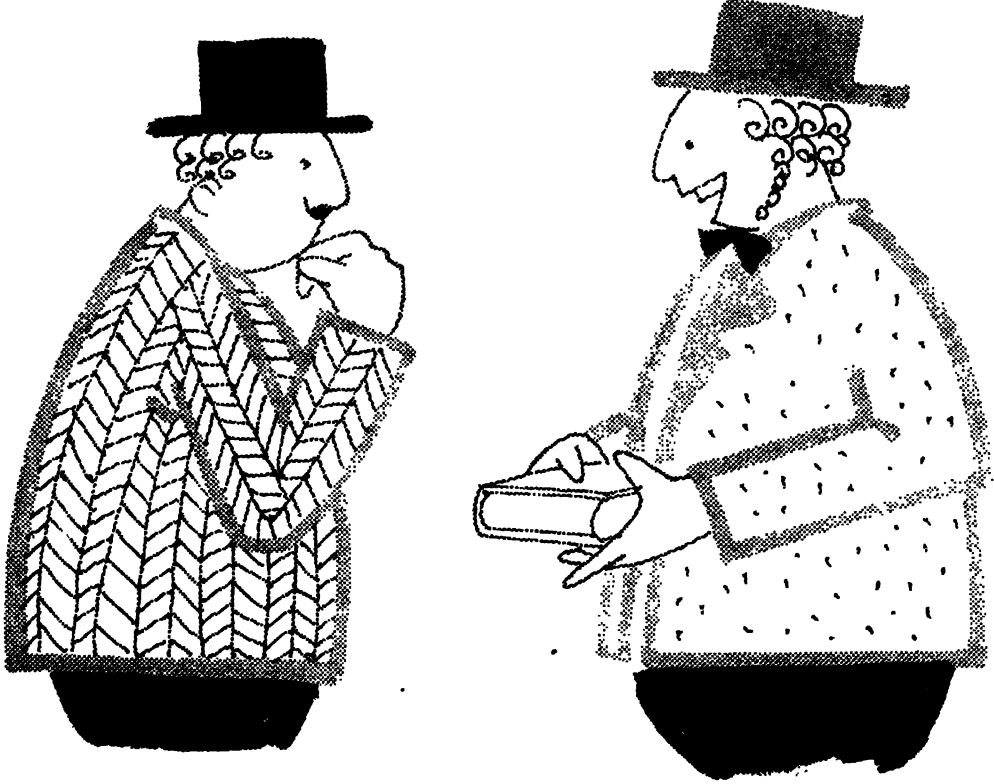
বই ধার চাওয়া ও বই ধার দেওয়া, সম্পর্কে কতগুলি বিচিত্র সংস্কার আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। আমরা যখন কাউকে বই ধার দিই বা কারও কাছ থেকে বই ধার আনি, আমরা ধরে নিই সে বই আমার কিংবা অন্য একজনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সাময়িকভাবে তা হস্তান্তরিত হয়েছে মাত্র। টাকা ধার দিলে যেমন তা লোকে ফিরে পাওয়ার আশা করে, তেমনি বই ধার দেবার বেলায়ও বইয়ের মালিক শেষ অবধি বইখানি ফিরে পাওয়ার আশা রাখেন। কিন্তু এরূপ আশাবাদিতার সংগত কোনো ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। কেননা একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারব, বই জিনিসটার উপর সত্যি কারও কোনো মালিকানাস্বত্ব থাকতে পারে না। ওটি সর্বসাধারণের ভোগ্য বিষয়, সুতরাং, স্বতঃই তা সর্বসাধারণের সম্পত্তি। এক হাত থেকে অন্য হাতে তারপর অন্য হাতে-অর্থাৎ হাতে হাতে ঘোরবার জন্যই বইয়ের জন্ম। এমনকি সে বস্তু একেবারে বেহাত হয়ে গেলেও কারও কিছু বলবার থাকতে পারে না। শুনেছি প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মশায় কাউকে বই ধার দিতেন না। অন্য সব ব্যাপারে তিনি দয়ারসাগর ছিলেন, কিন্তু এই এক ব্যাপারে তিনি দয়াধর্মের অনুরাগী ছিলেন না। তাঁর গৃহের লাইব্রেরি কক্ষের সারি সারি আলমারিতে মরক্কো-চামড়ার সুদৃশ্য বাঁধাই মূল্যবান সব বই থরে থরে শোভা পেত, সেখানে তিনি কাউকেই আঁচড় কাটতে দিতেন না। এমনকি অতি-নিকট বন্ধুদের বেলায়ও তিনি এ ব্যাপারে নিতান্ত অকরুণ ছিলেন বলে শোনা যায়।

পরমপূজ্য বিদ্যাসাগর মশায়ের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা জানিয়েই বলছি এটি কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে উচিত কার্য হয়নি। তিনি দয়ার সাগর ছিলেন, অথচ বই ধার দেবার বেলাতেই ওই সাগর শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত এ কেমন কথা। বইয়ের প্রতি এই মমত্ব বোধ ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি অতিরিক্ত মমত্ববোধেরই নামান্তর নয় কি? আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় দয়াধর্মের চরম পরীক্ষা বই ধার দেওয়ার সামর্থ্যে। যিনি যত অকাতরে ও অবলীলাক্রমে বই ধার দিতে পারেন, তিনি তত দয়ালু ব্যক্তি। কেননা, এর দ্বারা আত্মপর ভেদজ্ঞানের বিলোপ বোঝায়, যা দয়াধর্মের প্রধান লক্ষণ। বইয়ের অন্তর্গত জ্ঞান বা রস একার ভোগের জিনিস নয়। তা সর্বসাধারণের জন্য উদ্দিষ্ট। আক্ষরিক অর্থে তা হল public property. তা যদি হয়, তাকে ব্যক্তিগত জিম্মায় সব সময় চোখে চোখে আগলে রাখবার কোনো অর্থ হয় না। তার উপর ব্যক্তিবিশেষের মালিকানারও কোনো যুক্তিসংগত ভিত্তি নেই। এক-একখানি বই যত বেশি হাত ঘোরে, যত বেশি মলিন ও জীর্ণ হয়, তত বেশি তার সার্থকতা। কাঁচা বা নিপুণ যে হাতেই লেখা হোক না কেন, বেহাত হওয়া বৈ বইয়ের দাম নেই।

আমার মনে হয় বই ধার নিলে বই যে ফিরিয়ে দিতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, এটি কুসংস্কার বৈ কিছু নয়। বই কি কারও দখলিকৃত সম্পত্তি যে অন্য কেউ তা ভোগদখল করতে চাইলেই তা বেআইনি বলে গণ্য হবে? কথায়ই বলে "ধনবানে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে।" এই প্রচলিত জনশ্রুতিটির সহিত আরও দু'চারটি কথা যোগ করলে মন্দ হয় না। জ্ঞানবানে শুধু বই পড়েই না, পরকীয় বই অম্লান বদনে আত্মসাতও করে। এতে দোষাবহ কিছু নেই, কেননা প্রকৃত জ্ঞানেরই একটি লক্ষণ এই আত্মপর ভেদজ্ঞানের লোপ। আপনার এবং অপরের পার্থক্যবুদ্ধি যিনি যত অবলীলায় ঘুচিয়ে দিতে পারেন, বুঝতে হবে তাঁর তত বেশি মোহমুক্তি সংসাধিত হয়েছে। পুস্তক হল জ্ঞানের আধার। সুতরাং, পুস্তকরূপ জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার দ্বারা অজ্ঞান-তিমির দূর করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা।

এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত হাস্য-রসিক মার্ক টোয়েনের কথা মনে পড়ল। হাস্য-রসিকেরা সাধারণত জ্ঞানী ব্যক্তি হন। মার্ক টোয়েনের দৃষ্টান্ত তার প্রমাণ, গল্প আছে, একবার মার্ক টোয়েনের কোনো এক বিশিষ্ট বন্ধু তাঁর গৃহে বেড়াতে আসেন। মার্ক টোয়েন পরম সমাদরে তাঁকে তাঁর লাইব্রেরি ঘরে নিয়ে বসান। লাইব্রেরি ঘরটি বইতে ঠাসা, তাকের মাথায় বই, কুলুঙ্গিতে বই, টেবিলে বই—সর্বত্র বইয়ের ছড়াছড়ি। বইগুলি সবই খুব সুদৃশ্য ও মূল্যবান, কিন্তু যেসব আলমারি বা র‍্যাকে তাদের রাখা হয়েছে তাদের চেহারা নিতান্ত জীর্ণ। আধার এবং আধেয়ের এই অসংগতি স্বভাবতঃই বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তিনি মার্ক টোয়েনকে এ বিষয়ে কিছু বলতে মার্ক-টোয়েন আসল রহস্য ফাঁস করলেন। বললেন, বইগুলি যেভাবে হাত করা হয়েছে, আলমারিগুলি নানা কারণেই সেভাবে হাত করা সম্ভব হয় নি, তাইতেই পুস্তক এবং পুস্তকাধারের এই বৈসাদৃশ্য। অর্থাৎ বইগুলি পরস্মৈপদী, সাজ-সরঞ্জামগুলি মাত্র সদাশয় মার্ক টোয়েনের নিজের পয়সায় কেনা। এরূপ অবস্থায় আধার এবং আধেয়ের বৈসাদৃশ্য না ঘটে পারে না।

হাস্যরসিকের আবরণে টোয়েন ছিলেন পরম প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তাই তাঁর এই সর্ব বস্তুতে সমদর্শিতা। আত্মপর ভেদবুদ্ধি লুপ্ত না হলে এই সমদর্শিতা জন্মায় না। মার্ক টোয়েন পুস্তকগুলিকে যেভাবে হস্তগত করেছিলেন, সম্ভব হলে পুস্তক-রক্ষণীগুলিকেও বোধ হয় তদ্রূপ কায়দায় হস্তগত করতেন। কিন্তু সেটা নিতান্ত পুকুর চুরির সামিল হত, অতটা বোধ হয় জ্ঞানীরও ধাতে কুলায় না। তাই একটা সীমায় এসে তাঁর পরস্মৈপদী চর্চা থেমে গিয়েছিল, তার বেশি তিনিও অগ্রসর হতে পারেন নি।

বই ধার-দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে আমি উত্তমর্ণের দলে। বন্ধুদের আমি এন্তার বই ধার দিয়ে থাকি। বন্ধুদেরও আমার এই বদান্যতার সুযোগ গ্রহণে কোনোরূপ কার্পণ্য দেখি না। যখন-তখন তাঁরা আমার লাইব্রেরি কক্ষে

হামলা করেন এবং আমার সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই বই বগলদাবা করে প্রস্থান করেন। বন্ধুদের এই একান্ত-আত্মীয়তার অভিব্যক্তিতে আমি ক্ষুণ্ণ হই না, বরং মনে মনে খুশি হই এই ভেবে যে, আমার সঙ্গে আমার বন্ধুদের পার্থক্য চেতনা কতই না ক্ষীণ, কতই না অকিঞ্চিৎকর! বন্ধুরা আমার এই মনোভাব অবগত আছেন এবং তাঁরা তার মর্যাদাও দিতে জানেন। আমার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগবশত তাঁরা যে বই একবার নেন সে বই আর ফিরিয়ে দিয়ে আমাকে অপমানিত করেন না। যত আগ্রহভরে আমি তাঁদের বই পড়তে দিই ততদূর ঔদাসীন্যবশে সেই বই ফিরিয়ে না দিয়ে তাঁরা আমাকে বাধিত করেন। বই ফিরিয়ে দিতে তাঁরা যত বেশি বিস্মৃত হন, আমার প্রতি তাঁদের ঐকান্তিক ভালোবাসার প্রমাণ পেয়ে তত আমি ধন্য হই। আমারও কথা হল এই, বই কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় যে তাকে অষ্টক্ষণ স্বার্থ-বুদ্ধির বেড়া দিয়ে আগলে রাখতে হবে। আমি যে আমার ঘরে তাকের পর তাক বই বোঝাই করে রেখেছি, সে শুধু বন্ধুজনদের পাঠ-পিপাসা পরিতৃপ্ত করবার জন্য। যে বই আমি শুধু নিজে পড়বার সুযোগ পাই, আমার বন্ধুরা পড়েন না, প্রতিবেশীরা পড়েন না, সে বইয়ের মূল্য অনেকখানি পরিমাণে খণ্ডিত। পৃথিবীর আলো-বাতাসে যেমন সকলের সমান অধিকার, তেমনি মুদ্রিত অক্ষরের উপরও সকলের তদ্রূপ অধিকার। আমার টাকায় বই কেনা হয়েছে বলে সে বই শুধু আমিই পড়ব আর কেউ তা পড়তে পাবে না—এরূপ নীরন্ধ্র আত্মকেন্দ্রিকতার আমি সমর্থক নই। যে বইয়ের অক্ষরমালার উপর দুটি চক্ষুর আপতিত হয়েছে, বহু চক্ষুর দৃষ্টিমাত্র জ্যোতি বিকীর্ণ হয় নি, সে বই আংশিক অফলা হয়েই রইল।

বইয়ের সম্পর্কে কত গল্পই মনে পড়ছে, একটিমাত্র গল্পের উল্লেখ করে আজকের প্রসঙ্গ শেষ করব। গল্পটি বই ধার দেওয়া নিয়ে নয়, বই উপহার দেওয়া নিয়ে। খতিয়ে দেখতে গেলে বই উপহার দেওয়া আর বই ধার দেওয়া একই বস্তুর এপিঠ-ওপিঠ। বই উপহার দেওয়ার যা ফল, বই ধার দেওয়ারও ঠিক সেই ফল। তবু, বরং বই উপহার দিলে সে বই দাতার হাতে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে (নীচের গল্পটি তার প্রমাণ), কিন্তু ধার দেওয়া বইয়ের বেলায় সে সম্ভাবনা বোধ হয় একেবারেই শূন্য।

একবার বার্নার্ড শ' তাঁর এক বন্ধুকে স্বরচিত একটি বই উপহার দেন। তাতে লিখে দেন—'With best wishes—Bernard Shaw"। কিছুদিন বাদে একটি পুরনো বইয়ের দোকানে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে (শ'য়ের পুরনো বই কেনার বাতিক ছিল) শ' সেই বইটিকে গাদার মধ্যে আবিষ্কার করেন। বইটি তিনি কিনে নেন। তারপর সে বই পুনরায় তিনি তাঁর বন্ধুকে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেন। তাতে লেখা ছিল—"With repeated best wishes–Bernard Shaw."

জীবনকথা

বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য

ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী
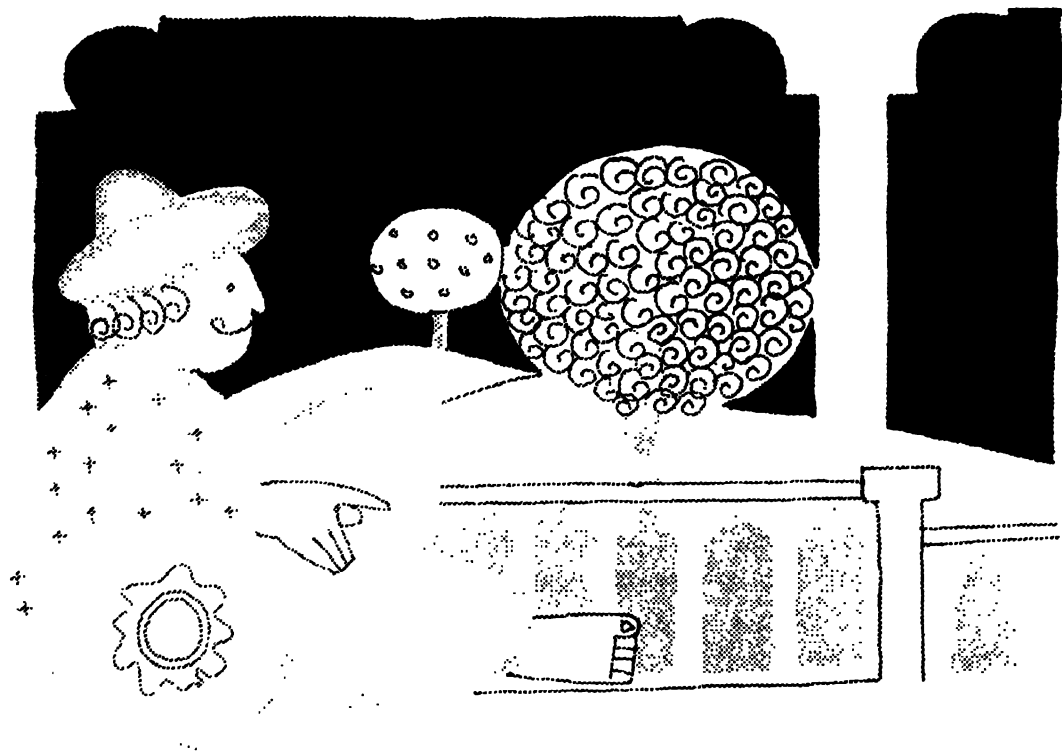
১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোর সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি নানা সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন। পিতার অনারব্ধ কার্য সমাপ্তির জন্য তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি ছিলেন একজন অতি উচ্চশ্রেণির চিত্রকর, তাঁহার চিত্রপ্রতিভা যে কেবল রং তুলিতেই নিবন্ধ ছিল এমন নহে, পরন্তু উহা ইট-পাথরেও শিল্পনৈপুণ্য ফুটাইয়াছিল। তাঁহার পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সকল ইমারত গড়া হইয়াছিল সেগুলির প্রত্যেকটি আপনি আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হইয়া আছে। দুর্গামন্দির ও লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, প্রশস্ত সরোবরের গায়ে দুইটি শ্বেতপদ্মের আকারে ফুটিয়া রহিয়াছে। রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন 'লালমহল' তাঁর স্থপতি বিদ্যার একটি উত্তম নিদর্শন।

বীরেন্দ্রকিশোরের চিত্র প্রতিভার সর্বোত্তম দান হইতেছে 'কুঞ্জবন' নির্মাণ। যাঁহারা আকবরের 'ফতেপুর সিক্রি' দেখিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন স্থান নির্বাচনের তুলনায় 'ফতেপুর সিক্রি' হইতে 'কুঞ্জবন' কোনো অংশে ন্যূন নহে। ফতেপুর সিক্রির উচ্চতা অধিক নহে, কুঞ্জবনও তদনুরূপ, সিক্রির চতুষ্পার্শ্বে প্রকৃতির সৌন্দর্যে নতুনত্ব কিছুই নাই, সিক্রি নিজের সৌন্দর্যেই নিজে উদ্ভাসিত কিন্তু কুঞ্জবন তাহা নহে। কুঞ্জবনের মধ্যে এমন একটি লুক্কায়িত মহিমা আছে যাহা শিল্পী বীরেন্দ্রকিশোরের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। তিনি সেই মহিমার প্রতি লক্ষ রাখিয়াই কুঞ্জবনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেই মহিমাটি কী?

আগরতলা সম্বন্ধে বাহিরের লোকের ধারণা আছে যে ইহা পার্বত্য স্থান কিন্তু শহরের প্রবেশ অবধি ভিতরে আসিয়াও পর্বতের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় না। মনে হয় কি ভুল ধারণা! এখানে ত মোটেই পাহাড়

নাই, একেবারে গ্রামদেশেরই মতো বেশ সমতল। কুঞ্জবনের পথে অগ্রসর হইতে হইতেও এ ভুল ভাঙে না। যখন পথিক কুঞ্জবন প্রাসাদ শিখরে উঠিয়া শহরের দিকে মুখ করিয়া তাকায় তখন অবাক হইয়া দেখিতে পায় দক্ষিণের পর্বতমালা উত্তরের শৈলশ্রেণির সহিত মিশিয়া গিয়া এক হইয়া গিয়াছে এবং কয়েক মুহূর্ত পূর্বেও যে শহরকে সমতল মনে করা গিয়াছিল তাহা যেন কোন্ যাদুমন্ত্রে বনের মধ্যে অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে। উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের চূড়া ও অন্যান্য হর্ম্যের উচ্চভাগগুলি কেবল যেন শহরের সাক্ষীস্বরূপ গভীর অরণ্যের মধ্যে আত্মগোপন করিতে পারিতেছে না। এইটিই কুঞ্জবনের লুক্কায়িত মহিমা, ফতেপুর সিক্রিতে ইহার নাম গন্ধও নাই, প্রকৃতির এইরূপ পটপরিবর্তনে কুঞ্জবনের জোড়া আছে কি না জানি না।

নিপুণ চিত্রকর বীরেন্দ্রকিশোর সেই লুক্কায়িত মহিমার কুঞ্জবনে একটি অপূর্ব প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। উদয়পুরের জলপ্রাসাদের যেরূপ ঐতিহাসিক খ্যাতি, কুঞ্জবনের শৈলপ্রাসাদেরও সেইরূপ একটি অপূর্ব নৈপুণ্য রহিয়াছে যাহা কালে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। এই প্রাসাদের পরিকল্পনায় শিল্পী একটি চমকপ্রদ কৌশল ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। প্রাসাদটি দেখামাত্রই মনে হয় ইহা দ্বিতল অথচ আসলে তাহা নহে। সূর্যের উদায়চল অভিমুখী বড়ো প্রকোষ্ঠটি স্পষ্ট দ্বিতল অথচ ভিতরের কোঠা একতালা। এইরূপ একটি বিস্ময়ের বেষ্টনে যেন এই শোভন হর্ম্য আবৃত হইয়া রহিয়াছে, ছাদ-প্রকোষ্ঠে বিশালমুকুরে দূরের উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের চিত্র প্রতিফলিত করিয়া ইহা যেন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপনে যত্নশীল।

বনপ্রাসাদের অনতিদূরে একটি সুগোল শৈলশিখরে শ্বেত বাঙলো প্রস্তুত হইয়াছিল, সিক্রির প্রাসাদের নীচে নীচে যেমন আবুল ফজল ও ফৈজির বাসগৃহ দৃষ্ট হয় বনপ্রাসাদের অনতিদূরে এই মর্মরকল্পভবনেও মহারাজের বিশিষ্ট অতিথি কখনো কখনো বাস করিতেন। সেই শৈলশিখরে উঠিলেই পৃথিবী যে গোল ইহা এক পলকে চোখে ঠেকিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ একবার সেই শৈলভবনে ছিলেন, ইহার উদয়াচল ও অস্তাচল পর্বতদ্বয়ের মনোরম শোভায় তিনি মুগ্ধ হন। শুনিয়াছি তিনি নাকি শান্তিনিকেতনে তাঁহার পৃথিবীব্যাপী প্রকৃতির লীলা-নিকেতন দর্শন প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—পৃথিবীতে প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র অনেক দেখিয়াছি কিন্তু ওই ত্রিপুরার কুঞ্জবনের শৈল শ্বেতভবন আমার স্মৃতি হইতে মলিন হইতে পারিতেছে না।

মহারাজ যখন রাজকার্যে ক্লান্ত হইতেন আকবরের সিক্রি-বাসের ন্যায় তিনি কখনো কখনো বনবাস করিতে এখানে চলিয়া আসিতেন। প্রকৃতির মধুময় নিবিড় বেষ্টনে থাকিয়া সংসারের তাপ ভুলিয়া যাইতেন। তাঁহার অঙ্কিত ছবিগুলি উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ আলো করিয়া রহিয়াছে, যে-কোনো খ্যাতনামা চিত্রশিল্পীর রচনার পার্শ্বে ইহারা আপন আসন করিয়া লইতে পারে। চিত্র সাধনার সহিত চলিত সংগীতচর্চা—বাদ্যযন্ত্রে তাঁহার অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটিয়াছিল। বীরচন্দ্রের হাত তাঁহার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখা যাইত। তাঁহার মন্দ্রিত বাঁশি রেকর্ডে উঠিয়াছিল শুনিয়াছি কিন্তু ইহার প্রচার নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ হইয়া যায়।

এই সকল বিধিদত্ত গুণে ভূষিত হইয়া তিনি যে প্রকৃতির ললাট সৌন্দর্য একা পান করিতেন এমন নহে কিন্তু বসন্ত উৎসবচ্ছলে কুঞ্জবনে মহা সমারোহের ঘটা পড়িয়া যাইত। প্রকৃতিপুঞ্জকে মিষ্টিমুখ করাইবার জন্য সন্দেশ রসগোল্লার রসালো পর্বত সজ্জিত হইত এবং নিজে বসিয়া থাকিয়া রাজার হৃদয় লইয়া এই ভোজন উৎসবের তৃপ্তি আস্বাদন করিতেন।

তাঁহার রাজত্বকালে রাজ্যের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিভাগে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া শিক্ষা বিস্তারের প্রচুর সহায়তা করিয়াছে। পূর্বে রাজধানীস্থ 'উমাকান্ত একাডেমিতে' দূর প্রান্ত হইতে ছাত্রেরা পাঠের জন্য সমবেত হইত কিন্তু এই সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁহাদের ঘরের কোণে শিক্ষার আলয় পাইয়া ইহাদের মধ্যে যে শিক্ষা বিস্তারের প্রবল সাড়া জাগিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

একটি উল্কাশিখার ন্যায় বীরেন্দ্রকিশোর ত্রিপুরার রাষ্ট্রগগনে ক্ষণিক জ্বলিয়া মাত্র ৪০ বছর বয়সে মর্ত্যলোক ত্যাগ করেন। যৌবনের প্রগলভ চাঞ্চল্য যখন প্রৌঢ় বয়সের সীমারেখায় পৌছিয়া স্তব্ধ গাম্ভীর্যে সুসম্বৃত হয় সেই বয়সের কোলে পদার্পণ করিতে না করিতেই মহারাজের হৃদয়বীণার তার সমস্ত রাজ্যে এক অশ্রুময় ঝংকার তুলিয়া সহসা থামিয়া গেল। দিনের পর দিন যেমন চলিয়া যায় মহারাজ তেমনি অনায়াসে আজিকার দিনেও হয়তো বার্ধক্যের একটিমাত্র রেখাও মুখের ওপর না ফুটাইয়া সেই চির প্রফুল্ল আননে বিরাজ করিতে পারিতেন। কিন্তু কালের নখরাঘাতে ফুটিতে না ফুটিতেই সেই কমল বৃন্তচ্যুত হইয়া ঝরিয়া গিয়াছে।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে মহারাজের মৃত্যু হয়।
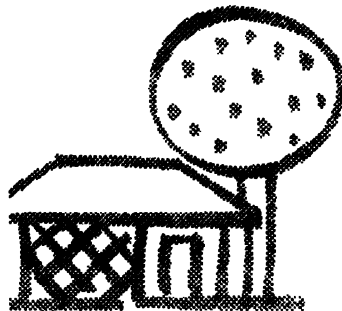
একটি বই উৎসর্গের কাহিনি

পুরঞ্জনপ্রসাদ চক্রবর্তী

শরৎচন্দ্রের সময়ে সাহিত্যিক হিসেবে জলধর সেনের বেশ নাম ডাক ছিল। তাঁর লেখা কিছু উপন্যাস ও গল্প বিখ্যাত। তা ছাড়া, তিনি একসময়ে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। একবার জলধর সেন 'উৎস' নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। বইটি প্রকাশ করতে তাঁর বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বইটি ছাপার জন্য কী করে অর্থ সংগ্রহ করবেন সে সম্পর্কে কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরামর্শ হয়েছিল। সে এক বিচিত্র কাহিনি। কাহিনিটি নিম্নরূপ ঃ

একদিন দুপুরে সাহিত্যিক জলধর সেন চুপচাপ বসেছিলেন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা অফিসে। টেবিলের উপর পড়েছিল তাঁর লেখা উপন্যাস 'উৎস'র কয়েকটি ছাপা ফর্মা। এমন সময়ে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা অফিসে প্রবেশ করলেন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। জলধর সেনকে বিষণ্ণভাবে বসে থাকতে দেখে তিনি খানিকটা চিন্তিত হলেন। হালকা পরিহাসের ভেতর দিয়ে জলধর সেনের বিষণ্ণভাব কাটিয়ে তোলার জন্য শরৎচন্দ্র আবৃত্তির সুরে বলে উঠলেন, 'একি জলধরদা! কেন আজি হেরি তব মলিন বদন?'

সাহিত্যিক জলধর সেন শরৎচন্দ্রের থেকে বয়সে বড়ো ছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁকে 'জলধরদা' বলেই সম্বোধন করতেন আর জলধর সেন শরৎচন্দ্রকে 'শরৎ' বলে সম্বোধন করতেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল প্রগাঢ়।

জলধর সেন চিন্তিতভাবে শরৎচন্দ্রকে বললেন, 'দেখ শরৎ, সব সময় ঠাট্টা ইয়ার্কি ভালো লাগে না। আমি মরছি, আমার নিজের জ্বালায়। কোথায় আমার এই বিপদের দিনে তুমি আমাকে একটু সাহায্য করবে, তা নয়, কেবল ইয়ার্কি করা হচ্ছে।'

শরৎচন্দ্র টেবিলের দিকে লক্ষ করেই বুঝতে পারলেন যে, ছাপানো ফর্মাগুলোই জলধর সেনের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি তখন চুপ করে রইলেন। জলধরবাবু শরৎচন্দ্রকে বলতে লাগলেন, 'দেখ শরৎ, 'উৎস'-ই আমার শেষ উপন্যাস। এরপর আমি উপন্যাস লিখব না স্থির করেছি। আমার যা কিছু সঞ্চয় ছিল সব ঢেলে দিয়ে এই উপন্যাসটি ছাপিয়েছি। এখনও প্রেসের সব টাকা দেওয়া হয়নি, বাইন্ডারকেও টাকা দিতে পারিনি। এখন কী করা যায় বল তো।' শরৎচন্দ্র তখন বিস্মিত হয়ে বললেন, 'এভাবে আপনি জীবনের সব সঞ্চয় খরচ করে ফেললেন? শরৎচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে জলধর সেন বললেন, "তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ যে, এভাবে আমি কেন নিজের অর্থব্যয় করে বই ছাপাতে গেলাম। এছাড়া আমার কাছে বিকল্প কোনো পথ খোলা ছিল না। পাণ্ডুলিপি নিয়ে আমি প্রকাশকদের দরজায় দরজায় গিয়েছি। ওরা বলে, আমার বইয়ের বিক্রি তেমন বেশি নয়। তা ছাড়া, আমার যে সমস্ত বই ওরা ছেপেছে, সেইসব বই বিক্রির কোনো হিসেবও ঠিকমতো দেয় না। নূতন বই ছাপানোর জন্য ওদেরকে অনুরোধ করতে আর ভালো লাগে না। তাই ভাবলুম, যা আছে কপালে, এবার আমার জীবনের শেষ উপন্যাস নিজের খরচেই ছাপাব। কিন্তু এখন দেখছি, সব সঞ্চয় ঢেলে দিলেও শেষ রক্ষা করা যাবে না।'

এই কথা শুনে শরৎচন্দ্র বললেন, 'এইজন্য আপনার এতো ভাবনা? কিছু চিন্তা করবেন না। আমি আপনাকে এমন একটা সহজ উপায় বাতলে দেব যে, আপনার কোনো অসুবিধাই হবে না।' শরৎচন্দ্র কথাটা এমন গুরুত্ব দিয়ে বললেন যে, জলধর সেন যেন খানিকটা ভরসা পেলেন। তিনি অনেকটা ভারমুক্ত হলেন।

টেবিলের উপর রক্ষিত জলধর সেনের উপন্যাসের ছাপা ফর্মাগুলো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে শরৎচন্দ্র বললেন, 'টাইটেল পেজ' এখনো ছাপা হয়নি দেখছি। বইটা কার নামে উৎসর্গ করবেন, কিছু স্থির করেছেন কী?'

জলধর সেনের চোখেমুখে যেন একটা সলজ্জ হাসির দ্যুতি খেলে গেল। তিনি দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'আমার যৌবনে সাহিত্যসাধনার প্রেরণাদাত্রী ছিলেন আমার প্রথমা পত্নী। তিনি আজ ইহলোকে নেই। বইটি আমি তাঁর নামেই উৎসর্গ করব ভেবেছি।

শরৎচন্দ্র একটু চিন্তা করে বললেন, 'দেখুন জলধরদা, সেইসব চিন্তা এখন বাদ দিন তো! আপনার প্রথমা স্ত্রীকে আপনি খুব ভালোবাসতেন, বুঝলুম। এখন সেই খবরটা এই বয়সে দুনিয়াসুদ্ধ লোককে জানিয়ে কী লাভ হবে, বলুন। আর তিনি তো এখন স্বর্গ থেকে নেমে এসে আপনার বই প্রকাশে সাহায্য করতে পারবেন না। এক্ষেত্রে এমন একজন লোকের কথা ভাবা যেতে পারে যাঁর নামে বইটা উৎসর্গ করলে বই প্রকাশে সাহায্য পাওয়া যাবে।

জলধরবাবু যেন এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। তিনি জানালেন যে, তিনি সেরকম কিছু ভেবে দেখেননি। শরৎচন্দ্র বললেন, 'একবার লালগোলার মহারাজ যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের কথা চিন্তা করে দেখেছেন কী? তিনি একজন সাহিত্যরসিক। বাংলার সাহিত্যিকদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধও অসীম। আমার মনে হয়, বইটা তাঁর নামে উৎসর্গ করলেই ভালো হয়। আপনি একদিন নিজে গিয়ে লালগোলার মহারাজের সঙ্গে দেখা করে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করে তাঁর হাতে একখানি বই তুলে দিন। তিনি নিশ্চয়ই আপনার হাতে কয়েক হাজার টাকা তুলে দেবেন।'

প্রস্তাবটা শুনে জলধর সেন খুশিই হলেন। তিনি শরৎচন্দ্রের বুদ্ধির তারিফ করে বললেন, 'সেইজন্যেই তো তোমার পরামর্শ চেয়েছি। তোমার পরামর্শটা মন্দ নয়, কিন্তু তবুও যেন এর মধ্যে একটা 'কিন্তু' থেকে যাচ্ছে।'

শরৎচন্দ্র চট করে কথাটা লুফে নিয়ে বললেন, 'আপনি হয়তো ভাববেন, বইটি লালগোলার মহারাজের নামে উৎসর্গ করা সত্ত্বেও যদি তিনি কিছুই না দেন। জলধর সেন সেরকমই ভাবছিলেন। তিনি বললেন, 'ওকে বইটা উৎসর্গ করা সত্ত্বেও যদি কিছুই না পাই তা হলে তো একূল-ওকূল—দুকূলই যাবে।' শরৎচন্দ্র তখন বললেন, 'তা হলে এক কাজ করা যাক জলধরদা। উৎসর্গ পত্রটি আপাতত ছাপার প্রয়োজন নেই। ওই পাতাটা কম্পোজ করে প্রুফটা ভালো করে দেখে নিয়ে সেই প্রুফটি ছাপা ফর্মার সঙ্গে জুড়ে দিলেই চলবে। আর বিলম্ব করবেন না। এই কাজটুকু অবিলম্বে শেষ করে কয়েকদিনের মধ্যেই লালগোলায় চলে যান। সেখানে যাবার আগে অবশ্যই মহারাজকে একখানা চিঠি লিখে যাবেন—এতে অবশ্য সেখানে যাবার প্রকৃত উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত করবেন না।' পরামর্শ দিয়ে শরৎচন্দ্র সেদিন 'ভারতবর্ষ' অফিস থেকে চলে এলেন।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। জলধর সেন লালগোলার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। যথাসময়ে ট্রেন এসে পৌঁছাল লালগোলা স্টেশনে। খবর পেয়ে স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন লালগোলা স্টেটের ম্যানেজার। তিনি সাহিত্যিক জলধর সেনকে যথাযোগ্য সংবর্ধনা জানিয়ে নিয়ে গেলেন রাজবাড়িতে। রাজবাড়িতে পৌঁছেই জলধরবাবু দেখা করতে চাইলেন লালগোলার জমিদার যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় এর সঙ্গে। কিন্তু স্টেটের ম্যানেজার তাঁকে প্রথমে নিয়ে গেলেন অতিথি ভবনে। সেখানে জলধরবাবু হাত-মুখ ধুয়ে নিলেন। তারপর আহ্বান এল জলযোগের। একেবারে যেন ভূরিভোজনের ব্যবস্থা। আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি নেই। তবে মহারাজের সঙ্গে তখনও দেখা হয়নি বলে জলধরবাবু খানিকটা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, মহারাজের সঙ্গে কখন দেখা-সাক্ষাৎ হতে পারে?' স্টেটের ম্যানেজার খুব বিনয়ী লোক। তিনি বিনীতভাবে বললেন, 'আপনি এতটা জার্নি করে এসেছেন—আপনি নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত। জলযোগ সেরে আজ আপনি বিশ্রাম নিন। আপনার আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি না হয়, মহারাজ সে কথাটা আমাকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আজ রাতে আপনার আহারের ব্যবস্থা হবে মহারাজের সঙ্গেই। সেই সময়েই মহারাজের সঙ্গে আপনার কথা হতে পারে। জলযোগ সেরে আপনি যদি এখন বেড়াতে চান, তবে গঙ্গার ধারে নিয়ে যেতে পারি।'

এর আগে জলধরবাবু কখনো লালগোলায় আসেননি। জায়গাটা ভালো করে একটু ঘুরে দেখারও ইচ্ছা হল। তিনি জলযোগ সেরে ম্যানেজারের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে গেলেন। বেড়াতে বেড়াতে জলধরবাবু ম্যানেজারকে বললেন, 'দেখুন, জায়গাটা তো ভারী সুন্দর! দেখে খুব আনন্দ হচ্ছে। তবে আমি তো জায়গা দেখার জন্য এখানে আসিনি। মহারাজের সঙ্গে দেখা করা আমার বিশেষ প্রয়োজন।' এস্টেটের ম্যানেজার বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'আপনাদের মতো দেশবরেণ্য সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে মহারাজ খুবই আনন্দ পাবো। আপনার সঙ্গে অবশ্যই তাঁর কথা হবে, তিনি এখন একটু ব্যস্ত আছেন। রাত্রে আহারের সময়ে উনি আপনার সঙ্গে বসে গল্পগুজব করবেন।'

ম্যানেজার এবং জলধরবাবু দুজনে গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে এলেন। অতিথিশালায় একটি বিছানা পরিপাটি করে সাজানো ছিল। জলধরবাবুর হাতমুখ ধুয়ে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। ম্যানেজার সেখান থেকে চলে গেলেন। বিছানায় শুয়ে জলধরবাবু ভাবতে লাগলেন, রাতে খাবারের সময়ে লালগোলার মহারাজের সঙ্গে দেখা হলে তিনি কথাটা কীভাবে উত্থাপন করবেন। এ সম্পর্কে তিনি মনে মনে একটা জল্পনা কল্পনা করতে লাগলেন।

রাত্রি নটার সময়ে ম্যানেজার এসে জানালেন যে, খাবার প্রস্তুত। খাবার টেবিলে মহারাজ জলধরবাবুর জন্য অপেক্ষা করছেন। জলধরবাবু গলাবন্ধ কোট পরে নিজেকে সুসজ্জিত করে নিলেন। বগলের নীচে বইয়ের ছাপানো ফর্মাগুলো নিয়ে তিনি ম্যানেজারের সঙ্গে চললেন।

জলধরবাবু সুসজ্জিত ডাইনিং হলে প্রবেশ করে দেখেন সৌম্য দর্শন মহারাজ টেবিলের একপ্রান্তে বসে তাঁরই জন্য অপেক্ষা করছেন। মহারাজ জলধরবাবুকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নির্দিষ্ট আসনে বসতে বললেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই খাবার পরিবেশন করা হল। দুজনে খেতে খেতে গল্প করতে লাগলেন। এক সময়ে মহারাজ ম্যানেজারকে ডেকে বলে দিলেন, আগামীকাল সকালে যেন জলধরবাবুকে পাশের গ্রামগুলো ঘুরিয়ে দেখানো হয়। জলধরবাবু খেতে খেতে বললেন, 'মহারাজের এত ব্যস্ত হবার কোনো কারণ নেই। কলকাতা থেকে এসেছি তো গ্রাম দেখার জন্যেই। তা ছাড়া, আমার বাল্যকাল কেটেছে গ্রামে গ্রামেই। গ্রামের আকর্ষণ আমাকে একেবারে পাগল করে তোলে।' এভাবে কথাবার্তা বলতে বলতে আহারপর্ব শেষ হয়ে গেল। আহারান্তে মহারাজ জলধরবাবুকে বললেন, 'কাল সকালে আপনি আমার সঙ্গে বসে চা খেলে খুব খুশি হব।'

কিন্তু জলধরবাবু সেই সময়ে প্রয়োজনীয় কথাটা বলতে পারলেন না। তাঁর মনে হল, কথাটা বলার মতো পরিবেশ যেন সৃষ্টি হয়নি। অতিথিশালায় ফিরে এসে জলধরবাবু শয্যা গ্রহণ করলেন। সারারাত ধরে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, বই উৎসর্গের ব্যাপারটা কী করে মহারাজের কাছে সুন্দর করে উত্থাপন করা যায়।

ভোর হল। জলধরবাবু ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে চায়ের আসরে যাবার জন্য তৈরি হয়ে নিলেন। ম্যানেজারবাবু এসে তাঁকে ডেকে নিয়ে গেলেন। জলধরবাবু তাঁর উপন্যাসের বান্ডিল সাথে করে নিয়ে যেতে ভুললেন না।

চায়ের টেবিলে জলধরবাবু আবার লালগোলার মহারাজের মুখোমুখি হলেন। মহারাজ জলধরবাবুর কুশলাদির কথা জিজ্ঞেস করলেন, জিজ্ঞেস করলেন গত রাতে ভালো ঘুম হয়েছিল কি না। জলধরবাবু জানালেন যে, মহারাজের ব্যবস্থাপনায় কোনো ত্রুটি নেই। খুব চমৎকার ঘুম হয়েছে। এ সমস্ত আলোচনার পরেই জলধরবাবু অতি সন্তর্পণে উপন্যাসের বান্ডিলটা বার করে মহারাজের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ভবিষ্যতে আর কোনো উপন্যাস লিখতে পারব কী-না কে জানে? এটাই হয়তো আমার শেষ উপন্যাস। আপনার নামেই.....।' কথাটা শেষ করার আগেই লালগোলার মহারাজ বললেন, 'এ নিয়ে আপনি এত ব্যস্ত হবেন না। সে হবে খ'ন। আপনি আগে ভালো করে চা-টা খান।' মহারাজের কথায় জলধরবাবুর চোখেমুখে একটা আনন্দের দ্যুতি খেলে গেল।

চা খেতে খেতে মহারাজ যোগেন্দ্রনারায়ণ এস্টেটের ম্যানেজারকে ডেকে বললেন, 'আশেপাশের গ্রামগুলো ওনাকে একবার ভালো করে ঘুরিয়ে দেখান। তা ছাড়া উনি কী কী খেতে ভালোবাসেন জেনে নিয়ে দুপুরে সেরকম ব্যবস্থা করুন। উনি সাহিত্যিক। দেশের বরেণ্য ব্যক্তি। ওনার যত্নাদির যেন কোনো ত্রুটি না হয়।' তারপর জলধরবাবুর দিকে তাকিয়ে মহারাজ বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, আমি এখন উঠি। আমার কিছু জুরুরি কাজ আছে। দুপুরে খাবার সময়ে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে।' উপন্যাসের ছাপানো ফর্মাগুলো চাদরের নীচে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে জলধরবাবু ম্যানেজারকে বললেন, 'চলুন তা হলে, গ্রামগুলো একবার ঘুরে দেখে আসা যাক্।

ম্যানেজারকে সঙ্গে নিয়ে জলধরবাবুকে আশেপাশের গ্রামগুলো ভালো করে ঘুরে দেখলেন। স্নানটান শেষ করার পর দুপুরের খাবারের জন্য ডাক পড়ল। লালগোলার মহারাজ যোগেন্দ্রনারায়ণ খাবার টেবিলে বসে জলধরবাবুর জন্য অপেক্ষা করছিলেন? জলধরবাবু হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেলেন খাবার টেবিলে। উপন্যাসের বান্ডিলটাও তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। বই উৎসর্গের ব্যাপারটা সুযোগমতো বলা যাবে কিনা চিন্তা করে জলধরবাবু প্রথমেই বগল থেকে বইয়ের বান্ডিলটা বের করে উৎসর্গের পাতাটা খুলে মহারাজের সম্মুখে তুলে ধরে বললেন—'আমার সাহিত্য সাধনা হয়তো এখানেই শেষ......' জলধরবাবুকে কথাটা শেষ করতে না

দিয়ে যোগেন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'আপনার এতো ব্যস্ত হবার কী আছে? আগে তো ভালো করে খাওয়া-দাওয়া সারুন। তারপর বিশ্রাম নিন। শুনলুম, আজ বিকেলেই আপনি কলকাতা ফিরে যাচ্ছেন। ম্যানেজার আপনাকে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে আসবে। আপনি এর জন্য এত ব্যস্ত হবেন না।'

খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে যাবার সাথে সাথেই লালগোলার মহারাজ যোগেন্দ্রনারায়ণ জলধরবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। বই উৎসর্গের কথাটা জলধরবাবু আর পরিষ্কারভাবে উত্থাপনই করতে পারলেন না। জলধরবাবু চিন্তা করে দেখলেন, সংকোচের জন্যই হয়তো মহারাজ মুখে কিছুই পরিষ্কারভাবে বলেননি। যা দেবার তিনি নিশ্চয়ই ম্যানেজারের হাত দিয়েই পাঠিয়ে দেবেন। হতাশার মধ্যেও যেন একটা আশার আলো দেখতে পেলেন জলধরবাবু।

বিকালে ট্রেন। লালগোলা এস্টেটের ম্যানেজার জলধরবাবুকে সঙ্গে নিয়ে স্টেশনের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। স্টেশনে এসে ম্যানেজার কিছুই বলছেন না দেখে জলধরবাবু বিস্মিত হলেন। এদিকে সময় গড়িয়ে চলেছে। ট্রেন আসার সময় হয়ে গেছে। জলধরবাবু বিচলিত হয়ে উঠলেন। এতক্ষণে ম্যানেজারের তো কর্তব্য চেকটা তাঁর হাতে তুলে দেওয়া। গাড়ি এসে গেলে তো আর দিতে পারবেন না। ম্যানেজার হয়তো চেকটা দিতে ভুলেই গেছেন। জলধরবাবু ভাবলেন, ম্যানেজারকে ব্যাপারটা স্মরণ করিয়ে দিলে কেমন হয়! এই ভেবে তিনি লালগোলা এস্টেটের ম্যানেজারকে বললেন, 'আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি; রাজবাহাদুর কী আপনার হাতে কোনো চেক্-টক্ দিয়েছেন?' ম্যানেজার বললেন, 'না-তো! তিনি শুধু বলেছেন, আপনাকে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে আসতে। চেক্-টেকের কোনো কথাই তিনি আমাকে বলেননি।'

দূর থেকে ট্রেন আসার ধোঁয়া লক্ষ করা গেল। ধীরে ধীরে ট্রেন এসে প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করল। জলধরবাবু একটা কামরায় উঠে পড়লেন। কিন্তু তিনি বারবার জানালা দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন, লালগোলার মহারাজের কাছ থেকে কোনো লোক আসে কি না। এদিকে ট্রেন ছাড়ারও সময় হয়ে গেল। একসময়ে জলধরবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে ম্যানেজারকে বলেই ফেললেন, 'দেখুন তো মশাই, রাজবাড়ি থেকে কোনো লোক ছুটতে ছুটতে স্টেশনের দিকে আসছে কি না।' ম্যানেজার ভালো করে তাকিয়ে দেখে বললেন, 'না তো, কোনো লোকই আসছে না।'

এদিকে ট্রেন ছাড়ার জন্য গার্ড সবুজ সংকেত দেখালেন। ইঞ্জিনের বাঁশি বেজে উঠল। এমন সময় দেখা গেল, একটা লোক সাইকেল চালিয়ে দ্রুত স্টেশনের দিকেই আসছে। অমনি জলধরবাবু চিৎকার করে ম্যানেজারকে বললেন, দেখুন তো লোকটা কে! ও মহারাজের কাছ থেকে কোনো চেক্টেক্ এনেছে কি না।'

লোকটা এতক্ষণে সাইকেল চালিয়ে স্টেশন চত্বরে ঢুকে গেছে। সে আর কেউ নয়—স্থানীয় একজন পরামাণিক। সে কবে স্টেশন মাস্টারের চুল কাটতে আসবে—এ সংবাদটা জানতে এসেছে। ম্যানেজার একথাটা জানালেন জলধর সেনকে।

ইতিমধ্যে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। জলধরবাবু চিৎকার করে লালগোলা এস্টেটের ম্যানেজারকে বললেন, 'বুঝলেন মশাই, শরৎচন্দ্র মানে বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই হচ্ছেন যত নষ্টের গোড়া। সেই আমাকে এখানে পাঠিয়েছিল।'

বাঘের গল্প

সাগরময় ঘোষ
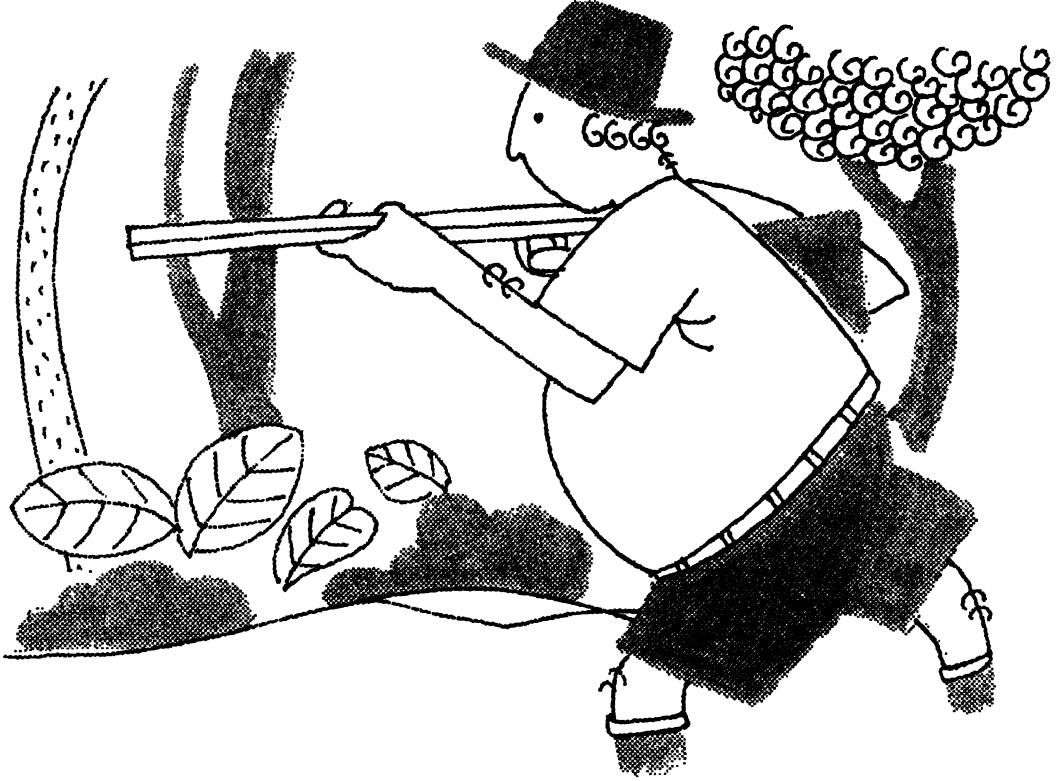
বাবুই বললে, 'বাবা, সেই দণ্ডকারণ্যের বাঘের গল্পটা বল না, যে বাঘটা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে সেই ছোট্ট আদিবাসী মেয়ে মুংরিকে বলেছিল—হালুম।'

আমার সাত বছরের ছেলে বাবুইয়ের ওই এক বায়না। দণ্ডকারণ্যের বাঘের গল্পই সে শুনতে চায়।

বাঘের রাজা সুন্দরবনের বাঘ, সে তো আমাদের বাংলা দেশেরই বাঘ। ইংরেজরা খাতির সম্মান করে যার নাম দিয়েছে 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার'। তার গল্প?

উঁহু। সুন্দরবনের বাঘ হলে চলবে না। ওর ধারণা সুন্দরবনের বাঘ শুধু নামেই রয়েল বেঙ্গল টাইগার। দুর্ভিক্ষের দেশে থেকে থেকে না খেতে পেয়ে ওদের সে-রাজকীয় চেহারাও নেই, হাড়-কাঁপানো হুঙ্কারও নেই। তা ছাড়া ওরই সমবয়সী পাড়ার দুই ভাই বারবেল আর ডামবেলের-এর কাছে ও শুনেছে যে সুন্দরবনের বাঘরা আজকাল উদ্‌বাস্তু হয়ে অন্য দেশে চলে গেছে শেয়ালদের উৎপাতে। শুধু গায়ের জোরে আর গলার চোটে কতদিন রাজত্ব করা যায়। বুদ্ধিতে শেয়ালদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না, বড়ো বেশি সরল। আর খেতেই যদি না পায় গায়ের জোর থাকবে কত দিন। যে-কয়টা তাও আছে তারা বড়ো বেশি অহিংস। ছাগল-ভেড়া পর্যন্ত তাদের দৌড়। মানুষের গায়ের বোটকা গন্ধ ওদের সহ্য হয় না, পেটের নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত উলটে আসে।

পাহাড় আর জঙ্গলের দেশ কুমায়ুনের বাঘের গল্পে তার রুচি নেই, ওরা রাতের অন্ধকারে চোরের মতো চুপি চুপি আসে, চুপি চুপি যায়ও। যাবার সময় গরিব চাষির ঘরের জানলা দিয়ে ঢুকে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে থাকা ছোট্ট ছেলেটাকে নিয়ে যায়। এসব ছিঁচকে-চোর বাঘের গল্প সে শুনতে চায় না।

তাহলে উড়িষ্যার জঙ্গলের বাঘের গল্প বলি।

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বাবুই বললে—'উড়িষ্যার বাঘের কথা আর বোলো না। শুনলেও হাসি পায়। ওরা খরগোস-হরিণ ধরেই খুশি। মানুষ দেখলে সে-তল্লাট ছেড়ে পালায়।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'তাই নাকি! এ-খবর তুমি কোথায় পেলে।'

উৎসাহের সঙ্গে বাবুই বললে—'এই তো সেদিন বারবেল-ডামবেল-এর মামা এসছিল উড়িষ্যার ঢেঙ্কানল থেকে। বারবেল-ডামবেল ধরেছিল ঢেঙ্কানেলের বাঘের গল্প বলবার জন্যে। বলতেই পারল না।'

আমি বললাম—'ঢেঙ্কানল রাজ্যের জঙ্গল আর বাঘের নাম শুনলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ওখানকার গল্পও বলতে পারল না? তাহলে বারবেল-ডামবেল-এর মামার বাঘ-শিকারের সাহস নেই। গল্প বলবেন কী করে।'

বাবুই তাঁর ছোটো-ছোটো দুই চোখ যতখানি সম্ভব বড়ো করে একরাশ বিস্ময় ঢেলে বললে—'তুমি কিছুই জানো না। বারবেল আর ডামবেল-এর মামা ম-স্ত বড়ো পালোয়ান। একবার ঘটির বাড়ি দিয়ে বাঘের মাথা থেঁতলে মেরে ফেলেছিল।'

আমি বললাম—'হতে পারে তিনি মস্ত বড়ো পালোয়ান, গামা বা গোবর কিংবা কিং-কংয়ের চেয়েও বড়ো পালোয়ান। তবে ঘটি দিয়ে তিনি বাঘ মারেন নি, মেরেছেন বাঘের মাসিকে। বাঘের মাসি কাকে বলে জানো তো?'

বারবেল আর ডামবেল-এর মুখে ওদের পালোয়ান মামার বীরত্বের গল্প ও এত শুনেছে যে আমার সাধ্য কী ওর বিশ্বাস টলাতে পারি। ওর ওই এক কথা—

'তুমি রোজ সকালে এক গাদা খবরের কাগজে মুখ গুঁজে বসে থাকো অথচ এই খবরটাই জানো না।'

আমি বললাম—'খবরের কাগজের সঙ্গে পালোয়ান মামার কী সম্পর্ক।'

—'বা রে। তুমি দেখ নি? বাঘ-শিকারের ছবি বেরিয়েছিল যে। কী একটা ইংরেজি কাগজে। বারবেল আর ডামবেল নিজের কানে শুনেছে ওদের মামার কাছে।'

—ঘটনাটা কী আগে শুনি?'

এবার বাবুই খাটের উপর নড়ে চড়ে উঠে বসল। উত্তেজিত হয়ে এক নিঃশ্বাসে বলে চলল সে—

'বাঘ শিকারের ছবি। একবার হয়েছিল কী গভীর জঙ্গলে মামা শিকার করতে গেছে। কাঁধে দোনলা বন্দুক। সারাদিন জঙ্গল তছনছ করে ফেললেন, বাঘ আর কোথাও খুঁজে পান না।'

আমি বললাম—'বাঘরা নিশ্চয় জানতে পেরেছিল যে বারবেল আর ডামবেল-এর মামা জঙ্গলে ঢুকেছে।'

বিরক্ত হয়ে বাবুই বললে—'আঃ, শোনোনা তারপর কি হল। খুঁজতে খুঁজতে বিকেল হয়ে এসেছে এমন সময় আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামল। মামা তো ভিজে ঢোল কিন্তু নাছোড়বান্দা। বাঘ না মেরে উনি জঙ্গল থেকে বেরোবেন না। অন্ধকার নেমে আসতেই ভিজে পোশাকেই গাছের ডালে উঠে পড়লেন। কিছুদূরেই একটা

ছোট্ট নদী। সারারাত সেই গাছের উপর বসে, মাঝে মাঝে ফ্লাস্ক থেকে গরম চা খাচ্ছেন। শেষরাত্রে যখন ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে হঠাৎ শুনলেন চক্ চক্ আওয়াজ। বাঘ নদীতে জল খেতে এসেছে। আর যাবে কোথায়। এক লাফে গাছ থেকে নেমে পড়লেন মামা। শব্দ শুনেই বাঘ ওঁর দিকে ঘুরে দাঁড়াল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, শুধু দেখা যায় আগুনের ভাঁটার মতো দুটো চোখ। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের দুটো নলে দুটো গুলি ভরে বাঘের দুটো চোখ তাক্ করে দুটো ঘোড়াই এক সঙ্গে টিপে দিলেন।'

তড়বড়িয়ে এক নাগাড়ে এতগুলো কথা বলে দম নেবার জন্যে বাবুই একটু থামল। খাটের উপর তাকিয়ার ঠেসান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় পালোয়ান মামার শিকার কাহিনি শুনছিলাম। একসঙ্গে বন্দুকের দুটো ঘোড়া টিপতেই আমি টান হয়ে বিছানায় উঠে বসে বললাম—

'তারপর কি হল? দুটো গুলিই বাঘের দু-চোখে লেগে তাকে অন্ধ করে দিয়েছিল তো?'

গম্ভীর হয়ে বাবুই বললে—'অন্ধ হয়ে গিয়েছিল ঠিকই তবে গুলিতে নয়, গুলতিতে।'

বুঝলাম, যেমন গুলিখোর মামা তার তেমনি দুই গুল্‌বাজ ভাগনে। এইজন্যেই শাস্ত্রে বলেছে—'নরানাং মাতুলক্রম,' মামার মতো ভাগ্নে হয় এ-ভূমণ্ডলে।

পাদলা ছানাই

শ্যামল ভট্টাচার্য

রিয়া ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে বলে, —ধ্যাৎ বোকা!

হীরেন ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে, —কে বোকা?

রিয়া ঘুমের মধ্যেই আঙুল তুলে বলে, ও! সানাই খাবে বলছে!

হীরেন হেসে জিজ্ঞেস করে, কে? কে সানাই খাবে?

আর জবাব নেই। মুখটা হাসি হাসি। হীরেন ওর চুল নেড়ে দেয়। ঘুমুক। বিকেল থেকে খুব ধকল গেছে। পায়ের ফোলাটা এখনো কমেনি।

দুপুরে টিভিতে 'পারমিতার একদিন' দেখে কেঁদেছে। ওর মায়েরও চোখ ছলছল। হীরেন বলে—এরকম ঋণাত্মক আশা করিনি!

জয়া বলে, —তা কোথায়? গল্পটার মধ্যে ট্র্যাজেডি থাকলেও পরিণতি তো একঘেয়ে কাহিনিগুলিকে মারো, এরা স্প্যাশটিক সোসাইটিকে বন্ধ পরিবেশের অনুকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছে মাত্র। অথচ এই ধরনের প্রতিবন্ধী নিরাময় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে যেসব কর্মী ও অভিভাবক অকূল ভবিষ্যতের ঢেউ গোনে তারা প্রত্যেকেই শিউরে উঠবে, হতাশ হবে।—এটা সীমাবদ্ধতা।

রিয়া নাচের স্কুলে যাবে বলে তৈরি হয়। হীরেন আগে থেকেই তৈরি হয়ে বসে আছে। জয়া বলে, নিশ্চয়ই সীমাবদ্ধতা, লেখক কিম্বা নির্দেশক মানুষকে নতুন পথ দেখাবে, ওদের দর্শনে আলোকিত হবে সমস্যা জর্জরিত মানুষ জন, কিছু আপাত স্মার্ট কথাবার্তা, ভালো আলোকপাত ও উন্নত টেকনিকই যথেষ্ট নয়!

—আসলে কি জানো, শুনেছি নির্দেশিকার ভাই এর সেরিব্রাল পাল্‌সি ছিল, মারা গেছে, সেই দুঃখটাই বুকে থেকে গেছে বলে, এমনিতে প্রত্যেকের অভিনয় কিন্তু অসাধারণ!

—ছাড়ো তো, নিজস্ব দুঃখ শিল্পে হতাশার উপকরণ হয়ে আসবে কেন? বরঞ্চ উলটোটাই প্রত্যাশিত ছিল! পারমিতার বন্ধু যদি বাবলু সহ পারমিতাকে আপন করে নিত—

রিয়া ভাবে নোটনের কথা। নোটন ওর মাসির ছেলে—ছোটোবেলা থেকেই সেরিব্রাল পাল্‌সি। ফলত কোমরের নীচের অংশে ঠিকমত গ্রোথ হয়নি। মানসিক বিকাশও খুব শ্লথ। দশবছর বয়স হয়ে গেছে। এখনও নিজে নিজে দাঁড়াতে পারে না, হাঁটতে পারে না। অথচ ওর স্মৃতিশক্তি প্রখর। যে-কোনো গান একবার ভালো লাগলে আর ভোলে না। ওকেও এই সিনেমায় দেখা গেছে। সেজন্যেই মহাউৎসাহে ওরা সিনেমাটা দেখতে বসেছিল। রিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবাকে ডাকে।

হীরেন মেয়ের পিছু পিছু সিঁড়ি ভেঙে নীচে নামে। ভীষণ মাথা ধরেছে। ও সিঁড়ির নীচ থেকে সাইকেল বের করে। রিয়া পেছনে বসে। হীরেন চালাতে শুরু করে। ইস্ কবে যে আমি ভালো করে সাইকেল চালাব?

—আগামী রবিবারে, অথবা তারপরের রবিবারে শিখেই তো গেছিস্। শুধু ওঠা আর নামাটা আর কীভাবে ইচ্ছে মতন গতি বাড়ানো ও কমানো যায়—ধ্যাৎ, এই সাতদিন পর পর শেখা এক বিরক্তিকর ব্যাপার! রোজ যদি অভ্যাস করতাম—তাহলে কবে যে শিখে যেতাম তাই না বাবা?

—ঠিকই তো! কিন্তু কী করবি! স্কুল আর টিউশন!

ঘ্যাঙর ঘ্যাং ঘ্যাঙর ঘ্যাং
ট্রা ট্যারা টরর্ ট্যাং—

রাস্তার পাশে জল। সারাদিন ধরে থেমে থেমে বৃষ্টি। আড়াই মাস ধরেই প্রায় রোজ থেমে থেমে আকাশ কাঁদছে। এই সময় ব্যাঙেদের খুব কষ্ট। জলের তোড়ে ঠিক মতন খাবার পায় না। সব সময় পেটে খিদে। তাই কিছুক্ষণ নামতা পড়ার মতন প্রকৃতির কাছে প্রার্থনা—ঘ্যাও ঘ্যাও ঘ্যাঙর ঘাও—ক্রমাগত বৃষ্টি থামাও

চাইনা স্রোত চাইনা ঢল—আমরা চাই অল্প মেঘ
আমরা চাই অল্প জল—যখন তখন বৃষ্টি কমাও
ঘ্যাঙর ঘ্যাং ঘ্যাঙর ঘ্যাং

একেক জনের শব্দ শুনে মনে হবে না জানি কত বড়ো সব জীব! জয়া তো গতকাল পাশের পার্ক থেকে একটা ব্যাঙের ডাক শুনে বলছিল—হাঁস ডাকছে।

হীরেন বলে, পার্কে হাঁস কোথা থেকে আসবে?

—তাই বলে, একটা ব্যাঙের ডাক চারতলা থেকে শোনা যাবে?

—তাই তো যাচ্ছে! হীরেন হেসে বলে, ভালো করে তাকিয়ে দেখতো কোথায় হাঁস?

সত্যি কোথাও কিছু দেখা যায় না। মনে হয় পার্কটাই ধাতব আর্ত চীৎকারে ডাকছে—ফ্যাং ফ্যাং ঘ্যাং ঘ্যাং ফ্যাং ফ্যাং

এখন রাস্তার পাশে জমা জলে একটা ধূসর কালো ইঞ্চি দেড়েক লম্বা ব্যাং কেঁপে কেঁপে ডেকে ওঠে, টরর্ ট্যাং ট্যাং—

—বাবা, এইটুকু ব্যাং এত জোরে শব্দ করে কেমন করে?

—শব্দ আসলে কী? হীরেন গলা ঝেড়ে বলে, কম্পন মাত্র। বাতাসে যতটা কম্পন সৃষ্টি হবে ততটাই। মহাকাশে বাতাস নেই, সেখানে শব্দও নেই! বিশাল কোনো গ্রহ এমনকি নক্ষত্রও যদি বিস্ফোরণে টুকরো টুকরো হয়ে যায় তবুও শব্দ শোনা যাবে না। অথচ আমরা ঝিঁঝির ডাকও শুনতে পাই—

—ঝিঁঝি কত বড়ো হয় বাবা?

—একটা কালোজামের মতন। অথচ এই ঝিঁঝির ডাক এক দেড়শো মিটার বা তারও বেশি দূর থেকে শোনা যায়?

রিয়া দেখে শামুকদের নিঃশব্দ মৌন মিছিলে যোগ দিয়েছে লাল কালো কেন্নোবাহিনী। এই কেন্নোদের ত্রিপুরায় বলে কেড়া। ঠাকুমা বলে, এই কেড়াদের কান দিয়া মাথায় ঢুইক্যা বংশবৃদ্ধির প্রবাদ আছে! তুই যা দুষ্টামি করছ, তোর মাথায় নির্ঘাত একটা কেড়া আছে! রিয়া বলে, ধ্যাৎ, কান দিয়ে ঢুকতে গেলেই সুড়সুড়িতে ঘুম ভেঙে যাবে!

ঠাকুমা তবু কেড়া ঠান্ডা করতে ওর মধ্য তালুতে গবগব করে নারকেল তেল দিয়ে দেয়।

—তেল দিলে কি কেড়া বেরুবে?

—না, গুটাইয়া গুল হইয়া থাকব! ঠাকুমা হাসে।

রিয়া বলে, ও সেজন্যেই বুঝি নিজের মাথায় এত তেল ঠাসো!

ঠাকুমা বলে, অসভ্য কোথাকার!

একেকটা কেড়ার অসংখ্য পা। পিসিমণি কেড়াকে বলে রেলগাড়ি। রিয়া রেলগাড়ি ভালোবাসে। রেলের মধ্যে সেরা দার্জিলিং এর টয় ট্রেন, তারপর শতাব্দী ও রাজধানী। দার্জিলিং এর ট্রেনের কথা ভাবলে ধীরে ধীরে ঝিকঝিক, তার মজাদার হুইশেল আর চারপাশের পাহাড়, অরণ্য, খাদ আর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাওয়া স্থানীয় শিশু-কিশোরদের হাসি ও খেলার কথা মনে পড়ে। আর মনে পড়ে 'ছাইয়া ছাইয়া....' শতাব্দী ও রাজধানীতে ভিড় নেই, ফাঁকা ফাঁকা, প্রচণ্ড গতি আর দারুণ খাওয়াদাওয়া। প্রথমে দু-একবার কলকাতার পাতাল রেল চড়েও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত! এখন আর তেমন লাগে না! বড়ো হতে হতে মানুষের ভালোলাগাও বোধ হয় পালটাতে থাকে।

কিন্তু রিয়ার বাবা, কাকু পিসি কিম্বা ত্রিপুরার যে-কোনো মানুষের কাছেই রেলগাড়ি একটা আহ্লাদ। বাবার ছোটোমামাকে রিয়া ছোড়দা বলে ডাকে। তিনি পাঞ্জাবে ওদের ওখানে বেড়াতে গিয়ে যখনই সময় পেতেন স্টেশনে গিয়ে বসে থাকতেন আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ বসে ট্রেনের আসা যাওয়া—লোকজনের ওঠানামা দেখতেন। রিয়া খ্যাপত। কিন্তু ছোড়দা তাতে বিন্দুমাত্র রেগে না গিয়ে হেসে বলতেন, তোরা বুঝবি না! আমরা পাণ্ডববর্জিত রাজ্যের লোক! আমি পাঁচবছর পাটনায় ডাক্তারি পড়েছি। বাড়ি গিয়ে যখন গল্প বলতাম তোর ঠাকুমা, ঠাকুর্দা, তোর বাবা ও কাকু পিসিরা গোল হয়ে বসে গল্প শুনত। তোর বাবা ট্রেনিং সেন্টার থেকে কিম্বা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটি গিয়ে যখন রেলযাত্রার গল্প শোনাত, আমরা সবাই তেমনি মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনতাম। আমাদের রাজ্যের লোকের কাছে জাহাজের গল্প আর রেলের গল্প দুটোই সমান!

হীরেন বৈমানিক। গতিই তার জীবন। ওর সঙ্গে জয়া এবং রিয়াও যাযাবর। কখনো কাশ্মীর, কখনো রাজস্থান আবার কখনো পাঞ্জাব। কিন্তু হীরেন পুরোদস্তুর বাঙালি। ও ঘুরতে চায়, কিন্তু নিজের শিকড়কেও দারুণ ভালোবাসে। রিয়ার গান শোনা, ছবি দেখা, গল্প পড়া ও তার সঙ্গে গল্প করা হীরেনের দারুণ লাগে।

দেখতে দেখতে নাচের স্কুল এসে যায়। রিয়া পায়ে ঘুঙুর বাঁধে। আজ এখন অব্দি আর কেউ আসেনি। ওরা না আসা অব্দি আন্টি ওকে ঝাপতাল নেচে দেখাতে বলে। রিয়া প্রথমে ঠেকার তালে পা ফেলে—ধিনা/ধি ধি না

তিনা/ধি ধি না.......!

আন্টি তারপর দ্বিগুণ বাজায়—ধি না ধি ধি/নাতি নাধি ধিনা/ধি ধি

তখনই হঠাৎ ডানপায়ের গোড়ালি থেকে একটা চিনচিনে ব্যথা হাঁটু অব্দি উঠে আসে। রিয়া তবু নেচে যায়। হীরেন তাকিয়ে থাকে, কখনো মেয়ের পায়ের ছন্দ, কখনো শিক্ষিকার তবলা বাজানো! কিছুক্ষণ পর মহিলা চৌগুণ বাজাতে শুরু করে—

ধি না ধি ধি নাতি নাধি / ধিনা ধিনা
ধি ধি নাতি নাধি ধিনা / ধি না ধি ধি
নাতি নাধি / ধিনা ধিনা ধি ধি না তি
নাধি ধিনা / ধা........—মাগো! বলে রিয়া ডান হাঁটুতে হাত দিয়ে বসে পড়ে।

কী হল রিয়া?

রিয়ার চোহারা যন্ত্রণাকাতর। ও গোড়ালি চেপে ধরে। আন্টি বুঝতে পেরে ছুটে গিয়ে দোতলার ভাড়াটের কাছ থেকে চেয়ে কয়েকটা আইসকিউব নিয়ে আসে। তারপর হীরেনের রুমালে বেঁধে আইসপ্যাক দেয়। ততক্ষণে অন্য মেয়েরা এসে যায়। হীরেন রিয়ার ঘুঙুর খুলে দেয়। আন্টি বলে, তুমি নিশ্চয়ই অন্যমনস্ক হয়েছিলে রিয়া, না হলে পা মচকাল কেমন করে? রিয়া ঠোঁট উলটে কাতর চোখে তাকায়। আন্টি বলে, যাও আজ বাড়ি যাও—ব্যথা পায়ে নাচতে পারবে না!

রিয়া ঘুঙুর ও নাচের খাতা ব্যাগে ঢুকিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সাইকেলের পেছনে গিয়ে বসে। হীরেন প্যাডেল ঘোরায় অতি সাবধানে। দু-জনেই চুপ। বড়ো রাস্তায় বাস, ট্রাক ও অটোরিক্সাগুলো গ্যালন গ্যালন ধোঁয়া ছেড়ে বাতাস ভারী করে দিয়েছে। আকাশ মেঘে ঢাকা থাকায় ধোঁয়ারা আর ওপরে উঠতে পারছে না। ফলে কুয়াশার মতন চাপ চাপ বিষাক্ত ধোঁয়া সমস্ত মানুষ ও জীবন্ত প্রাণীকে চেপে ধরছে। রাস্তার পাশে একটা নেড়ি কুকুর নিজের লেজের দিকেই দাঁত খিঁচিয়ে একই জায়গায় গোল গোল ঘুরছে। হীরেনের চোখ জ্বালা করে। কুকুরটারও কি চোখ জ্বলছে? রিয়ারও চোখ জ্বলে। তার ওপর পায়ের ব্যথাটা টনটন। সে বাবার কোমর চেপে ধরে।

হীরেন ধোঁয়ার সুড়ঙ্গ ভেদ করে ধীরভাবে এয়ারফোর্সের গেট দিয়ে ঢোকে। তারপর প্রশস্ত ট্যাক্সি ট্র্যাক ধরে সাইকেল চালায়। এখানে বাতাস কত নির্মল। দু-পাশে সারি সারি গাছ। হাঁটু সমান ঘাসবনের পায়ে পায়ে রাশি লজ্জাবতির ঘুঙুর। লজ্জাবতীর কুটি কুটি পাতায় বৃষ্টির জলবিন্দুতে কাছে দূরের গাড়ির আলোর প্রতিফলন চিকচিক করে। মনে হয় ঝাঁকঝাঁক জোনাকি। ঘ্যাঙর ঘ্যাং টরর টর্ ঘ্যাঙর ঘ্যাং ফ্যাং ফ্যাং—আবার ব্যাঙের ডাক। হীরেন রিয়ার মুড ঠিক করার জন্যে বলে, ওই দেখ, ব্যাঙেদের বাজার বসেছে!

রিয়া হেসে বলে, ঠিক বলেছ, ওরা কেউ আর নামতা পড়ছে না, যে যার নিজের মতন চেঁচাচ্ছে—ঘ্যাঙর ঘ্যাং কী যেঁ খাঁই?

হীরেন বলে, লালপিঁপড়ের ঠ্যাং চাঁই/ঠ্যাং না পেলে গোটা পিঁপড়ে বিষপিঁপড়ের মাথা খাই—মশার মুকবীট কোথায় পাই?

উঁই এরা সব ঘাসের ফাঁকে-ওদের রানি কই?

রিয়াকে ছড়া কাটতে শুনে হীরেন হেসে ফেলে। ট্যাক্সি ট্র্যাকে এখন আলো আঁধারি। ওরা হেলিকপ্টার হ্যাঙ্গার পেরিয়ে নিজেদের বিল্ডিং এ পৌঁছয়। রিয়া সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়িয়েই আবার কঁকিয়ে ওঠে। হীরেন তাড়াতাড়ি সাইকেল স্ট্যান্ড করে এসে রিয়াকে ধরে। বাবার কাঁধে ভর দিয়ে ও ধীরে ধীরে পা বাড়ায়। সিঁড়ি বেয়ে ওঠে। কিন্তু একতলার পরই ও কেঁদে ফেলে। গোড়ালিটা ফুলে গেছে। হীরেন বলে, দাঁড়া মা!

ও মেয়েকে পাঁজাকোলে তুলে নেয়। এই আগষ্টে মেয়ে তেরোয় পড়বে। বয়সের তুলনায় গ্রোথ ভালো। ওকে কোলে নিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে হীরেনের বেশ কষ্ট হচ্ছে। 'পারমিতার একদিন' দেখার পর থেকেই মেয়েটার মন খারাপ। আনমনা তালে পা ফেলে এই ছন্দপতন। চারতলায় উঠে দেখে দুধওয়ালা দাঁড়িয়ে। জয়া ওদেরকে দেখে অবাক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, কী হল? —কী আবার? হীরেন রিয়াকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়।

জয়া এসে সব শোনে। তারপর অনেকক্ষণ থমথমে সময়। জয়া কাঁচা হলুদ বেটে গরম করে লাগিয়ে দেয়। এক গ্লাস গরম দুধ খেয়ে রিয়া শুয়ে পড়ে। বাবা ওর মাথা নেড়ে দেয়। রিয়া আরামে চোখ বন্ধ করে। কিছুক্ষণের মধ্যে ও ঘুমিয়ে পড়ে। ঠোঁটটা কেমন যন্ত্রণাক্লিষ্ট। বন্ধ চোখের কোণে জল। মেয়ের এরকম চেহারা দেখতে অভ্যস্ত নয় ওরা। জয়া বলে, পা-টা বেশ ফুলেছে!

—হুম্, না কমলে সকালে ডাক্তার দেখাব!

তখনই আবার ঝমঝম করে বৃষ্টি। ক্রমাগত বৃষ্টিতে জল চুপসে দেওয়ালগুলি ভেজা। ঘরে ঘরে সর্দি কাশি জ্বর। ছাদে জল চুপসে জায়গায় জায়গায় ফেঁপে উঠেছে। কখনো রান্নাঘরে কখনো ব্যালকনিতে আবার কখনো বেডরুমে চুনসুড়কির চাপড়া ভেঙে খসে পড়ছে। ওভারকাস্ট ওয়েদারে চাপ চাপ ধোঁয়ায় কুণ্ডলী মানুষজন গাছপালা ও বাড়িঘরের গায়ে চেপে বসেছে। বৃষ্টিতে চুপসে বাড়িঘরের দেওয়ালগুলি ফুলে ফেঁপে ঢোল।

কেন্নোরা সব গোল গোল গুটিয়ে ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে আধুলি হয়ে আছে। শামুকেরা গুটিয়ে খোলের ভেতর অথবা দেওয়ালের গায়ে নরম চামড়া ছড়িয়ে প্রাণপণে আঁকড়ে, কাকেরা চুপসে কোনো-না-কোনো ব্যালকনিতে, ছাদের কার্নিশে, জালালি কবুতর আর চড়ুইরাও কার্নিশ কিম্বা ঘুলঘুলিতে মুখ লুকিয়ে। শুধু কেঁচোরা বুকে হেঁচড়ে এগোয়। রিয়া চোখ বন্ধ করে এতসব দেখতে পায়।

আর দেখে শ্যাওলা, সমস্ত কোয়ার্টারের দেওয়াল ও পাঁচিলে শ্যাওলা। পুরনো ফাইটার বিমানের খোলে শ্যাওলার আস্তরণ ও পিপঁড়ের বাসা একটা চিচিঙ্গে লতাকে ডেকে ককপিটে ঢুকিয়েছে। উইন্ডস্ক্রিনের পেছনে একটি

পুরুষ্ট চিচিঙ্গে, হঠাৎ দেখলে কেউ সাপ বলে ভুল করবে। নাকি সত্যি সত্যি সাপ। ও চিচিঙ্গে ভেবেছে। পিঁপড়ের বাসা ভিজে চুপসে। পিঁপড়েরা বিমানের পুরো খোলে উদ্‌ভ্রান্তের মতন ছোটাছুটি করছে। রিয়ার আঙুল ধরে নোটন।

নোটন? নোটন তো হামাগুড়ি দেয়! তালি তালি তালি নোটন একহাতের কব্জিতে অন্যহাতে তালি দেয়। রিয়া হাত বাড়ায়। আর ওকে অবাক করে দিয়ে নোটন উঠে। তারপর টিক টিক ঠিক ঠিক হাঁটি হাঁটি পা পা! ট্যাক্কি ট্র্যাকে নোটন হাঁটে।

নোটন হাঁটে? কষ্ট হচ্ছে ওর? ওমা, প্যান্ট হিসুতে ভিজে গেছে! রিয়া ভাবে, এখন ও হাঁটুক, কে আর দেখছে? ঘরে ফিরে প্যান্ট পালটালেই হবে। নোটন এখন হাঁটুক। রিয়া কি স্বপ্ন দেখছে? হোক স্বপ্ন তবু হাঁটুক!

নোটন কত হেঁটে যাওয়ার কথা বলেছে! কতো ফিজিওথেরাপি, হাইড্রোথেরাপি কতদিন, কত মাস, কত বছর ধরে হাত ও কোমর কাঁপিয়ে হামাগুড়ি দেয়ও। হেঁচড়ে চলে, হাত-পা বাঁকিয়ে খায়, মুখ বাঁকিয়ে কথা বলে, ট্যারা চোখে তাকায়—ওদের স্কুলের প্রত্যেকটি বাচ্চা অনেক পরিশ্রমে যতটা উন্নতি হয়, হঠাৎ করে একদিন কনভালসান হয়ে গেলেই আবার অনেক পিছিয়ে পড়ে। তবু দুই হাঁটু এগিয়ে এক হাঁটু পিছিয়ে ওরা স্বপ্ন দেখে। নোটনের ক্লাশ এইট, আর দশ বছরের মধ্যেই প্রয়োজনীয় পড়াশুনা করে এরকম স্প্যাশটিক সোসাইটিতে কাজ নেবো।

—হাঁটরে নোটন আমার পায়ে ব্যথা তবু হাঁটছি, কী যে ভালো লাগছে!

নোটন গান ধরেছে,—হাত পেতে নিয়ে চেতে পুতে খাই, বিছমিল্লার পাদলা ছা-না-ই! ওর গান শুনে বাতিল হয়ে যাওয়া বোমারু বিমানটার মুখ হা হয়ে যায়। গোলাপি রোম রোম ফুলের ডালি নিয়ে হা-মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে একগুচ্ছ লজ্জাবতী পাতা। পাতার ওপর জমা জলে আলো ঠিকরায়।

—জানিস্ নোটন, এরকম আলোকেই উর্দুতে বলে 'শবনম্'

নোটন বলে,—থবনম?
রিয়া বলে, ঠিক করে বল -শ-!
নোটন বলে, স্-শ-অ! থবনম্!
রিয়া জানে ও এবার দুষ্টুমি করে বলছে। ও নোটনের গাল টিপে দেয়।
নোটন একটা অদ্ভুত তীক্ষ্ণ আওয়াজ করে, ই-ই-ই-ই....!!

একটি স্মরণীয় উপহার

সুবীর ভট্টাচার্য
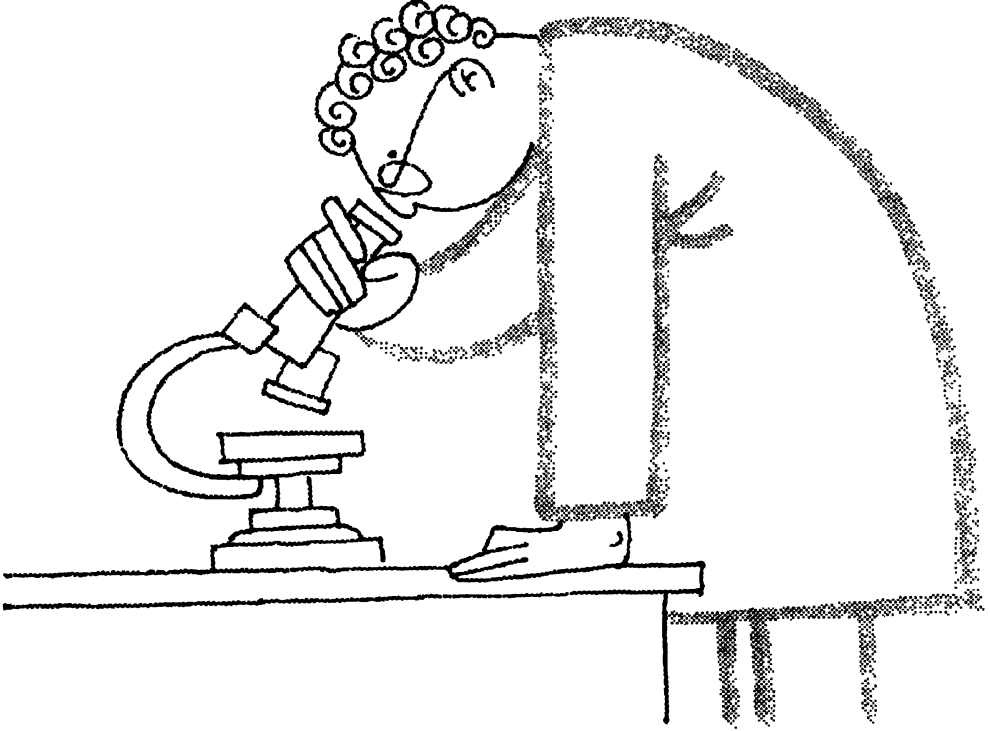
সবার উদবিগ্ন চোখের সাম্‌নে ছেলেটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। কান্নায় ভেঙে পড়লেন মা, আছড়ে পড়লেন মৃত সন্তানের পাশে—“আমার খোকাকে ফিরিয়ে দিন ডাক্তারবাবু—আমার খোকাকে ফিরিয়ে দিন।”

ডাক্তার খোকাকে ফিরিয়ে দিতে পারেননি। বিব্রত, পরাজিত, অসহায় ডাক্তার নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

বাড়ির পথে ডাক্তার ভাবছিলেন—“কী হবে আর ডাক্তারি করে, যদি মায়ের খোকাকেই বাঁচিয়ে তুলতে না পারি?”

কোনো অবহেলা বা ত্রুটি ছিল না ডাক্তারের দিক থেকে—তবুও সুস্থ করে তুলতে পারলেন না খোকাকে। আর পারবেনই বা কি করে! রোগের সঠিক কারণটাই তো তাঁর অজানা।

চিকিৎসা জগতে তখন শুধু উপসর্গ আর লক্ষণ মিলিয়েই চিকিৎসা হত—রোগের কারণ ছিল তখন অজানা।

ডাক্তারের কানে তখনও সন্তানহারা মায়ের হাহাকার ভেসে আসছিল। তিনি স্থির করলেন; “না, আর চিকিৎসা-বিদ্যা চর্চা নয়, আমি অন্য কিছু করব।”

জার্মান-পল্লির ডাঃ রবার্ট কক্‌ এখন আর চিকিৎসক নন—তিনি জমিজমা নিয়ে ব্যস্ত। রোগী দেখার গুরু দায়িত্ব এখন আর তাঁর নেই—তাই প্রচুর অবসর।

তবু, ডাঃ কক যেন মনমরা, কি যেন ভাবেন সব সময়। হয়তো সেই মায়ের কথা—"আমার খোকাকে ফিরিয়ে দিন ডাক্তারবাবু।"

ডাঃ ককের স্ত্রী স্বামীর জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লেন। নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন স্বামীকে আবার স্বাভাবিক মানুষ করে তুলতে। কিন্তু ডাঃ কক-এর ভারী মন যেন হালকা হতেই চায় না।

ঠিক এমন সময়, ডাক্তারের জন্মদিনে স্ত্রী উপহার দিলেন এক নতুন যন্ত্র। হালে বেরিয়েছ যন্ত্রটি—এক নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, নাম অণুবীক্ষণ যন্ত্র। এঠা দিয়ে নাকি খালি চোখে দেখা যায় না এমন সব জিনিস তো দেখা যায়ই, তা ছাড়া সেগুলোকে নাকি অনেক গুণ বড়ো আকারে দেখা যায়।

ডাক্তার-পত্নীর আশা, এবার হয়তো ডাক্তার এই নতুন যন্ত্র নিয়ে মেতে উঠবেন, ভুলে যাবেন রোগের কাছে তাঁর পরাজয়ের সেই দুঃখময় ঘটনা। ঠিক হলও তাই।

এই যন্ত্রটা নিয়ে শিশুর মত মেতে রইলেন ডাঃ কক। হাতের কাছে যা পান—গাছের পাতা, কীটপতঙ্গ, পশু-পাখির রক্ত—সব কিছুই এই নতুন যন্ত্রে দেখতে লাগলেন তিনি। সাদা চোখে দেখা সব পুরোনো জিনিসগুলোই গভীরভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন তিনি। অবসর সময়টা তাঁর ভরে উঠল এই নতুন খেলায়—যেন আত্মভোলা এক শিশু মেতে রয়েছে তার খেলা ঘরে নতুন কোনো খেলনা নিয়ে।

গ্রামে ভেড়ার পালে মড়ক শুরু হয়েছে। মাঝে মাঝেই এরকমটা হয়। অদ্ভুত এক রোগে ভেড়ার পাল মরে সাফ্ হয়ে যায়। কপাল চাপড়ানো ছাড়া আর করার কিছু নেই! শুধু কতটা রক্ষা পাবে তার জন্যে ভগবানের দোরে মানত্ করা।

খেলাঘরে মত্ত ডাঃ কক-এরও কিছু করার নেই। হঠাৎ তাঁর মনে হল—"ওই অসুস্থ ভেড়ার রক্ত এনে দেখলে কেমন হয়।" যেমনি ভাবা তেমনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার অসুস্থ ভেড়ার রক্ত জোগাড় করে আনতে। এই রক্ত নতুন যন্ত্রে কেমন দেখা যায় এই ছিল ডাঃ কক্ এর একমাত্র কৌতূহল।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সেই রক্ত চাপিয়ে দেখতে লাগলেন ডাক্তার, কিন্তু ও কী? ওগুলো কী? লম্বালম্বা বাঁশের টুকরোর মত ওগুলো কী ছড়িয়ে আছে সমস্তটা জায়গা জুড়ে। মন দিয়ে দেখতে লাগলেন তিনি। নাঃ, সুস্থ ভেড়ার রক্তে তো কোনোদিন এগুলি চোখে পড়েনি! বোধ হয় ধুলো ময়লা মিশে তাঁর সমস্ত খেলাটাই মাটি হয়ে গেল।

আবার সযত্নে রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন তিনি। কিন্তু, সেই একই দৃশ্য। ছুটলেন ভেড়ার পাল থেকে সুস্থ ভেড়ার রক্ত এনে দেখবার জন্য। নাঃ, সুস্থ ভেড়ার রক্তে তো এগুলো দেখা যাচ্ছে না! তবে কি এই অদ্ভুত জিনিসগুলোর জন্যেই ভেড়ার পালে এই রোগের সৃষ্টি?—মনে প্রশ্ন জাগল তাঁর।

ডাক্তারের খেলাঘর এবার রূপান্তরিত হল পরীক্ষাগারে। সুস্থ ভেড়ার মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে এই অদ্ভুত জিনিসগুলোও ডাক্তারের চোখে ধরা পড়ল। তিনি লক্ষ করলেন—রোগের প্রকোপ যত বাড়ে রক্তে অদ্ভুত জিনিসগুলোর সংখ্যাও তত বেড়ে চলে। তবে কী এগুলো জীবন্ত?

ডাক্তার কক, রোগ এবং জীবাণুর মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক—একটা যোগসূত্র যেন খুঁজে পেলেন।

তিনি বিশ্বাস করলেন—প্রায় প্রতিটি রোগের মূলে রয়েছে এই রকম সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু—যাদের খালি চোখে দেখা যায় না। অথচ রোগের উৎস এরাই। এদের ধ্বংস করতে পারলেই রোগমুক্তি।

এরপর সারা পৃথিবী জুড়ে ডাক্তার কক ছুটে বেড়ালেন এইসব অদৃশ্য অপরাধীদের খুঁজে বের করতে; মানুষের কাছে প্রকাশ করে দিলেন এদের বীভৎস রূপ আর প্রকৃতি। মানুষ এবার সচেতন হবার সুযোগ পেল।

পৃথিবীর যে দেশে যখনই কোনো রোগের মহামারী দেখা গেছে, ডাঃ কক ছুটে গেছেন সেখানে। জীবাণু নামক সেই আসামিকে ধরে ফেলেছেন তিনি, পরিচয় ফাঁস করে দিয়েছেন তার।

কলকাতায় ছুটে এলেন তিনি। সারা বাংলাদেশ জুড়ে তখন কলেরার মহামারী। ডাঃ ককের অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ল—কলেরার জীবাণু। প্রমাণ করলেন তিনি, এই জীবাণুই এই রোগের মূলে।

সেই মায়ের কোলে খোকাকে ফিরিয়ে দিতে না পেরে পরাজিত ডাঃ কক ঘরের কোণে আশ্রয় নিয়েছিলেন, কিন্তু আজ চিকিৎসা জগতে আধুনিক জীবাণুবিদ্যার তিনি জনক বলেই সুপরিচিত।

সেই খোকাকে তিনি ফিরিয়ে দিতে পারেননি। তবে আজ তাঁরই কল্যাণে কোটি কোটি খোকা মায়ের কোল আলো করে আছে নিরাপদে, নির্ভয়ে।

ডাক্তার রবার্ট ককের অধ্যবসায় চিকিৎসা জগতে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে; রোগমুক্তির একটা পথ খুঁজে পেয়েছে মানুষ। কিন্তু যে মহীয়সী মহিলা, ডাঃ কক-এর স্ত্রী—যাঁর জন্মদিনের সামান্য উপহারটিই এ সমস্ত গবেষণার মূলে—তাঁকেই আমরা ভুলি কি করে।
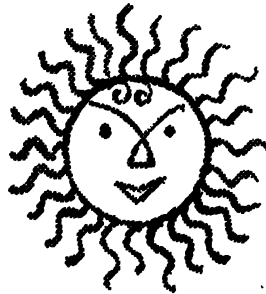
বুলবুলির বাসা

দীপালিকা দাস
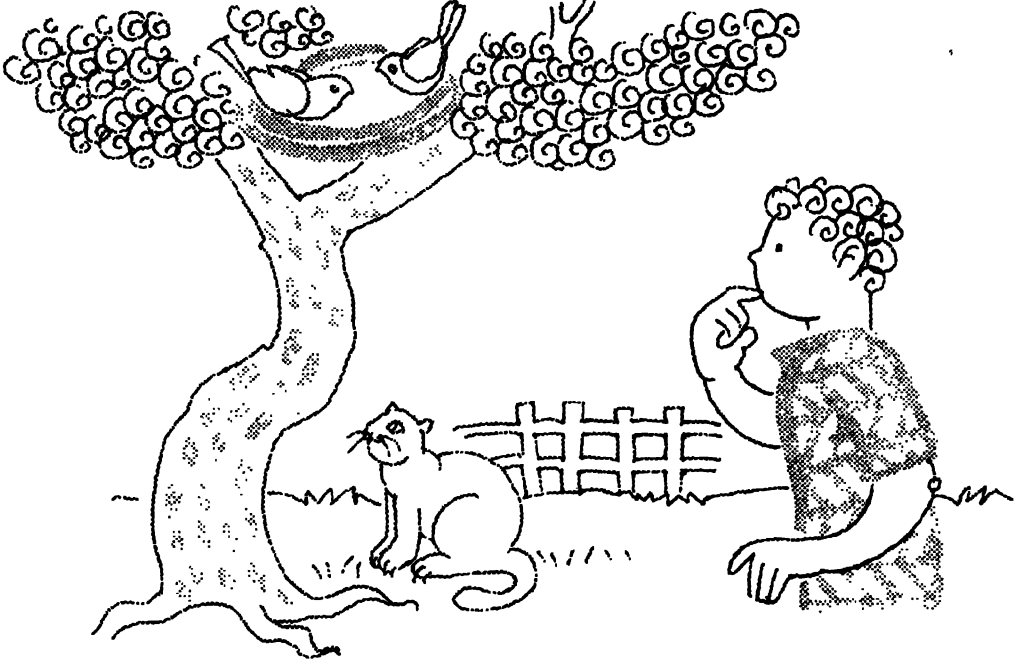
টুলটুলদের বাড়িটা বেশ বড়ো। তাই বাড়িতে আসা যাওয়ার জন্য দুটি গেট আছে। বাড়ির সামনের দিকে একটি এবং পেছনের দিকে একটি গেট। পেছনের গেটের সাথেই একটি পেয়ারা গাছ আছে। বাড়ির পেছনের গেট দিয়ে তেমন আসা, যাওয়া তাদের হয় না।

তবে দক্ষিণের ঘরটার পরই এবং পেছনের গেটের আগে বেশ কিছুটা জায়গা আছে। সেটাও দেখতে এক চিলতে উঠোনের মতো। এখানে বেশ ভালোভাবেই ক্রিকেট খেলা যায়। কিন্তু টুটুল তারা একবোন, এক ভাই। বোনের সঙ্গে কি আর ক্রিকেট খেলা যায়। তাই টুটুলের সাথীও তেমন কেউ নেই ক্রিকেট খেলার জন্য। তবে মাঝে মাঝে টুটুলের বাবার যদি তাড়াতাড়ি অফিস ছুটি হয়ে যায় তখন বাবার সাথে খেলে। সেদিন রবিবার ছুটির দিন বলে টুটুলের ছোটোমাসি তার দুই ছেলেকে নিয়ে এবং তাদের সঙ্গে টুটুলের এক মামাতো ভাই তাদের বাড়িতে বেড়াতে এল। টুটুল পেয়ে গেল তাঁর ক্রিকেট খেলার সহসঙ্গী। সারাদিন হৈ, চৈ খাওয়া, দাওয়া এবং বিকেলে চার ভাই মিলে নেমে গেল ব্যাট, বল হাতে নিয়ে খেলতে। কিন্তু কোথায় খেলবে। টুটুল বলল চল পেছনের গেটের দিকে চলে যাই। সেখানেই ভালো হবে। সেখানেই সবাই গেল। খেলা শুরু হল। হঠাৎ পোয়ারা গাছে-চি-চি-চি-চি কিছু একটা শব্দ হচ্ছে। শব্দটা প্রত্যেকেই পেল। টুটুল এর মামাতো ভাই চয়ন বলল, দেখ, দেখ পেয়ারা একেবারে নীচের দুটি ডালের মাঝখানে একটা পাখির বাসা।

সবাই তার কথায় পেয়ারা গাছের দিকে তাকাল। টুটুল বলল, তাইতো। কী পাখির বাসা হবে রে টুটুল

তার মামাতো ভাই জিজ্ঞাসা করল। এমন সময় টুটুলের মাসতুতো ভাই বলল দেখ, একটা বুলবুলি পাখি উড়ে এসে ডালটিতে বসেছে। মনে হয় এটা বুলবুলি পাখির বাসা, দেখতে দেখতে আরেকটি পাখি উড়ে এল। তারা সবাই বুঝতে পারল বাসাটিতে পাখির বাচ্চা আছে। এই দুটি বুলবুলি পাখি তাদেরই মা এবং বাবা। টুটুলদের দূর থেকে দেখে হয়তো উড়ে এসে ডালটিতে বসেছে। যদি কেউ বাচ্চাদের ওপর আক্রমণ করে এই ভয়ে। টুটুল এর মামাতো ভাই চয়ন একবার গাছে উঠে বাচ্চাদের দেখতে চাইল ; কিন্তু মা এবং বাবা পাখি দুটির ভয়ে ওর সাহস হল না শেষ পর্যন্ত। তবে পাখির বাসাটি দেখে টুটুল এর বেশ ভালো লাগল। সন্ধ্যা নেমে আসায় তারা সবাই ঘরে ফিরে এল। ঘরে এসে টুটুল মা, বাবা, মাসি সবাইকে বলল পাখির বাসাটির কল, সবাই শুনে কেউ বাসাটির ক্ষতি করনি তো। ঢিল ছোঁড়নি তো কেউ। সবাই মাথা নেড়ে বলল না, মাসি তার দুই ছেলে ও মামাতো ভাই চয়ন সন্ধ্যার পর বাড়ি চলে গেল। টুটুল ও তার বোন দু-জনেই পড়তে বসেছে। টুটুলের মনে কত কৌতূহল। কীভাবে এত সুন্দর করে একটি বাসা বানাল দুটি ছোট্ট পাখি, মানুষের চেয়েও এরা বেশি শিল্পী। মাকে প্রশ্ন করতেই মা বলল ওরা ঠোঁট দিয়ে খড়কুটো এনে এই ঘর বানায়। ওদের পরিশ্রম হয় না। মা বলল—পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং নিয়ম শৃঙ্খলা ছাড়া কি কিছু হয়। এগুলি কি মানুষ, কি পশু পাখি সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এমনকি প্রকৃতি তার নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলে। তাই তো আমরা প্রভাতে সূর্য ও রাত্রে চন্দ্রকে উঠতে দেখি আকাশে, ঋতুচক্রের আবর্তন হতে দেখি। কিন্তু মা এই যে বাতাস, ঝড়, বৃষ্টি হয় তাতে পাখির বাসা ভেঙে যায় না। কোনো কোনো সময় ভেঙে পড়ে যায়। তখন কী করে পাখিগুলি। আবার নতুন বাসা বানায়। রাত্রে বাচ্চাগুলোর ভয় করে না। কেন ভয় করবে। অন্য কোনো পশু-পাখি যদি তাদের মেরে ফেলে। পাশে তো পাখিগুলির মা-বাবাই থাকে। মা এবং বাবা পাখি তাদের বাচ্চাদের কোলে তুলে পাখার নীচে লুকিয়ে রাখে। তবে মাঝে মাঝে যে অন্য পশু-পাখিরা তাদের আক্রমণ করে না তা নয়। যেমন—কাক, বিড়াল। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করেই সবাইকে বাঁচতে হয়। পাখিরাও বেঁচে থাকে এইভাবে। তা-না হলে কী আমরা এত নানা জাতের পাখি দেখতে পেতাম। মার মুখে বিড়াল এর কথাটা শুনে বুকটা কেঁপে উঠল টুটুলের। সঙ্গে সঙ্গে মাকে বলল মা রানাদাদের টুনি না কি যেন নাম বিড়ালটার সেও কি পাখি মেরে খায়। পেলে তো অবশ্যই খায়। তাহলে কী পেয়ারা গাছে বুলবুলির বাচ্চাগুলিও দেখলে খেয়ে ফেলবে। অবশ্যই খেয়ে ফেলবে নয়তো মেরে ফেলবে। টুটুলের বোন এতক্ষণ তার পাশেই ছিল। ছোটো ভাই এর এত প্রশ্ন শুনে বলল তোর এত চিন্তা কেন পাখির বাচ্চাদের নিয়ে, বলতো টুটু। নিজে পড়বি না, আমাকেও কি পড়তে দিবি না। টুটুল আবার কি যেন বলতে চাইছিল, টুটুলের মা বলল দিদি ঠিকই বলেছে। আর একটি কথা ও নয়। এবার অঙ্কগুলি করে ফেল।

পরের দিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে গেল টুটুল। এরপর দৌড়ে গেল পেয়ারা গাছের নীচে গিয়ে দেখে পাখির বাসাটি ঠিকই আছে। তার চিন্তা ছিল রাত্রেই যদি রানাদাদের বিড়াল টুনি বাসাটি খেয়ে ফেললে তা হলে তো আর রক্ষা নেই। এবার থেকে টুটুল নজর রাখে বিড়াল টুনির ওপর।

সকাল হতে না হতে ওদের বাড়িতে এসে হানা দেয় টুনি। কখন আক্রমণ করে বসবে পাখিদের ওপর কে জানে। মাঝে, মাঝে বিড়ালটা মিউ, মিউ ডাকতে ডাকতে লেজ তুলে গাছটির নীচে দিয়ে আসে। টুটুল দেখে পাখিগুলি তখন খুব নজর রাখে টুনির ওপর।

একদিন গেট বন্ধ থাকায় পাঁচিল বেয়ে টুটুলদের বাড়িতে আসার সময় টুনির নজর পড়ল পাখির বাসাটির ওপর। আর যায় কোথায়, কিছুক্ষণ গাছের নীচে লেজ গুটিয়ে মাথাটি তুলে পাখির বাসাটির দিকে তাকাল।

এরপর এক লাফে গাছে উঠে গেল। টুটুল দেখতে পেয়েই তাড়িয়ে দিল লাঠি দিয়ে টুনিকে। বেচারা টুনি ওদের ঘরে ঢুকে গেল। তারপর মিটমিট করে তাকাল টুটুলের দিকে। আবার মুখ ফিরিয়ে নিল। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে টুটুলের মায়া হল। আবার তাকাল পিট্‌পিট্‌ করে টুটুলের দিকে তাকিয়ে মিউ-মিউ করে ডেকে উঠল। যেন বলছে—আমি কি দোষ করেছি। আমি তো শিকার, ধরতে গিয়েছিলাম। মনে পড়ল মা বলেছিল খাদ্য-খাদ্যকের সম্পর্ক বলে তো পশু-পাখি একে অপরকে খায়। যাকে বলে খাদ্য-শৃঙ্খল।

তবু বুলবুলি পাখিদের ওপর যাতে কিছু আক্রমণ না করতে পারে তাই কড়া পাহারা দেয় টুটুল স্কুল থেকে ফিরে সারাদিন। শুধু রাত্রি বাদে। প্রত্যেক দিন ভোরের মত, সেদিনও ভোরে উঠে টুটুল গেল পেয়ারা গাছটার নীচে গিয়ে দেখে পাখির বাসা ঠিকই আছে। কিন্তু পাখিগুলি নেই। কী হল তাহলে কী টুনটুনিই শেষ পর্যন্ত খেয়ে ফেলল নাকি। গাছের নীচে এসে এদিক, ওদিক দেখল, না-তো কোথাও পাখির পালক কিংবা রক্তের দাগ নেই তো। দৌড়ে ঘরে গিয়ে মাকে ডেকে আনল টুটুল। টুটুল এর মা সব দেখে বলল মনে হয় পাখিগুলি বাচ্চাদের নিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। একথা শুনে মনে দুঃখ পেল টুটুল আবার মনে মনে বলল যদি অন্য কোথাও চলে যায় তাহলে তো ভালোই হল টুনির হাত থেকে তো রক্ষা পেল।
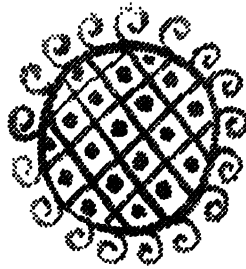
সু-পুতুলের গল্প

দীপক দেব
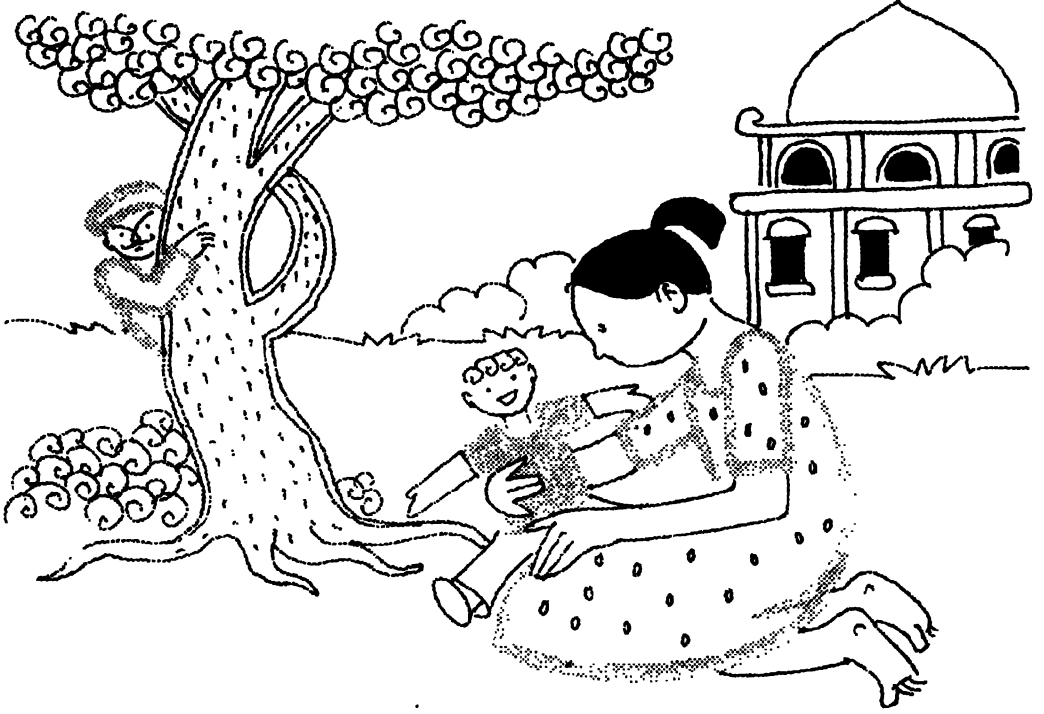
এক

সকাল হয়েছে মাত্র। আজকাল কুয়াশাও কম পড়ে। অনেক কচিকাঁচারা রাস্তায় ইতস্তত ছোটাছুটি করে। সর্দি হয় না। খেলাধুলা করে। পড়াশুনা এখন কম। ধান কাটা হয়ে গেছে। প্রজারাও নিশ্চিন্তে আছে। আর রাজামশাই, খুব ভালো। প্রজাদের সাথে হাত লাগিয়ে ধানচাষ করেন। শাক সবজি লাগান। রাজা বড়ো আপনার। সবাইকে তো খাওয়ার দিতে হবে নইলে কি করে হবে! একা খেলেই কী চলে! এরকম রাজা নাকি রামের পর হননি, বলেন বড়ো মন্দিরের পুরোহিত।

সবে সকাল হয়েছে। রাজামশাই একটা কাঠের চেয়ারে বসে বাগান দেখছিলেন। বিশাল বাগান। বাগানে কি নেই! সব গাছ আছে। সব জাতের ফুল, ফল। প্রজারা এসে অনেক সময়ই ফুল তুলে নেয়। ফল পেড়ে বাড়িতে নিয়ে যায়। রাজার আদেশ শুধু, নষ্ট করতে পারবে না। যা নেবে সব ঠিকঠাক মতো ব্যবহার করতে হবে। প্রজারা তাই করে, কারণ রাজাকে তারা ভীষণ ভালোবাসে, রাজাও ভালোবাসেন প্রজাদের। তো রাজা বসে আছেন। সূর্যের প্রথম আলো বাগানের ওপর পড়ে চিক চিক করছে। এখন ছায়াহীন। আকাশ পরিচ্ছন্ন। পাখিরা শীত কাটিয়ে বাগানে ওড়াওড়ি করে। রাজা মশাই দেখেন। পাশেই পিচ রাস্তা। দূর থেকে কেউ আসে রাজার বাড়ির দিকে। রাজামশাই দেখেন। লোকটাকে এবং বাগানকে। লোক ও বাগান দুটিই দেখতে ভালোবাসেন রাজা।

—পেন্নাম হই রাজামশাই।

খোঁচাখোঁচা দাড়ি, লোকটাকে দেখেন রাজা। হাতে এক বিশাল পুঁটলি।

—বোস।

লোকটা মেঝেতে বসে পড়ে, রাজার পা ঘেঁষে।

—বলো।

লোকটা পুঁটলি খুলতে থাকলেই রাজার চোখ বড়ো হতে থাকে। লোকটা একটা বিস্ময়কর সুন্দর পুতুল বের করে রাজার সামনে দাঁড় করায়।

—একী!

রাজার বিস্মিত চোখ-মুখ লক্ষ করে লোকটা—

—সুপুতুল রাজা মশাই। আপনার জন্য। শেখালে সব শিখবে।

রাজার চোখ মুখ আনন্দে নেচে ওঠে। পুতুলটাকে ধরে নাচতে ইচ্ছে করে খুব।

—এতো সুন্দর সুন্দর।

গলা থেকে সোনার হার খুলে শিল্পীকে দিয়ে দেন রাজা।

নমস্কার করে শিল্পী।

—শেখালেই সব শিখবে রাজামশাই।

দুই

পুতুলটাকে রাজা এখান থেকে ওখানে রাখেন। অনেক কথা বলেন। পুতুল কিছুই বলে না। খাওয়াতে চেষ্টা করলেও খায় না। ঘুমোয় না। কথা বলে না। দাঁড়িয়ে থাকে শুধু। দু-হাত দু-দিকে। পা দুটো একটু ছড়ানো। রাজা মগ্ন হয়ে থাকেন পুতুল নিয়ে। লোকটার কথা মনে হয় শেখালেই সব শিখবে। কিন্তু শেখে কই। চেষ্টার শেষ রাখেন না রাজা। কখনও রাগও হয় না।

এই রকম অনেক দিন যায়। শেষে রাজা বিরক্ত হন—তুই কিছুই শিখবি না। বড়ো হবি না। খাবি না, দাবি না। পুতুলটা দাঁড়িয়েই থাকে। শেষে রেগেমেগে রাজা বাগানে একটা একচালার মতো বানিয়ে পুতুলটাকে দাঁড় করিয়ে রাজ্যে এবং ভিন্ন রাজ্যে খবর রটিয়ে দেন—যে পুতুলটাকে শেখাতে পারবে, তাকে অনেক পুরস্কৃত করা হবে। রাজার বাগানে প্রজাদের ভিড় হয়, ভিন্ন রাজ্যের লোকের ভিড়ও হয়। সবাই পুতুলকে দেখে বলে—বাহ্! কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। পুতুলটা যে চুপ সেই চুপেই থাকে। এক একদিন যায়। রাজার মন আরো খারাপ হয়। লোকটা এরকম না বললেই পারত। তবে রাজা জানেন এবং বিশ্বাস করেন লোকটা মিথ্যে বলেনি। একদিন না একদিন সুপুতুল কথা বলবেই। সবকিছু শিখে ফেলবে।

তিন

এখন পৌষের ভোর। ভারী পর্দার মতো কুয়াশা চারদিক আড়াল করে রেখেছে। বাগানের গাছগাছালির শরীরে শীতের প্রলেপ। পুতুলের ঘরটাকে প্রায় দেখাই যায় না। এই ভোরে কেউ এদিকে আসে না। রাজাও ওঠেন না। পুতুলটার ঘরে ঢুকে তপতী। পুতুলটা কি একটু নড়ল চড়ল। তপতী ফ্রক পরা শরীরে ঘুরতে থাকে পুতুলটার চারদিকে। ধীরে ধীরে নাচতে থাকে।

—পুতুল সোনা তুমি খাবে।

মাথা নাড়ে পুতুল। গাছ থেকে পাকা ফল পেড়ে আনে তপতী। আপেল, কমলালেবু। পুতুলটাকে দেয়।

কুটুস কুটুস করে খায় পুতুল। কুয়াশা এনে মাখিয়ে দেয় শরীরে। তরতাজা হয়ে ওঠে শরীর। আলো ফুটতে থাকলেই তপতী, পুতুলের ঘর পরিষ্কার করে ফেলে।—আজ আসি, কাল আবার আসব। মাথা নাড়ে পুতুল।

পরদিন আবার।—আসো পুতুল সোনা আজ আমরা নাচব। গান গাইব। পুতুল শব্দ করে প্রথম-আসো।

তপতী গান করে-'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে'। পুতুল ধীরে ধীরে সুর মেলায়। আবার 'কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা'। তাও পুতুলটা সুর মেলায়। তালে তালে নাচে। তারপর তপতীর হাতে খায়। তপতী অনেক কিছু তৈরি করে নিয়ে আসে পুতুলটার জন্য।

রাজার বাগানে ভিড় বাড়তেই থাকে। সেপাই ভিড় সামলাতে পারে না। সবাই পুতুলকে দেখবে। পুতুলটা ধীরে ধীরে হাঁটে। দুলে দুলে নাচে। গান করে রাজা পুতুলের ঘরে বসে থাকেন শুধু। ভিতরে আনন্দ পাক খেতে থাকে। কী করে হয়। কে করে রাজা জানেন না। কেউ জানে না।

—রাজামশাই তুমি ভালো।

চোখ চিক্ চিক্ করে পুতুলের কথা শুনে রাজার। জানতে হবে। কে এতো সব করে জানতে হবে।

চার

আমগাছে এখন আম ধরার সময় নয়। রাজা আমগাছের শরীরে নিজেকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকে, সেই শেষরাতে। ভোর হয়। ঠান্ডা প্রচণ্ড। তপতী আসে। পুতুলটা দৌড়ে কোলে ওঠে আসে।

—দিদি খাব।

অনেক খাবার বের করে তপতী, পুতুলকে খাওয়ায়। কুয়াশা দিয়ে স্নান করায় পুতুলকে। খাওয়ার পর দু-জন হাত ধরাধরি করে ঘাসের ওপর হাঁটে। নাচে, গান গায়।.রাজা মুগ্ধ হয়ে দেখেন। আবার ফিরে আসে।

—আরো হাঁটব দিদি।

—না সোনা, তোমার ঠান্ডা লাগবে।

—আমার ঠান্ডা লাগে।

—রাজা মশাইকে বলবে।

—আচ্ছা।

তপতী পুতুলের চুল বেঁধে দেয়। কাপড় পালটে দেয়।

—এখন তুমি রাজার বাড়ি চলে যাবে।

—আর তুমি।

তপতী উত্তর দেয় না। থামে। তুমি সব শিখে যাচ্ছো এখন।

—তুমি যাবে না।

রাজমশাই সামনে দাঁড়ান। যেন তপতী জানত—আসুন রাজামশাই।

—তুমিও যাবে।

—না।

পুতুল তপতীর ফ্রক শক্ত করে আঁকড়ে ধরে। চোখ টলটল করে।

—তুমিও যাবে। তুমিও যাবে।

—চলো তুমি।

তপতী রাজামশাইকে দেখে-না রাজামশাই।

—কেন না।

—এখন সু-পুতুলকে আপনিই শেখাতে পারবেন।

—তুমি কোথায় যাবে।

—আমি! অনেকখানে যাব। আরও অনেক পুতুলতো আছে রাজামশাই। টপ্‌টপ্ জল পড়ে পুতুলের চোখ থেকে—আমিও যাব।

—না তুমি থাকবে।

—না

—হ্যাঁ। তুমিই তো রাজা হবে-কেন।

—বা রে। গাছ কুয়াশা মেঘকে বাঁচাবে কে?

পুতুল এবার চুপ করে থাকে।

—চলি রাজামশাই, চলি পুতুল সোনা।

প্রথম সূর্যরশ্মি ধরে তপতী ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকে। বাগান পেরিয়ে যায়। পুতুল ডাকে-দিদি। দি-দি। আরো দূরে চলে যায় তপতী। তারপর রাস্তার শরীরে মিশে যায়। যেন কুয়াশা ও শীতের সাথে মিশে যায়।
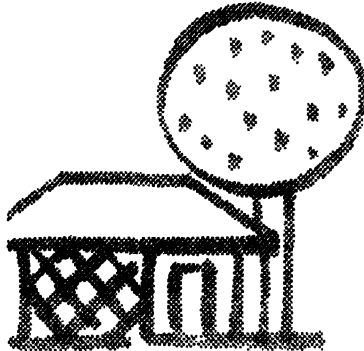
ফিরে আসা

অলক দাশগুপ্ত

তিনি আসছেন। তিনি মানে আমাদের জাহাজি জেঠু। তাকে আমরা দেখিনি কোনোদিন, তবে গ্রামের বয়স্ক কাকু-জেঠু-পিসিদের কাছে তার গল্প শুনে শুনে তার সাথে দিব্যি একটা পরিচয় হয়ে গেছে। পাড়ার নিধুদাদু হামেশাই বলেন গ্রামের বিশ কিলোমিটার রেডিয়াসের মধ্যে নাকি জেঠু এবং তার দোসর পাশের গ্রামের নকুড় জেঠুকে চিনত না এমন কেউ ছিল না। চিনত না মানে তাদের কীর্তিকলাপের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। আমাদের সেই জেঠু ছেলেবেলায় যাকে বলে একদম রামবিচ্ছু ছিলেন। লোকে বলে হাফপ্যান্ট পরার আগের বয়স থেকেই জেঠু ও নকুড় জেঠু দুষ্টুমির হরেক কায়দা-কানুন রীতিমতো রপ্ত করে ফেলেছিলেন। গ্রামের প্রতিটি গাছের ফল-পাকুড় হাপিস করে দেওয়া থেকে শুরু করে যার-তার পুকুরে ঘণ্টা তিনেক তোলপাড় করে সাঁতরে জল ঘোলা করে দেওয়া এসব সামান্যতম দুষ্টুমি থেকে তাদের যাত্রাপথ শুরু। সে সময় পাশের গ্রাম ফুল পাহাড়িতে

দুর্গাপুজোর সময় শহর থেকে দল এনে বিরাট সমারোহ করে যাত্রাপালা হত। সেই যাত্রা উৎসবকে কেন্দ্র করে ফুল পাহাড়ির বাসিন্দাদের দেমাকও ছিল খুব। সামনের ভালো সারিতে তারাই জুৎ করে বসে পড়ত, অন্য গ্রামের লোকদের জন্য বরাদ্দ ছিল পেছনের সতরঞ্চিগুলো। সেইরকমই এক নবমীর রাতে যাত্রা সবে তখন জমে উঠেছে। জেঠু ও নকুড় জেঠু মিলে নাকি প্যান্ডেল ফাঁকা করে দিয়েছিলেন স্রেফ বড়ো টিনের কৌটোয় তিনদিনের পরিশ্রমে সযত্নে ধরে আনা কয়েকশো আরশোলা ছেড়ে দিয়ে। ওই একটি ঘটনাই ফুল পাহাড়ির লোকদের প্রেস্টিজ এমন ঢিলে করে দেয় যে আর সেখানে যাত্রাউৎসব করার মতো উৎসাহ তাদের আজ অবধি দেখা যায়নি।

আমাদের দাদু ছিলেন ইয়া দশাশাই ভয়ঙ্কর বদমেজাজি ফরেস্টার। জেঠু কেবল তার ওই বাবাটিকেই বেশ সমীহ করে চলতেন। কারণ বহুবার দাদুর রামঠ্যাঙানি তাকে সহ্য করতে হয়েছিল। মিষ্টুদিদার হাঁস চুরি করে দাদুর হাতে বামালসহ ধরা পড়েছিলেন জেঠু। হাঁস হাতছাড়া হল, পিঠে কালসিটে পড়ল, দু-দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হল দাদুর জাঁদরেল হাতের কৃপায়। সেরে উঠতেই জেঠু ভারি শান্ত হয়ে গেলেন। তখন থেকেই রোজ সকাল-বিকেল হাতে একমুঠো ছোলা নিয়ে জেঠু মিষ্টুদিদার হৃষ্টপুষ্ট পাঁঠাটাকে খাওয়াতেন। সবাই তো হাঁ। মিষ্টুদিদা অবধি প্রশংসায় পঞ্চমুখ—'নাহ্, ছেলেটার মায়া দয়া আছে'। সব শুনে খুশি হয়ে দাদু একদিন জেঠুকে ডেকে এই জীব সেবার খুব তারিফ করলেন, সাথে আবার বিবেকানন্দের বাণীও আধঘণ্টা ধরে শুনিয়ে দিলেন চান্স পেয়ে। লক্ষ্মীপুজোর রাতের ঘটনা। ছুটি শেষে দাদু কর্মস্থলে ফিরে গেছেন। প্রতি বছরের মতো জেঠুরা রাত জেগে সরকারদের বাগানে পিকনিক করলেন। পরদিন মিষ্টুদিদা আর পাঁঠা খুঁজে পান না। দু-দিন পর গফুর মিঞার কাছ থেকে চোখ রাঙিয়ে আসল সত্যটা জেনে ফেললেন মিষ্টুদিদা। জেঠুদের ফিস্টি ওই পাঁঠাতেই হয়েছে যার ছালটি আবার গফুর মিঞার কাছেই নগদ দু-টাকায় বেচে বাকি আয়োজনপত্তর করেছিলেন জেঠুরা। পই পই করে তার নাম না জানানোর মিনতি করেছিল গফুর মিঞা মিষ্টুদিদাকে। তাতেও ভরসা না পেয়ে সে নাকি জেঠুর ভয়ে দু-মাসের জন্য সুনামগঞ্জে তার মামুজানের বাড়িতে চলে যায়। পাঁঠাটাকে ছোলা খাওয়ানোর রহস্যটা এবার পরিষ্কার হয়ে যায় মিষ্টুদিদার কাছে। একমাস ধরে তাকে এমন তোয়াজ করেছিলেন জেঠু যে বেচারিকে লক্ষ্মীপুজোর রাতে যখন খুঁটি উপড়ে নিয়ে আসা হয় তখন একটুকুও হাঁক-ডাক না করে বাধ্য ছেলের মতো ছোলা খাবার লোভে জেঠুর পেছন পেছন চলে এসেছিল।

সেবার ক্লাশ এইটের হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষার খাতা দিতে দেখা গেল জেঠু এবং নকুড় জেঠু দু-জনেই সংস্কৃতে ফেল করেছেন। বাড়ি ফেরার কী উপায় আছে? দাদু সবে ছুটিতে এসেছেন তায় মোষের শিঙের হাতল বাঁধানো ছিপছিপে চমৎকার বেতের ছড়ি কিনে এনেছেন। দু-বন্ধু মাঠের মধ্যে পা ছড়িয়ে বসে রইলেন। হাতে ফেলু খাতা। বিকেল নাগাদ রোগাপটকা ধুতি-চাদর পরা ব্যক্তিটিকে আসতে দেখলেন তাঁরা। সামনে আসতে ভারি মোলায়েম স্বরে জেঠু ডাকলেন—'পণ্ডিতমশাই!' রোগা-ভোগা নিরীহ পণ্ডিতমশাইয়ের তো সে ডাক শুনেই আত্মারাম খাঁচাছাড়া। মাঠের ওপর পাঁই পাঁই করে ছুট লাগালেন। কিন্তু জেঠুদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব। পণ্ডিতমশাইকে পাকড়ে খোলা মাঠে গাছের নীচে বসলেন দু-জন।—'পণ্ডিতমশাই, এটা কী ধরনের ব্যবহার হল? আমরা বাড়ি ফিরব কীভাবে? ছিঃ ছিঃ আপনি একজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমশাই আর ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনার কোনো মাথাব্যথা নেই!' জেঠু ভারি বিজ্ঞের মতো মুখ করে জ্ঞান ঝাড়ছেন। সামনে বসে ঠকঠক করে কাঁপছেন পণ্ডিতমশাই।—'এটা কি উচিত হল? এখন যদি বাড়ি ফেরার পর বাবার রামপিটুনি খেয়ে আমাকে হাসপাতালে যেতে হয়? যদি আমার পা ভেঙে যায়? যদি আমার মাথা ফেটে যায়? কিংবা ধরুন যদি আমি মরেই যাই তবে কী হবে? মারা যাবার আগে আমি পুলিশের কাছে বলে যাব আপনি আমাদের ফেল করিয়েছিলেন বলেই আমার আজ এই দশা। আমার অকালমৃত্যুর জন্য বিদ্যাপতি বিদ্যাপীঠের পণ্ডিতমশাই শ্রী রাধাশ্যাম তর্কালঙ্কার মশাই-ই একমাত্র দায়ী, একথা আমি পুলিশকে মরার আগে বলে যাবই।' একে জেঠুর মতো এমন ডাকসাইটে বিচ্ছু ছাত্র তার ওপর আবার পুলিশের ভয়—পণ্ডিতমশাই একদম ফ্যাকাশে মেরে গেলেন। অনেকবার

জেঠুকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন তিনি ঠিকই নাম্বার দিয়েছেন। জেঠু বুঝলেন সবই, কিন্তু পাশ করিয়ে দেবার দাবীতে তিনি অনড়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। শেয়ালের ডাক, গা ছমছমে অন্ধকারের উঁকি মারা শুরু হয়ে গেছে। পণ্ডিতমশাইয়ের আবার সাংঘাতিক ভূতের ভয়। শেষমেষ রফা হল, পণ্ডিতমশাই দাদুকে জানিয়ে আসবেন যে জেঠুর খাতা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। সেই সঙ্গে এটাও গ্যারেন্টি দিতে হল ফাইনাল পরীক্ষায় জেঠুকে পাশ করাতে হবে। তাই হয়েছিল, আমাদের দাদু ও বিদ্যাপতি বিদ্যাপীঠের হেডস্যার অতি সজ্জন পণ্ডিতমশাইকে সন্দেহ করার কোনো কারণ দেখেননি। তাই প্রোগ্রেস রিপোর্টে জেঠু ও নিধু জেঠুর সংস্কৃতের কলামটা হাফ-ইয়ার্লিতে ফাঁকাই থেকে যায়। এবং জেঠু ফাইনালও পাশ করে যান। যদিও এটা তাঁর নিজের না পণ্ডিতমশাইয়ের কৃতিত্বে সেটা অজানাই থেকে গেল।

এর কদিন পরই জীবনের সবচেয়ে সাংঘাতিক অপরাধটি করার সময় হাতে-নাতে ধরা পড়েন জেঠু। বাড়ি থেকে প্রায়ই জেঠুকে এক বা দুই টাকার নোট দিয়ে তা মন্দির থেকে খুচরো করিয়ে আনতে পাঠানো হত। আমাদের গ্রামের জগজ্জননী কালিবাড়ির খুব নামডাক। হাইওয়ের পাশে বলে গাড়ি-ঘোড়া থামিয়েও লোকে প্রণামী দিয়ে যায়। মা কালিমূর্তির সামনে বিশাল একটা তামার রেকাবিতে ফুল ও মালার পাশে সেসব পয়সা ডাঁই করে সাজানো থাকে। মন্দিরের পুরোহিতমশাই দাদুর বিশেষ বন্ধু। দুরন্ত হলেও বন্ধুর ছেলেকে তিনি খুব ভালোবাসতেন। জেঠু নিজের হাতেই প্রণামীর থালায় ভারী ভক্তিভরে প্রণাম করে টাকা রেখে পরিবর্তে খুচরো পয়সা নিয়ে আসতেন। দিব্যি যাচ্ছিল। বাদ সাধল পুরোহিতমশাইকে সাহায্য করার জন্য সদ্যনিযুক্ত সেবাইত। বেশ চটপটে, জেঠুদের বয়সী ছোকরা। দূর গ্রামের ছেলে বলেই হোক কিংবা নিজের দুঃসাহস দেখানোর জন্যই হোক সে একদিন এক টাকার নোট ভাঙানোর সাথে সাথে জেঠুকে পাকড়াও করল। বেশ কদিন জেঠুর ওপর নিঃশব্দে নজর রাখছিল সে। মুঠো খুলে পাওয়া গেল এক টাকা পনেরো পয়সার খুচরো। সে কী কাণ্ড! খবর পেয়ে দাদু সবার সামনেই জেঠুর কান পাকড়ে রাস্তা দিয়েই পেটাতে পেটাতে জেঠুকে নিয়ে এলেন। বাড়ি ফিরে বারান্দার খুঁটির-সাথে বেঁধে জবরদস্ত পিটুনি দিলেন ঝাড়া এক ঘণ্টা। তারপর অপমানে লজ্জায় নিজে কাঁদতে বসলেন উঠোনে হাত-পা ছড়িয়ে। আর সে রাতেই জেঠু হাওয়া হয়ে গেলেন। যাবার আগে মন্দিরের সেবাইতকে তিনিই কিছু করেছিলেন কিনা ঠিক জানা নেই। তবে পরদিন সেবাইতের গায়ে কালসিটে, দুটো দাঁত ফোকলা, মাথায় পট্টি। কাঁদতে কাঁদতে পুরোহিতমশাইকে বলেছিল গতরাতে তাকে ভূতে মেরে এ দশা করে দিয়েছে। হাজার প্রশ্নেও আর কিছু তার কাছ থেকে জানা গেল না। সেই দিনই সে তল্পি-তল্পা গুটিয়ে নিজের গ্রামে ফিরে গেল চিরকালের জন্য। জেঠুও সেই যে বেপাত্তা হলেন তার আর কোনও হদিশই পাওয়া গেল না।

বছর কয়েক পর রক্ অব জিব্রাল্টার থেকে চিঠি এল তিনি জাহাজে চাকরি নিয়ে পৃথিবী ঘুরছেন। কতো দেশ দেখছেন। দিব্যি আছেন, খাসা আছেন। সেই জেঠু আসছেন। আমরা ভেতর ভেতর উত্তেজনায় ফুটছি তার দর্শন পাবার আশায়। আমাদের সেই ভয়ঙ্কর জেঠু। যার নামে একসময় দশ-বিশটা গ্রামের লোক কুঁকড়ে থাকত সেই জেঠু।

তিনি এলেন। ইয়া লম্বা চওড়া, মস্ত গোঁফ। চেহারার সাথে মানিয়ে বাজখাঁই গলার আওয়াজ। এসেই আমাদের ছোটোদের একগাদা বিদেশি চকলেট-টফি-বিস্কুট উপহার দিলেন। সেই সঙ্গে নিজের মনমতো একটা করে নাম—'হোঁদল', 'গুটুল', 'পান্তাভাত' ইত্যাদি। কেন জানি না আমার নাম দিলেন 'কাঁচালঙ্কা'। জাহাজের মতোই খুব ডাকসাইটে হাব-ভাব। এসেই পুকুরপাড়ের ঢ্যাঙা নারকেল গাছের মাথায় তরতর করে উঠে আমাদের শিহরিত করে মাঝপুকুরে পড়লেন ডাইভ মেরে। আমরা সঙ্গে সঙ্গেই তার ফ্যান বনে গেলাম। নাহ্! একটা জেঠুর মতো জেঠু বটে আমাদের। বিকেলে বাবার শালটা গায়ে চড়িয়ে গ্রাম ঘুরতে বেরোলেন। কাউকে সঙ্গে নিলেন না। ফিরলেন রাত আটটায়। শাল খুলতেই বেরুল দু-দুটো প্যাঁকপ্যাঁকে হাঁস। বাবার চোখ কপালে—'একী?' জেঠু বিজয়ীর হাসি হেসে বললেন—'মিষ্টুপিসির।' বাবা অসন্তুষ্ট গলায় বললেন—'এ বয়সেও এসব

করলে?' জেঠুর মুখে সেই দুষ্টু হাসি—'কি করব? গ্রামে ঢুকতেই যে পুরোনো কথাগুলো মনে পড়ে গেল।' মিষ্টুদিদার অবস্থা এখন খুব খারাপ। ছেলেমেয়ে কেউ নেই। বুড়ো বয়সে একগাদা হাঁস-মুরগি নিয়েই দিন কাটে। ডিম আর হাঁস মুরগি বিক্রি করেই খাবার জোটায়। জেঠুর এমন আচরণে আমাদেরও খারাপ লাগছিল। বাবা গম্ভীর মুখে শালটা গায়ে জড়িয়ে টর্চ হাতে নিয়ে বললেন, 'নিয়ে যখন এসেছো তখন তো আর ফেরত দেওয়া যায় না। দামটা দিয়ে আসি বরং।' জেঠু অহংকারী মুখে বললেন—'আমার নাম শুনলে আর দাম নেবে না।'

বাবা ফিরলেন রাত দশটায়। আমরা তখন জেঠুর চারপাশে গোল হয়ে বসে তার মুখে সমুদ্রের গল্প শুনছি রান্নাঘর থেকে আসা টগবগে হাঁসের মাংসের গন্ধ নিতে নিতে। তিমি, হাঙর, ব্যারাকুডা, ডলফিন, ডুবুরি, আধুনিক জলদস্যু—সে দারণ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার-স্যাপার। বাবা এসেই জেঠুর ওপর খাপ্পা, এটা কী হল? আমাকে মিছিমিছি ঘোরালে'? জেঠু নির্বিকার গলায় বললেন,—'তুই বড্ড অলস হয়ে পড়েছিস পানু। কি বিচ্ছিরি মোটা হয়েছিস! হাঁটাচলা করায় তোর উপকারই হল।' বাবা হেসে ফেললেন। তারপরই আসল চমক। বাবার মুখেই শুনলাম জেঠু মিষ্টুদিদার হাঁস চুরি করেননি মোটেই, দস্তুর মতো নগদ দাম দিয়ে কিনে এনেছেন। শুধু তাই নয় ছেলেবেলায় মিষ্টুদিদার বাড়ি থেকে যতো হাঁস-মুরগি, ফলমূল হাপিস করেছিলেন তার দামও নাকি পাই-পয়সা হিসেব করে মিটিয়ে দিয়েছেন। মিষ্টুদিদার সে কী লজ্জা। বলে,—'সেই কবে পাঁঠা নিয়েছিল তখন দাম ছিল মোটে দশ টাকা, আর ছোটো কত্তা কিনা জোর করে তারই দাম দিল সাড়ে সাতশো টাকা। অন্যগুলোরও তাই। ছিঃ ছিঃ কী লজ্জা!' বলে জেঠু থেকে শুরু করে দাদু, তারপর আমাদের বাড়ির সবার আদবকায়দা আচারব্যবহার ভালো মন্দ সব কিছুরই খুব প্রশংসা করতে লাগল। বাবা এরপর খবর নিয়ে জানলেন যার যার বাড়ি থেকে ছোটোবেলায় ওসব জিনিস হাপিস করেছিলেন জেঠু, সবাইকে নাকি ধমকে ধমকে জোর করে এখনকার মূল্যে নগদ টাকা দিয়ে এসেছেন। জেঠুর সামনে কারোর বাধাই টেকেনি। এমনকি জগজ্জননী কালিবাড়িতে গিয়ে পাঁচশো টাকা দান করেছেন আর বলে এসেছেন মন্দিরের রং করার পুরো টাকা দেবেন। বাবা খুব গর্ব সুরে ঘটনাগুলো জানাচ্ছেন। জেঠু খাটে টানটান হয়ে বসে। মুখে শান্ত সুন্দর হাসি।

খেতে বসে জেঠু বললেন, —'মোটামুটি প্রায়শ্চিত্ত হল। অন্য গ্রামের কিছু বাড়ি বাকি আছে কাল-পরশু নাগাদ সব ক্লিয়ার করে দেব। একটা বড়ো কাজ অবশ্য বাকি। কাল নকুড়কে নিয়ে পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়ি যাব। সেই ছেলেবেলায় তাঁকে একদিন যাচ্ছেতাই অপমান করেছিলাম। পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব। কীরে, তোরা এমন চুপ মেরে গেলি কেন?' বাবা মাথা নীচু করেন, আমরাও। জেঠু ম্লান হেসে বললেন,—'তাই বল্, পণ্ডিতমশাই গত হয়েছেন তাই না? তা বয়স তো হয়েছিল কম নয়। কবে গেলেন? কীসে? যাহ্, ক্ষমাটা চাওয়া আর হয়ে উঠল না। তবে তিনি তো শিক্ষক, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করে গেছেন। আর ফাইনালে কিন্তু আমি নিজেই পড়াশুনো করে পাশ করেছিলাম, সত্যি বলছি।' আমরা কেউ কোনো কথা বলতে পারলাম না। মিনিট খানিকের নীরবতা ভেঙে হঠাৎ আমার পুঁচকে বোন মিমি, যে কিনা জেঠুর কাছে আজ 'পান্তাভাত' নামটা উপহার পেয়েছে, বলে উঠল,—'নাগো জেথু, তোমাল পনতিত মশাই বেঁতে আথে, নকুল জেথুই তো বোল হলি হয়ে গেল।' জেঠু চমকে সোজা হয়ে বসলেন। হাতটা মুখের কাছ থেকে নেমে এল। শূন্য চোখে ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন আমাদের মুখের দিকে। অস্ফুটস্বরে বারবার বলতে লাগলেন,—'এ খবরটা আমাকে এতক্ষণ কেউ দিসনি...। ...এ খবরটা আমাকে...। তাই পানু, তুই তখন বললি আজ নকুড়ের গ্রামে গিয়ে কোনো কাজ নেই। কাল সকালে যেও। নকুড়টা....' জেঠুর চোখের কোণে জল উঁকি দিচ্ছে। পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন। আমাদের ভীষণ কষ্ট হচ্ছে জেঠুকে এমনভাবে দেখে। নকুড় জেঠু মাস ছয়েক আগে জ্বরে ভুগে হঠাৎই মারা গেছেন। বড়োরা গত কদিন ধরে পইপই করে বারণ করেছেন জেঠু আসার সাথে সাথে যেন আমরা তাকে নকুড় জেঠুর মৃত্যু সংবাদটা না জানাই।

রূপকুমার ও অরূপকুমারের গল্প

সুজয় রায়

অনেকদিন আগের কথা। এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ আরেক ব্রাহ্মণী বাস করত। ব্রাহ্মণ বাড়ির কোনো কাজ করত না, একেবারে অকর্ম ছিল। বাড়ির সমস্ত কাজ ব্রাহ্মণীই করত, আর ব্রাহ্মণকে বকুনি দিত। প্রতিদিনই এ নিয়ে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণীর মধ্যে ঝগড়া হত।

একদিন ব্রাহ্মণ মনের দুঃখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। উদ্দেশ্য ব্রাহ্মণীকে সে দেখিয়ে দেবে সেও কাজ করতে জানে। সারাদিন ঘোরাঘুরির পরও ব্রাহ্মণ কাজের সন্ধান পেল না। অথচ ব্রাহ্মণ কথা দিয়েছে কাজ না নিয়ে বাড়ি ফিরবে না।

আবার শুরু হল হাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে এল ব্রাহ্মণ। রাত হয়ে গেল। রাত কাটিয়ে আবার শুরু করল হাঁটা। এমনিভাবে বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল—ব্রাহ্মণ আর কোনো কাজের সন্ধান পেল না।

এদিকে ব্রাহ্মণ হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে এক নগরে প্রবেশ করেছে। অথচ আশ্চর্য, ব্রাহ্মণ দেখল নগরে কোথাও লোকজন নেই। জন-মানবশূন্য নগরী। ব্রাহ্মণের কেমন বেশ ভয় হল। কিন্তু উপায় নেই। এখন ভয় পেলে চলবে না। ব্রাহ্মণ ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল নগরটা। দোকান-পাট জিনিসপত্তর সব আছে, কিন্তু লোক নেই। ব্রাহ্মণ এক দোকানের সামনে গিয়ে দেখল, অনেক খাবার ঝুলছে। ব্রাহ্মণের খিদে পেয়েছিল, খাবার দেখে পেট ভরে খেয়ে নিল।

এক সময় ব্রাহ্মণ ঘুরতে ঘুরতে নগরীর রাজপ্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়াল। বিরাট বড়ো রাজপ্রাসাদ। যেমন সুন্দর, তেমনি প্রকাণ্ড। ব্রাহ্মণ এখানেও আশ্চর্য হয়ে গেল। দ্বারে কোনো প্রহরী নেই, সিংহদ্বার খোলা। ব্রাহ্মণ সাহস নিয়ে রাজপুরীতে ঢুকে গেল। রাজপ্রাসাদ জন মানবশূন্য যেন মৃত পুরীর মতন ঘুমিয়ে আছে।

হঠাৎ ব্রাহ্মণের চোখ আটকে গেল, রাজ অন্তঃপুরের দরজায়। কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। ব্রাহ্মণ এগিয়ে গেল। দেখল এক অপরূপ সুন্দরী কন্যা তার দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছে। ব্রাহ্মণ বিস্মিত হল। এখানে এই জন- শূন্য রাজপুরীতে এই রূপবতী কন্যা এল কোত্থেকে? ব্রাহ্মণ সাহস নিয়ে বলল, তুমি এখানে কী করে এলে। রাজকন্যা বলল,—এখানে এক রাক্ষসীর উৎপাত দেখা দিয়েছে কদিন যাবত। নগর থেকে লোকজন ধরে ধরে নিয়ে যায়। এমনি করে নগরীর অনেক লোককে ধরে নিয়ে গেছে, বাকিরা ভয়ে অন্য রাজ্যে পালিয়ে গেছে।

ব্রাহ্মণ বলল,—তুমি রইলে কী করে?

রাজকুমারী বলল,—আমাকে রাক্ষসীটা মারেনি। কাল আমার বাবা, মাকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে। আমাকেও কোনো মুহূর্তে রাক্ষসী মেরে ফেলতে পারে। আমি বড়ো দুঃখী। তুমি আমায় বিয়ে করবে? ব্রাহ্মণ এবার অবাক হয়ে গেল রাজকুমারীর কথায়। রাজকুমারী বলল,—ভয় নেই। রাক্ষসী এখন এ রাজ্যে নেই। এখুনি ফিরছেও না। তুমি আমায় সানন্দে বিয়ে করতে পার। তারপর কয়েকদিন এখানে থেকে আনন্দ স্ফূর্তি করে, রাক্ষসী আসার আগেই আমায় নিয়ে পালিয়ে যেতে পার।

রাজকুমারীর কথায় ব্রাহ্মণের লোভ হল। ব্রাহ্মণ রাজকুমারীকে বিয়ে করে ফেলল। ব্রাহ্মণের সুখ আর দেখে কে! মনের আনন্দে খায়-দায়, রাজকুমারীকে নিয়ে দিন কাটায়। বাড়ির কথা ব্রাহ্মণের আর মনেই রইল না। এমনি করে দেখতে দেখতে অনেকদিন কেটে গেল!

ব্রাহ্মণের দুটি পুত্র-সন্তান জন্ম গ্রহণ করল। নাম দেওয়া হল, রূপকুমার আর অরূপকুমার। দিনে দিনে রূপকুমার অরূপকুমার বড়ো হতে লাগল। কিন্তু ব্রাহ্মণ লক্ষ করল এরপর থেকে রাজকুমারী প্রায় রাতেই শয়নকক্ষে থাকে না। কোথায় যায়? ব্রাহ্মণ খুব চেষ্টা করল—খুঁজে বের করতে, কিন্তু পারল না।

এদিকে রূপকুমার অরূপকুমার আরো বড়ো হয়েছে। এখন ঘোড়ায় চড়ে অনেক দূরের স্কুলে পড়তে যায়। একদিন ব্রাহ্মণ তার ছেলেদের বলল,—তোমাদের মাকে প্রায় রাতেই প্রাসাদ কক্ষে দেখি না। কোথায় যা তা-ও জানি না। ব্যাপারটা আমার ভালো ঠেকছে না। তোমরা সাবধানে থেকো। রূপকুমার অরূপকুমার হেসে বলল, আমাদের ভাবনা নেই বাবা। ভাবনা তোমাকে নিয়ে। মায়ের মতি গতি আমাদেরও ভালো মনে হচ্ছে না।

একদিন ব্রাহ্মণ ঠিক করল, আজ ভালো করে দেখবে তার স্ত্রী কোথায় যায়। ব্রাহ্মণ রাতে ঘুমোবার ভান করে জেগে ছিল, হঠাৎ দেখল—পাশের পালংক থেকে রাজকুমারী উঠে পড়েছে। ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছে। ব্রাহ্মণ ও লুকিয়ে লুকিয়ে সন্তর্পণে পিছু নিল। দেখল পেছনের দরজা দিয়ে রাজকুমারীর ছাদে উঠেছে। ছাদে উঠে হঠাৎ বেশভূষা পালটে ফেলল। রূপ দেখে ব্রাহ্মণেরও ভয় হয়ে গেল। এ তাহলে রাজকুমারী ছদ্মবেশে রাক্ষসী? দেখল, চারপাশে হাড়ের অজস্র স্তূপ। পচা মাংসের গন্ধ। ব্রাহ্মণ আর ঠিক থাকতে পারল না, পালিয়ে এল।

এখন উপায়? ব্রাহ্মণ ভাবল। কিন্তু আর উপায় নেই। এক মৃত্যু ছাড়া। রোজ রোজই রাজকুমারী রাক্ষসীর বেশে নগরে ঘুরে বেড়ায়। একদিন আর কাউকে না পেলে ব্রাহ্মণকেই খেতে আসবে। কিন্তু রূপকুমার, অরূপকুমারের কী হবে?

ব্রাহ্মণ রূপকুমার, অরূপকুমারকে ডেকে বলল,—তোমরা মানুষ। আমিও মানুষ। কিন্তু তোমাদের মা মানুষ নয়। মানুষ বেশি রাক্ষসী। আগে জানতাম না। এখন জেনেছি। নাও, তোমাদের এই দুই বোতল দুধ দিলাম। স্কুলে বসে যদি দেখ এই দুধের রং লাল হয়েছে, তখন মনে করবে তোমাদের বাবাকে মেরে ফেলেছে আর যখন দেখবে দুধের রং নীল হয়ে গেছে তখন ভাববে তোমাদের দিকে ধেয়ে আসছে রাক্ষসীটা। অমনি পালাবে।

একদিন সত্যি সত্যি রূপকুমার অরূপকুমার দেখল তাদের বাবার দেওয়া দুধ হঠাৎ লাল হতে চলেছে। অরূপকুমার বলল,—দাদা, বাবাকে মেরে ফেলেছে।

এরপর দুধ ধীরে ধীরে নীল হতে লাগল। অরূপকুমার বলল,—এবার আমাদের পালা। চল দাদা পালাই।

ঘোড়া ছুটিয়ে দু-জনেই দ্রুতগতিতে পালিয়ে গেল।

ঘুরতে ঘুরতে রূপকুমার আর অরূপকুমার আরেক রাজ্যে এসে প্রবেশ করল। রাজ্যে প্রবেশ করেই বুঝল রাজ্যটা থমথমে। লোকজন আছে, কিন্তু কারো মনে আনন্দে নেই শান্তি নেই।

নগরীর রাজপথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রূপকুমার একজনকে ডেকে বলল,—ভাই, তোমাদের রাজ্যে কার কী হয়েছে, তোমরা সবাই এত বিমর্ষ কেন? লোকটা বলল,—গত পরশু রাতে এ রাজ্যের রাজার সাথে অন্য রাজ্যের রাজকুমারীর বিয়ে হয়েছে। রাজার স্ত্রী ছিল, রাজকন্যা আছে। আগের স্ত্রী মারা যাওয়াতে রাজা এ বিয়ে করেন। কিন্তু রাজকুমারী অপরূপ সুন্দরী হলেও তাঁর এক 'বেমো' আছে। এ রোগের জন্য রাজার মনে শান্তি নেই। আনন্দ নেই। তাই আমরাও বিমর্ষ।

রূপকুমার, অরূপকুমারের দিকে তাকিয়ে বলল,—ব্যাপারটা সুবিধের নয়। লোকটি আরো বলল,—মহারাজ ঘোষণা করেছেন যদি কেউ তাঁর স্ত্রীর রোগ ভালো করতে পারে, তাহলে মহারাজ তার সাথে তাঁর কন্যার বিয়ে দেবেন। এবং সেই সঙ্গে অর্ধেক রাজত্ব ও দান করবেন।

রূপকুমার, অরূপকুমার সোজা রাজবাড়ি গিয়ে হাজির হল। রাজাকে বললে, আমরা রানির রোগ ভালো করতে পারব। রানি রূপকুমার অরূপকুমারের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। বললে,—আমি একটা ওষুধের নাম লিখে দিচ্ছি, যে জায়গার নির্দেশ দেওয়া হবে ওখানে গেলেই ওষুধ পাওয়া যাবে।

রূপকুমার-অরূপকুমার রানির ওষুধের সন্ধানে চলল। যেতে যেতে অনেক দূরে চলে এল তারা। পথে এক সাধুর সাথে দেখা। সাধু নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে। একা এবং বৃদ্ধ বলে নদীর ওপারে যেতে পারছে না। সাধু বলল, তোমরা ভাই কারা, আমায় ওপারে নিয়ে যাবে? রূপকুমার বলল, কেন নিয়ে যাব না, আসুন আমাদের সাথে, এই বলে রূপকুমার একাই সাধুকে কাঁধে করে ওপারে পৌঁছে দিল।

সাধু বলল,—তোমাদের ব্যবহারে আমি খুব প্রীত হয়েছি। তোমরা এই গহন বন দিয়ে কোথায় যাচ্ছ? এদিকের পথ ও ভালো না। যে-কোনো মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে।

রূপকুমার ও অরূপকুমার এবার সমস্ত ঘটনা খুলে সাধুর কাছে বলল। সাধু একটু ভেবে বলল,—দেখি চিঠিটা। চিঠিটা নিয়ে সাধু আবার বলল,—এ চিঠি খুব সাংঘাতিক। এটা দিয়েই তোমাদের বিপদ ঘনিয়ে আসত। রানি আসলে রানি নয়, ছদ্মবেশী রাক্ষসী। সে এ চিঠি তার মার কাছে লিখে পাঠিয়েছে। তোমাদের পেলে যেন খেয়ে ফেলে। ঠিক আছে, আমি এটা ফেলে দিয়ে আর একটি লিখে দিচ্ছি। তোমরাও দিদিমা বলে ডাকবে, বলবে আমরা তোমার নাতি। মা পাঠিয়েছে তোমাকে দেখতে। দেখবে মা-রাক্ষসী তোমাদের খুব আদর যত্ন করবে। তারপর সুযোগ বুঝে রানি এবং সকল রাক্ষসীর মৃত্যু-রহস্য কী, জেনে নেবে।

রূপকুমার অরূপকুমার সানন্দে সাধুর প্রস্তাব মেনে নিল। এদিকে মা-রাক্ষসী খুব খুশি হল নাতিদের পেয়ে। খুব আদর যত্ন করে খাওয়ায় দাওয়ায়। একদিন রূপকুমার বলল,—আচ্ছা দিদিমা, তোমরা যে এতদূরে, খাবারের সন্ধানে যাও, যদি কোনো বিপদ ঘটে? দিদিমা হেসে উত্তর দেয়,—আমাদের কোনো বিপদই ঘটবে না। কারোর সাধ্য নেই আমাদের মৃত্যু ঘটায়। আমাদের মৃত্যু-রহস্য আমাদেরই কাছে। অরূপকুমার আবদারের ভান করে

বলে,—বল না, তোমাদের মৃত্যু রহস্যটা কী? দিদিমা বলে—খুব সাবধান কাউকে বলবি না। শুধু তোরা আমার আদরের নাতি বলে বলছি। এখান থেকে উত্তরদিকে একটু এগিয়েই দেখবি একটি সরোবর। মাঝখানে একটি স্তম্ভ। ওখানে গিয়ে কেউ যদি একশ্বাসে স্তম্ভটা তুলে এনে ভেঙে ফেলতে পারে, তাহলে একটি খাঁচা বেরুবে। খাঁচার ভেতরে একটি পাখি, এই পাখিটাই আমাদের রাক্ষসকুলের জীবন। ওটা মরলে আমরা কেউ বাঁচব না।

রূপকুমার-অরূপকুমার খুব মনোযোগ দিয়ে মা-রাক্ষসীর কথা শুনল। যেদিন দেখল মা-রাক্ষসী খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে গেছে, রূপকুমার উত্তর দিকে সরোবরের কাছে চলে এল। অরূপকুমার রইল পাহারায়।

সব অসাধ্য সাধন করে খাঁচাটা নিয়ে সোজা চলে এল রাজবাড়ি। রাজামশাইতো রূপকুমার অরূপকুমারকে দেখে অবাক। রাজ দরবারে রূপকুমার বলল,—এটাই রানির ওষুধ। এই দেখুন।

বলে অরূপকুমার একটি পালক ছিঁড়ল। অমনি রানির রূপ পালটে গেল। রাক্ষসীর রূপ নিল। সভামধ্যে সবাই এমনকি রাজাও ভয় পেয়ে গেল। রাক্ষসী ধেয়ে এল রূপকুমার অরূপকুমারকে ধরতে। তার আগেই পাখির গলাটা ছিঁড়ে ফেলল। রাক্ষসী পরে মরে গেল। রাক্ষসী কূলের আর কোনো রাক্ষসীই জীবিত রইল না।

মনের সুখে মহাধুমধামে মহারাজা রাজকন্যার সাথে রূপকুমারের বিয়ে দিয়ে দিল। মহাসুখে দুই ভাই—রূপকুমার আর অরূপকুমার রাজ্য শাসন করতে লাগল। রাজ্যে আর অশান্তি রইল না।

বন্ধু

মীনাক্ষী সেন

সকালবেলা বুদ্ধিরাম আর ভূষণ এসেছিল কাজের খোঁজে। বুদ্ধিরামের পরনে খাটো সাদা নোংরা একখানা ধুতি, হাঁটুর ওপরে তোলা। ভূষণ পরেছিল একখানা নীলরঙের চেক-চেক লুঙ্গি আর অনেকগুলো ছিদ্রওলা একখানা গেঞ্জি।

বুলান জিজ্ঞেস করল—ও বুদ্ধিরাম দাদা, তোমার জামা নেই? তুমি খালি গায়ে থাক কেন? উত্তরে বুদ্ধিরাম সবক'খানা দাঁত বের করে হাসল। হাসলে বুদ্ধিরামের চোখদুটো গাল আর ভুরুর মধ্যে ঢুকে যায়—হাসলে বুদ্ধিরামকে বুলানের দুই বছরের মাসতুতো ভাই বুবলার মতো লাগে।

—গরম দিদিভাই, জামা লাগে না তো বুদ্ধিরাম হাসতে হাসতেই বলল।

—থাকলে তো পরতো দিদিভাই...........

ভূষণ বুদ্ধিরামের হয়ে জবাব দিল। শুনে বুলান তো অবাক। বাবার তো কমপক্ষে আট দশখানা শার্ট, কাকুর আরও বেশি। জামা আবার কারও থাকেনা নাকি?

বাবা বললেন—ভূষণ, দুইজনেরে তো লাগত না। এক জনের একরোজের কাম।

বুধিরাম ভূষণকে বলল—তইলে তুই লাগে এ জাগাৎ। আমি অন্যখানো যায়..........—না, না, তুই এই জাগাৎ লাগ, আমি মাস্টার বাড়ি যাইতাম।

বলে বুধিরামকে আর কথাটিও বলতে না দিয়ে ভূষণ লম্বা লম্বা পায়ে গেট খুলে বাইরে চলে গেল। বুধিরাম মনখারাপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল করুণ মুখে, তারপর কোদাল নিয়ে কাজে লেগে গেল। বুধিরাম কাজ করছিল।

বুধিরামের শরীরের পেশিগুলো যেন পাথরে খোদাই করা। বুকের ঢেউ-খেলানো পেশির ওপর দুপুরের রোদ্দুর এসে পড়েছে। বুধিরাম অনেকক্ষণ ধরে কাজ করছে কিনা, তার ওপর রোদ্দুরে ঝাঁ-ঝাঁ করছে দুপুর। ঘেমে নেয়ে উঠেছে। তার ঘামে-ভেজা পেশির ওপর রোদ্দুর পড়ে ঝকঝক করছে। তার শক্তপোক্ত ঢেউখেলানো পেশিগুলোকে দেখাচ্ছে যেন পাথর। বুধিরাম কোদাল চালাচ্ছে ধাঁই-ধপ্-ধপ্। কোদালের ঘায়ে আগাছা উপড়ে যাচ্ছে। ছিট্‌কে উঠছে মাটি। বুধিরামের হাত উঠছে আর নামছে। নড়ে উঠছে ঘামে ভেজা হাতের ডিমের চক্‌চকে পেশিগুলো। যেন ঢেউ উঠছে পাথরে।

বুলান অবাক হয়ে বুধিরামকে দেখছিল।

—ও বুধিরাম দাদা, তোমার কষ্ট হয়না? রোদ্দুরে?

—কসটো?

বুধিরাম আবার বুবলা ভাইয়ের মতো করে হাসল।

—কসটো হইলে প্যাট মানত নি?

পেটের কথায় বুলান বুধিরামের পেটের দিকে তাকাল। বুধিরামের শরীরের পেশিগুলো অমন উঁচু উঁচু ঢেউ খেলানো, কিন্তু পেট ঢুকে আছে একেবারে ভেতরে।

রান্না শেষ হতে কোনোদিন দেরি হয়ে গেলে মা বারবার বুলানের পেটে হাত দিয়ে দেখেন—'ও বুলান, বড় বেশি খিদা লেগেছে নাকি? পেট যে দেখি একেবারে ভেতর ঢুকে গেছে।'

বুলান তাই বুঝতে পারল বুধিরামের ক্ষিদে পেয়েছে।

বুলান জিজ্ঞেস করল—ও বুধিরাম দাদা, তুমি ভাত খাবে? তোমার যে ক্ষিদা পেয়েছে।

—'ভাত!' বুধিরাম আবারও বুবলা ভাইয়ের মতো হাসল।

—দিবে, তোমার মা, রুটিউটি দিবে।

বুলান ছুট্টে মায়ের কাছে গেল। মায়ের রান্নাবান্না শেষ। তিনি গ্যাস মুছছিলেন।

—মা, বুধিরাম দাদার ক্ষিদে পেয়েছে, ওকে ভাত দাও।

—ভাত? বুধির জন্য রুটি করেছি তো।

মা কাজ করতে করতেই জবাব দিলেন।

—ইস্, দুপুরে কেউ রুটি খায় নাকি? ভাত খায় তো দুপুরে। তুমিই তো বল আমাকে।

মা থতমত খেলেন। তারপর গ্যাসের উনানে জোরে জোরে ন্যাতা ঘষতে ঘষতে হাসলেন।

—আচ্ছা বাব্বা! মেয়ে না তো, শাশুড়ি আমার। দেবো অখন ভাত তোর বুধিরামকে—একটু সবুর কর, হাতের কাজ সেরে নিই।

বুধিরাম বারান্দায় বসে খাচ্ছিল। প্রথমে সে ভাত খেতে চায়নি।

—চা রুটি দ্যান মাসি, ভাত খাইলে ঘুম ধরে, কাম করতে পারে না।

—আমার মেয়ের আবদার, আজ ভাতই খাও বুধি।' বলে মা জায়গা করে - বারান্দায় বুধিরামকে ভাত দিলেন। বুলান বারান্দায় একটা কাঠের চেয়ারে বসে টুকুর টুকুর করে পা দোলাতে দোলাতে বুধিরামকে দেখছিল আর বকরবকর করছিল।

বুধিরাম দাদা, তোমার টাইটেল কী?

বুধিরাম অবাক হয়ে বুলানের দিকে তাকাল।

—টাইটে? কী? আমি জানছে না তো দিদিবাই।

—ধ্যাৎ, নিজের টাইটেল জানেনা এমন আবার হয় নাকি? তুমি যেন একটা কী বুধিরাম দাদা!

বুধিরাম বিব্রত হয়ে হাসল।

—তুমি কিতা কও, আমি বুজছি না তো দিদিবাই।

—বলছি তোমার টাইটেল কী? এই আমি যেমন মধুবন্তি দত্ত, তেমন তুমি বুধিরাম কী?

বুধিরাম এবার টাইটেলের মানে বুঝে হাসল।

—আমার তো দেববর্মা, বুধিরাম দেববর্মা।

আর ভূষণ দাদা? ভূষণ দাদার কী টাইটেল বুধিরাম দাদা?

—ভূষণ দাস, দিদিবাই।

এবার আর বুধিরাম উত্তর দিতে দেরি করল না।

—ভূষণ দাদা আর তুমি সব সময় একসঙ্গে আস কেন বুধিরাম দাদা কাজ খুঁজতে? ভূষণ দাদা তোমার কে হয় গো?

—বউ, এখানে দ্যাখো, বুলুরানি বকরবকর করে বুধিরামের খাওয়া নষ্ট করছে।

কাক্কু ঘরের ভেতর থেকে চিৎকার করে মাকে ডাকল।

—বুলান বকবক করে বুধিকে বিরক্ত কোরো না। যাও ঠাম্মার কাছে ঘুমোতে যাও—মা বুধিরামকে আরও ভাত দিতে এসে বুলানকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন ঘরে।

এমন সময় বাবা বাড়ি ফিরলেন তাস খেলে। প্রতি রবিবার বাবা জীবেশকাকুর বাড়ি তাস খেলতে যান। আজও গেছিলেন। এতক্ষণে খেলা শেষ হল।

বাবা আড়চোখে বুধিরামের ভাত খাওয়া দেখতে দেখতে ঘরে গেলেন। মা আলনা থেকে শাড়ি নিচ্ছিলেন স্নানে যাওয়ার জন্য। বাবা গলা একটু নামিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করলেন—বুধিরে ভাত দিলা? কামলা কামে দুপুরে চা রুটি দিলেও সারতো।

—তোমার মাইয়্যার আবদার। ক্ষিদায় বুধিরামের প্যাট ভিতর ঢুকছে, ভাত দিতেই লাগব। জানোই তো তোমার মাইয়্যারে, 'হুরের মইধ্যে ধুরের বাইদ্যো বাজাইতে ওস্তাদ।'

মা-বাবা নিজেদের মধ্যে বাঙাল ভাষায় কথা বলেন। কিন্তু বুলানের সঙ্গে কথা বলার সময় কলকাতার ভাষায় কথা বলেন। বুলানকে একটাও বাঙাল কথা বলতে দেন না। তাই বলে তো আর বাঙাল কথা বুঝতে

পারে না তা নয়। বলতেও পারে সে বাঙাল কথা। বুলানের স্কুলের বন্ধুরা তো, প্রায় সবাই বাঙাল কথা বলে। ঠাম্মা বলে, পিসিঠাম্মা বলে—কেবল কাক্কু বুলানের মতো কলকাতার কথা বলে। ঘরের খাটে বসে বসে মা-বাবার কথার সবটাই শুনলো আর বুঝলও বুলান। কেবল 'হুরের মইধ্যে ধূরের বাইদ্যো' কথাটার মানে সে বুঝতে পারল না।

বুলান তাই ঠাম্মার ঘরে চললো কথাটার মানে জিজ্ঞেস করতে। ঠাম্মা আর পিসিঠাম্মা খাটে বসে গল্প করছিলেন। কথাটা শুনে ঠাম্মা বললেন—আগে ক' কথাটা হইলো ক্যান? কি করছোস্ তুই?

বুলান বুদ্ধিরামকে ভাত খাওয়ানোর ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল ঠাম্মাকে।

বুলানের কথা শুনে পিসিঠাম্মা চোখের চশমা কপালে তুলে বুলানকে খানিকক্ষণ ভালো করে দেখলেন—তারপর গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বললেন,—'কামলা-ঝামলা গোরে ঘরের ভিৎরে ঢুকাইতে নাই বুলান, কামলার ব্যাশ ধইরা চোরেরা আহে, তা জানোছ নি?'

বুলানের ভারী রাগ হয়ে গেল। সে চোখটোখ লাল করে ফেলে বলল—'ও তো বুদ্ধিরাম দাদা, ও চোর হবে কেন?' ঠাম্মাও বুলানের কথায় সায় দিলেন—

ওমা বড়দি, তুমি কও কিতা? বুদ্ধিরাম চোর হইবে ক্যান? আই দশবারো বচ্ছর ধইর‍্যা অরে দ্যাখতাছি।' পিসিঠাম্মা গোমড়া মুখ করে ফেললেন।

—আমি কি বুদ্ধিরে চোর কইছি নি? অরে আমি চিনি না? বাড়িঘর খুইল্যা গেলেও অ আর ভূষণ্যায় কুছতায় হাত দিতো না। এ বাড়ির কামলা কামডি তো অরাই করে আইজ কত বচ্ছর হউলো। আমার কথাখান তুমিও বুজলানা বুড়া বেডি, তো বুলানে কিতা বুঝতো?

—তো বুঝাইয়া কত কথাখান, শুনি—ঠাম্মা পিসিঠাম্মার রাগ দেখে হাসতে হাসতে বললেন। পিসিঠাম্মা গলা আগের চেয়েও আরও অনেক নামিয়ে বললেন,—'কামলারা চোর হইবো ক্যান? অরা খাইট্যা খায়। চোরেরা আয়ে কামলা সাইজ্যা। ঘরে ঢোকে, কোনহানে কি থাহে দেইখ্যা যায়, ট্যাহা, গয়না.......রাতে আয়ে চুরি করতো বুঝলা?

—হ' এইবারে বোঝলাম—তা বুদ্ধিরামের লগে তো কেউ কাম করে না। তাইল্যে তুমি এত ডরাও কেরে? ঠাম্মা বুলানকে পাশে শোয়াতে শোয়াতে বললেন।

—আহা আমি ডরামু ক্যান? কইতাছি একখানা কথা। ওই যে হরিপদর বাড়িৎ? রাজমেস্তরির জোগালি সাইজ্যা ডাকাইতে আইছিলো।

হরিপদর বাড়িৎ? রাজমেস্তরির জোগালি সাইজ্যা ডাকাইত আইছিলো।

হরিপদ মেশোর বাড়ি কেমন করে ডাকাত পড়েছিলো পিসিঠাম্মা তার বর্ণনা দিতে লাগলেন। বেশ জমাটি গল্প। শুনতে শুনতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ল বুলান।

ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন বিকেল। দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। পশ্চিম আকাশে রঙের বাহার। বাড়ির পেছনের মস্ত বড়ো শিরিষ গাছের ওপর এসে পড়েছে দিনশেষের সূর্যের আলো। তাতে গাছটাকে দেখাচ্ছে যেন রূপকথার দেশের কোনো গাছ। বুলান পেছনের দরজায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ গাছটাকে দেখতে দেখতে কতকিছু ভাবল। তারপর চোখ নামাতেই বুদ্ধিরামকে দেখতে পেল।

বুদ্ধিরামের কাজ তখনো শেষ হয়নি। বাড়ির পেছনের পশ্চিম কোণে আগাছার ঘন জঙ্গল হয়েছিল। সে জঙ্গল সাফ করে ফেলেছে বুদ্ধিরাম। কিন্তু পশ্চিম সীমানার বেড়াটার বাঁধন আলগা হয়ে গেছে, —খুঁটিও হয়ে পড়েছে ঢিলা। শক্ত করে খুঁটি গেঁথে বেড়াটাকে বাঁধতে হবে—তবেই বুদ্ধিরামের কাজ শেষ। বাবা বুদ্ধিরামকে

কাজ বুঝিয়ে দিয়ে চলে এলে বুলান পায়ে পায়ে বুদ্ধিরামের দিকে যাচ্ছিল। কোত্থেকে যেন মা ঠিক দেখতে পেয়ে গিয়ে ডাক দিলেন।

—বুলান, ওদিকে খুব জঙ্গল, তুমি কিন্তু যাবে না। ওদিকে বুলানের ভারী রাগ হয়ে গেল মায়ের কথা শুনে। যা কিছু করতে যায়, মা কেবল বারণ করেন, 'এটা কোরো না, ওটা কোরোনা।' তো করবেটা কী?

পশ্চিম দিকটাতে খুব জঙ্গল ঠিকই। কিন্তু ভেতর দিকটাতো বুদ্ধিরাম কেমন ঝকঝকে তকতকে করে ফেলেছে। বেড়ার বাইরের দিকটায় অবশ্য ঘন জঙ্গল রয়েই গেছে। পিসিঠাম্মা বলেন, ওখানে নাকি বাঘ লুকিয়ে থাকতে পারে।—কিন্তু বুদ্ধিরাম যদি ওখানে দাঁড়িয়ে কাজ করতে পারে, তবে বুলান কেন পারবে না ওখানে যেতে?

কিন্তু বুলান কিনা লক্ষ্মী মেয়ে—তাই মায়ের কথা মান্য করে আর না এগিয়ে কলতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুদ্ধিরামের কাজকর্ম দেখতে থাকলো।

এমন সময় ভূষণ এল। বুলান নজর করল, ভূষণের গেঞ্জি ঘামে ভিজে গায়ে লেপটে লেগে আছে, আর গেঞ্জির তলা দিয়ে বেশ ভালো বোঝা যাচ্ছে ভূষণের পেটটা ঢুকে আছে।

—ও ভূষণ দাদা, তোমারও দেখি খিদা লেগেছে—তুমি ভাত খাওনি দুপুরে? মাকে চা-মুড়ি দিতে বলব?

বুলানের কথা শুনতে শুনতে ভূষণ বুদ্ধিরামের দিকে যাচ্ছিল।

—দিদিভাইয়ের মনটা যেন সোনা—বড়ো ভালা মাইয়্যা।' ভূষণ বুদ্ধিরামকে বলল।

—'হ'' জবাব দিতে বুদ্ধিরাম ভালো করে ভূষণকে দেখল।

—কাম পাইছে না তুই?

—পাইছি, ছুটা মুটা কাম, পুরা একরোজের কাম পাইছি না।

—অহনে? তুই চাল কিনতো কেমনে?

—সারবো নে, যা পাইছি বিশ পঁচিশ ট্যাহা......

—তরে আমি কইছে এইআনো কামে লাগতো, তুই শুনছে না। বুদ্ধিরাম রাগ করে বলল।

—লাগলে? তুই কামই পাইতি না শ্যাসে, তোর ঘরে প্যাটও বেশি।' কেমন দুঃখি-দুঃখি ভাবে কথাগুলো বলে ভূষণ একেবারে বেড়ার ধারে চলে গেল।

—আয় আমি ধরি, বেড়ার লাগাই সার তাড়াতাড়ি। কাম সাইর‍্যা বাজার কইর‍্যা বাড়ি যামুগা, শরীরটা ভালো আছিল না ছুটো মাইয়াডার....

—তুই খাইছ কিছু? রুটি উটি.....

বুদ্ধিরাম ভূষণকে জিজ্ঞেস করল। ভূষণ কোনো উত্তর না দিয়ে বুদ্ধিরামের সঙ্গে কাজে হাত লাগাল। বেড়ার খুঁটিগুলো শক্তপোক্ত করে পুঁতে ফেলেছে বুদ্ধিরাম। বেড়াটা শোয়ানো রয়েছে জঙ্গলের দিকটায়। তার ওপর দিয়ে ভূষণ জঙ্গলের দিকটায় চলে গেলো। ওইদিক দিয়ে বেড়াটাকে ঠেলে তুলে ধরবে ভূষণ। বুদ্ধিরাম গুণা দিয়ে খুঁটির সঙ্গে শক্ত করে বাঁধবে বেড়াটাকে।

—বুলান, দুধ খেয়ে যাও।'....

মা ডাকলেন। বুলান কোনো জবাব দিল না। সে হাঁ করে কাজ করা দেখছিল।

—ভূষণ দাদা, বাঘ থাকতে পারে কিন্তু ওখানে, জঙ্গলে।' সে চেঁচিয়ে বললো।

—বাঘ!

ভূষণ জোরে-জোরে হেসে উঠলো 'হাঁ-হাঁ' ক'রে।

—বাঘ না, তবে সাপখোপ থাকতে পারে বুলান। তুমি যেন ওখানে যেও না আবার।' মা আবারও বললেন। বুলানের এবার ভারী রাগ হয়ে গেল। 'সাপ থাকতে পারে?' মা যেন কী বলে। বুধিরাম আর ভূষণ যে কাজ করছে ওখানে, সাপ থাকলে ওদের বুঝি কামড়াবে না?

বুলান শুধু কথাটা ভেবেছে। এমন সময়—উরি বাপ! বলে মস্ত এক লাফ দিয়ে উঠল ভূষণ।

—কী! কী! বলে বুধিরাম চিৎকার দিতে না-দিতেই ভূষণের ডান হাতের জঙ্গল থেকে হিস্ হিস্ শব্দ করে মাথা তুলে দাঁড়াল এক মস্ত বড়ো সাপ।

বুলানও চিৎকার করে উঠেছিল। চিৎকার শুনে দৌড়ে এসে সেই দৃশ্য দেখে বাবা চট্ করে বুলানকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন—বুলান, শব্দ কোরো না। সাপটা আর ভূষণ একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। তাদের মধ্যে দূরত্ব ছিল হাত তিনেক। ভূষণের হাত একেবারে খালি। সে শব্দ না করে একটুও নড়াচড়া না করে সাপটার দিকে চেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

—ভূষণ, লইরো না, তাইলেই কাটবো সাপটা।'

বাবা ফিসফিস করলেন, ভূষণ কথাটা শুনতে পাবে না জেনেও, যেন নিজেকেই নিজে বললেন।

বুধিরামের পাশে কোদাল। সে কোদালটা হাতে তুলে নিলো। কিন্তু সাপটাকে মারবে কী করে? পড়ে থাকা বেড়ার ওপর দিয়ে হেঁটে সাপটাকে মারতে গেলেই শব্দ হবে। শব্দ হলেই সাপটা হয়তো তেড়ে গিয়ে কামড়ে দেবে ভূষণকে।

বিপদের গন্ধ যেন বাতাসে ভেসে বেড়ায়। ঠাম্মা, পিসিঠাম্মা, কাকু, মা সকলে জড়ো হয়েছিলো কলতলায়। সবাই একদৃষ্টে তাকিয়েছিল সাপটার দিকে। কেবল মা বাবার কোল থেকে বুলানকে নিজের কোলে টেনে নিয়ে একটু হেঁটে সিঁড়ির ওপর এক পা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন। যেন সাপটা এদিকে এলেই দৌড়ে বুলানকে নিয়ে ঘরে ঢুকে যাবেন। মায়ের চোখও সাপটার দিকেই।

ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে এক মস্ত সাপ। তার কালচে শরীরে এসে পড়েছে অস্তগামী সূর্যের মায়াবী আলো। সাপটা অল্প অল্প দুলছে।

সাক্ষাৎ মৃত্যু সামনে দেখে বিস্ফারিত চোখে সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভূষণ।

—নিয়তি! নিয়তি অরে টাইন্যা আনছে এইখানো মরতে।' পিসিঠাম্মা ফুঁপিয়ে উঠলেন চাপা গলায়। হয়তো এই শব্দটুকু কানে গেলেও সাপটা ফণা নামিয়ে আনবে ভূষণের পায়ে, এমন ভয়ে বাবা পিসিঠাম্মার মুখ চেপে ধরলেন।—চুপ।'

যেন এইটুকু শব্দেই সাপটা একটু নামিয়ে আনল তার মাথাটা। ওর পিছলে আসা মাথার ওপরে ঠিকরে উঠল বিকেলের পশ্চিমা সূর্যের আলো। মনে হল যেন মণি ঝলমল করে উঠল সাপের মাথায়। সাপটার মাথার ওপর মস্ত সাদাটে এক দাগ।

—পানখ।'

ঠাম্মা কেঁপে উঠলেন।

—এমন বিষাক্ত সাপ আছে এই বাড়িতে!'

কাক্কুরও গলা কাঁপছিল।

—নারায়ণের চরণচিহ্ন, সাক্ষাৎ কালসাপ!' পিসিঠাম্মা বিড়বিড় করলেন। অন্য সময় হলে কাকু পিসিঠাম্মার সঙ্গে তর্ক জুড়তো—'ওটা তোমার নারায়ণের পায়ের চিহ্ন নয় বড়পিসি, ওটা ওর শরীরের একটা দাগমাত্র....' কিন্তু এখন তো আর তর্ক করার সময় নয়।

—নাঃ, এভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখা যায় না।'

বলে কাক্কু মস্ত বড়ো একখানা মোটা বাঁশের লাঠি নিয়ে এগিয়ে গেল—বুদ্ধিরামের দিকে।

—যাইস না, ওরে যাইস না।'

ঠাম্মা কেঁদে ফেললেন। মা বুলান সুধু কাঁপছিলেন। কেবল নিঃশব্দে কাজ করছিলো বুদ্ধিরাম। সে প্রায় বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে একটু শব্দ না করে বেড়া ডিঙিয়ে সাপটার পেছন দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। এবং সত্যি সত্যিই একটু শব্দ না-করেই সে গিয়ে দাঁড়াল সাপটার পেছন দিকের জঙ্গলে। তার হাতে কোদাল। তবু সাপটাকে মারবে কিনা বুঝতে পারছিল না বুদ্ধিরাম। মারতে গিয়ে ফস্কালে সাপটা তো সোজা ফণা নামিয়ে আনবে ভূষণের পায়ে!

দুই বন্ধুতে হয়তো বা চোখে চোখে কোনও কথা হয়ে থাকবে। এঠাৎ মস্ত এক লাফ দিয়ে পেছনে সরে গেল ভূষণ। ভূষণের লাফ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ার ওধারের জঙ্গলে যেন চমকে উঠল বিদ্যুৎ। সাপটা ফণা নামিয়ে আনলো নীচে। কিন্তু ততক্ষণে বুদ্ধিরামও তার কোদাল নামিয়ে এনেছে সাপটার ওপর? কিন্তু মাটিতে ফণা নামানোর সঙ্গে সঙ্গে সাপটা এগিয়ে গেছে সামনে। —তার সরু হিলহিলে শরীর নিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে ভূষণের দিকে। বুদ্ধিরামের কোদাল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আছড়ে পড়ল। মাটিতে হয়তো বা সাপটার লেজে কোদালের ঘা একটুখানি লেগে থাকবে—বিপদ পেছনে অনুমান করে বুদ্ধিরামের দিকে ঘুরে গেল সাপটা।

—দুগ্গা, দুগ্গা, দুগ্গা, বন্ধুর মরণ নিজের উপ্‌রে ট্যাইনা নিলো!'

পিসিঠাম্মা অজ্ঞানের মতো হয়ে কলতলাতে বসে পড়লেন। মা বুলানকে বুকে চেপে ধরে কেঁদে উঠলেন শব্দ করে। কাক্কু কি করবে বুঝতে না পেরে বেড়ার ওপরই দড়াম করে বাঁশের ঘা বসিয়ে দিল একটা। সেই শব্দে আবারও সাপটা ফণা নামিয়ে আনলো। এবারও সে কাউকে কামড়াতে পারল না ঠিকই, কিন্তু ওরাও তো আসলে প্রাণের ভয়েই মানুষকে কামড়াতে আসে। লাঠির শব্দে ভয়ে মরিয়া সাপটা মস্ত উঁচু করে ফণা তুলল একেবারে বুদ্ধিরামের পায়ের ওপর।

তাই দেখে পাগলের মতো হয়ে গেলো ভূষণ। প্রায় মাটির ওপর বুকটা নামিয়ে এনে হামাগুড়ি দিয়ে সে এগিয়ে গেল সাপটার দিকে। বুদ্ধিরামকে বাঁচানোর অসম্ভব চেষ্টায় চেপে ধরল সাপটার লেজ—তারপর সাপটাকে মাথার ওপর তুলে ধরে জোরে জোরে হাত ঘোরাতে লাগল ভূষণ। থামলেই কামড়ে দেবে সাপটা, ভূষণ তাই হাত ঘোরাতেই থাকল।

—ছুইড়া ফ্যাল ভূষণ, ছুইড়্যা ফ্যাল.................

বুদ্ধিরামের গলা ভেঙে গেল। মস্ত এক পাক দিয়ে প্রাণপণে সাপটাকে ভূষণ ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরের জঙ্গলে।

তবু, আবারও তো ফিরে আসতে পারে সাপটা। দুদ্দাড় শব্দে দুই বন্ধু ছুটে এল কলতলায়। ওদের আগে ছুটে এল কাক্কু। হাতের বাঁশ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে। তারপর সবাই মিলে কলতলা থেকে দৌড়ে ঢুকে গেল ঘরের ভেতর।

দড়াম করে পেছনের দরজা বন্ধ করে ছিটকানি তুলে দিলেন বাবা।

—তুই দ্যাখাইলি মাধব। লাঠির ঘাই দিলি তো দিলি বেড়ার উপরে ...... বাবা কাক্কুর পেছনে লাগছিলেন।

—আর তুই তো গেলিই না ওই দিকে.....হ্যায় তবু গেছিলো সাহস কইর‍্যা।

ঠাম্মা বাবাকে লজ্জা দিলেন।

—সাহস বটে ভূষণ আর বুদ্ধির.....এমন সাহস আর দেখছিনা।' মা চা আর রুটি সামনে ধরে দিতে দিতে ভূষণ আর বুদ্ধিরামকে বললেন।

—বন্ধুত্ব বল। একে বলে বন্ধুত্ব। একজনের জন্য অন্যজন প্রাণ দিতে পারে। যাকে বলে দুজনের জন্য দুজনের 'জান হাজির'।

কাক্কু স্টাইল করে বলল।

—বাঁইচ্যা থাকো, লক্ষ বচ্ছর পরমায়ু হউক তোমাগো।'......

পিসিঠাম্মা বিড়বিড় করে আশীর্বাদ করলেন। ভূষণ আর বুদ্ধিরামের ওপর দিয়েই তো ধকলটা গেছে। ওরা এতক্ষণ দম্ ধরে বসে ছিল। কথাটিও না বলে। এখন ধীরে ধীরে খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে ওরা চুমুক দিল চায়ের গ্লাসে।

—কাল সারাবাড়িতে ব্লিচিং পাউডার ছড়াব ভূষণ। তারপর দিনের আলোয় বেড়াটা বেঁধে দিয়ে যেও দুইজনে। কেমন?

বাবা কামের কথা বললেন।

—বাড়ির ধারেপারে এমন বিষাক্ত সাপ! এ তো চিন্তার কথা!'..... মার ভয় কাটছিল না,

—না মাইর‍্যা ভালা করছো ভূষণ, বাস্তুসাপ বোধহয়।' পিসিঠাম্মা বললেন।

—হ বাস্তুসাপ, এতদিনে তো দেখি নাই কুনদিন।' ঠাম্মা রাগ করে বললেন।

—বাস্তুসাপটাপ না, যে কোনো সাপই না-মারতে পারলেই ভালো, প্রাণীহত্যা যত কম করা যায় ....

—ইস্ আর বুলানটা ঘোরে বাড়ির মধ্যে...... না, না তোমরা ও সাপের একটা ব্যবস্থা করো মাধব.....

মা রাগ করে কাক্কুকে থামিয়ে দিলেন।

—ও তো এখন বাড়ি চলে গেছে। সাপটা ওকে পাবে কোথায়? এতক্ষণ ভয়ে ভয়ে বসেছিল বুলান ঠাম্মার কোলের ভেতর। এবার সে মুখ খুলল। বুলানের কথা শুনে সকলে হাসল কাক্কু কেবল সাপটার কথা ভুলতে পারছিল না।

ভাবছি একেবারে নাজা নাজা অক্সিআনা, যাকে বলে কেউটে সাপ, কোথা থেকে এলো এখানে?

—ওইটা তো পানখ!' পিসিঠাম্মা বললেন।

—ত্রিপুরার মানুষ তো ফণা তোলা সাপেরই পানখ্ কয়, এতে কিচ্ছু বুঝা যায় না বড়োপিসি।

বাবা পিসিঠাম্মাকে বোঝাচ্ছিলেন।

—ওটা কিন্তু নাজা নাজা অক্সিআনা নয় মাধব। ওটা নাজা নাজা, গোখরো সাপ। ওর ফণার দাগটা দুইভাগে ভাগ হওয়া ছিল।' ....মা সাপটার অন্য একটি বৈজ্ঞানিক নাম বললেন।

—হ তুমি দ্যাখছো আর কি অত ভালোভাবে। ভয়ে বলে হুঁশ নাই তহন.....তায় সাইন্টিফিক নাম! বাবার কথাশুনে মা রাগ করে ভিতরের ঘরে চলে গেলেন। তারপর দুখানা প্রায় নতুন শার্ট এনে ভূষণ আর বুদ্ধিরামকে দিয়ে বললেন—'এ দুটো তোমরা নাও, ভূষণ, বুদ্ধি।' আমার মেয়ের বড়ো দুঃখ, তোমাদের গায়ে জামা নেই দেখে।

—দিয়া থুইয়্যা কি আর আমাগো দুঃখ কমাইতে পারবা দিদিভাই?

ভূষণ হাসতে হাসতেই বলল। ভূষণকে হাসতে দেখে বুদ্ধিও হাসল। বুলানও এতক্ষণে এক্কেবারে স্বাভাবিক

হয়ে চেঁচিয়ে বলল —'ও ভূষণ দাদা ও বুদ্ধিরাম দাদা তোমাদের ভয় করেনি ? ভয়?' অ্যাই রে, আবার শুরু হলো বুলুরানির প্রশ্নমালা। দাও এখন উত্তর বুদ্ধিরাম। এক বিপদের ওপর আরেক বিপদ শুরু।

বলে কাকু হেসে উঠে পাশের ঘরে চলে গেল। সব্বার হাসির মধ্য দিয়ে বিকেলের আড্ডা শেষ হলো।

অন্ধকার নেমে এসেছে তখন। ভূষণ আর বুদ্ধিরাম ওদের বাড়িতে ফিরে যাচ্ছিল। জিরানীয়ার দুইগ্রামে দুইজনের বাড়ি। সেখানে ওদের যার যার বেড়ার ঘরে, মাটির মেঝেতে শুয়ে বসে জেগে আছে ছেলেমেয়েরা—বাবা বাড়ি ফিরলে চাল আসবে ঘরে। মা ভাত রাঁধবে, ওরা ভাত খাবে। ওদের ঘরে হয়তো কেরোসিনের কুপি জ্বলছে, হয়তো অন্ধকার।

ওরা বাড়ি ফিরলে উনানে আগুন জ্বলবে। বাচ্চারা পেটে খিদে নিয়ে জেগে আছে—তাই তাড়াতাড়ি পা চালাচ্ছিল ভূষণ আর বুদ্ধিরাম।

বুলান তো আর এতশত জানে না। সে কেবল দেখছিল জামা পরেছে বলে বুদ্ধিরামের পেশিগুলো আর দেখা যাচ্ছে না। ভূষণের পিঠটা ঝুঁকে পড়েছে—দুজনকেই দেখাচ্ছে কেমন দুঃখী মানুষের মতো। বুদ্ধিরামের কাঁধে হাত রেখে ভূষণ হাঁটছিল। ভূষণ বুদ্ধিরামের কে হয় এতক্ষণে জেনে গেছে বুলান।

—ওরা বন্ধু, প্রাণের বন্ধু, একজনের জন্য অন্যজনের 'জান হাজির'।

কাকু বলেছে, বুলানের মনে পড়ল।

—আমার এমন বন্ধু এখনও হয়নি, কিন্তু একদিন নিশ্চয়ই হবে। বুলান ভাবছিল।
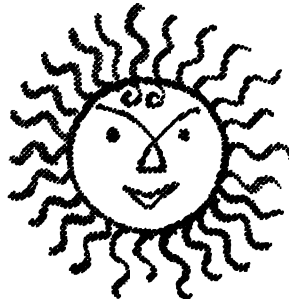
নীলপরির ছোঁওয়া

শংকর বসু

বুকুন কিছুতেই বুঝতে পারে না সে কী করবে? সারাদিন নানা ব্যস্ততায় দিন কাটে তার। সকাল সাড়ে পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে জামাটামা পরে তৈরি হতে হয়। সোয়া ছটায় স্কুলের বাস। চোখ থেকে তখনও ঘুম ছাড়ে না। কতদিন ভোরবেলার কত মিষ্টি স্বপ্ন মার ডাকে ভেঙে গেছে। ধড়মড় করে উঠে বসেছে বিছানায়। মনে করতে পারে না এখন তার কী করতে হবে। এইতো একটু আগে একটা সুন্দর বাড়ির সামনের মাঠে একদল ছেলেমেয়ের সঙ্গে খেলা করছিল। কী মজাই না লাগছিল। কেউ বকার নেই, কেউ তাড়া দেবার নেই। বড়ো বাড়িটার গেট ধরে তার বয়সি ফুটফুটে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে ওদের খেলা। ও কি ওই বাড়িতেই থাকে? বুকুন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ঠিক সেই সময়েই মায়ের গলা শোনা যায়, "বুকুন ওঠ-সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে।" ঘুম ভেঙে যায়। চোখে মুখে জল দিয়ে দাঁত মেজে ছটার মধ্যে রেডি। সাতটা থেকে দশটা স্কুল তাদের। এই তিনটে ঘন্টা যেন কিছুতেই কাটে না তার? না বুকুন যে পড়াশুনো করতে ভালোবাসে না, তা নয়। বরং ক্লাশের অন্য বন্ধুদের তুলনায় অনেক তাড়াতাড়ি ক্লাশের কাজগুলো করে নিতে পারে সে। আন্টিরা খুশিই হন তার ওপর। কিন্তু আন্টিদের তার যেন কেমন ভয় করে। সব সময় যে বকাঝকা করেন তা নয় কিন্তু এমনি একটা গম্ভীর মুখ নিয়ে পড়ান, বুকুন সেখানে যেন কিছুই মজা পায় না। ক্লাশঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে বসে মনটা তার হাঁপিয়ে ওঠে। তাদের ক্লাশঘরের জানলা দিয়ে দূরের পাহাড়ের মাথাটা দেখা যায়। নদী আর পাহাড়ে ঘেরা তাদের এই ছোটো শহরটা বুকুনের খুব প্রিয়। বুকুন পাহাড়টার দিকে চেয়ে ভাবে ইস, কবে যেন সে ওই পাহাড়ে যেতে পারবে। পাহাড়ের মাথায় জমে থাকা ধোঁয়া ধোঁয়া ভাবটা কি কুয়াশা? পাহাড়টা আরও উঁচু হলে কী সুন্দর বরফ পড়ত। টিভিতে সে দেখেছে উঁচু বরফচূড়ার পাহাড়গুলো কী সুন্দর! সে তেনজিং হিলারীর গল্প পড়েছে। পড়েছে বাচেন্দ্রী পালের কথা। তার এক কাকু খুব পাহাড় আর সমুদ্র ভালোবাসে।

এই রাঙাকাকু এলেই বুকুন নানা দেশ-বিদেশের গল্প শুনতে পায়। কাকুর বেড়াবার খুব নেশা। প্রতিবছর পুজোর সময় কাকু কোথাও না কোথাও বেড়াতে চলে যায়। তারপর ফিরে এসে মজার মজার গল্প করে। কাকুর মুখেই পাহাড়ের গল্প শুনেছে বুকুন। কাকু কত বই পড়ে। কাকুই তাকে বলেছে দেশবিদেশ থেকে কত লোক এভারেস্টে উঠতে আসে। এটা না কি দারুণ অ্যাডভেঞ্চার। কোমরে দড়ি বেঁধে কুড়ুল দিয়ে বরফ কেটে কেটে উঠতে হয়। টিভি-তে যদিও সে দেখেছে কিন্তু কাকুর মুখে গল্প শোনার মজাটাই আলাদা। কাকুর মুখেই সে শুনেছিল এক ফরাসী ভদ্রলোক প্রথমবার এভারেস্ট চড়তে এসে তুষার ঝড়ের ক্ষতে একটা পা হারান। পরের বার ক্রাচ নিয়ে তিনি এভারেস্টে অভিযানে এসেছিলেন। সে অবশ্য এখনও বরফ ঢাকা পাহাড় দেখেনি। শুধু একবার সমুদ্র দেখেছে। পুরীতে গিয়ে। খুব মজা লেগেছিল। সমুদ্রের বড়ো বড়ো ঢেউগুলো এসে হুড়মুড় করে তীরে ভেঙে পড়ে তাদের ভিজিয়ে দিচ্ছিল। জিনিসপত্তর কিছু কিছু নিয়ে গিয়ে আবার অন্য জায়গায় ফিরিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু বেড়ানোর পুরো আনন্দটা বুকুন পায়নি। হোটেলে ফিরে বইখাতা নিয়ে বসতে হয়েছে।" "পড়াশোনাটাই আসল, বুঝলে বুকুন?" বাবা দিনরাত বলেন। আসলে বাবা কোথাও যেতে চান না। সারাদিন বুকুনের জন্য তাঁর চিন্তা। অফিস থেকে ফিরে রাত দশটা পর্যন্ত বুকুনকে পড়ান তিনি। তাঁর কাছে পড়াশুনো ছাড়া আর সবটাই অর্থহীন। তাই বেড়াতে গিয়েও বুকুন পুরোপুরি মজাটা পায় না। বুকুন বড়ো হলে আবার সমুদ্র দেখতে যাবে। কিন্তু তার আগে তাদের ওই দূরের পাহাড়টায় তো তাকে যেতে হবে। চুড়োয় বরফ না থাকলেও বুকুনের ধারণা জায়গাটা খুবই সুন্দর হবে। 'বি অ্যাটেনটিভ সুগত' আন্টির গলা। বুকুনের ভালো নাম সুগত। বুকুনের মনটা আবার ক্লাশরুমে ফিরে আসে। আন্টি বোর্ড-ওয়ার্ক করার জন্যে বুকুনকে ডাকছেন। বুকুন বোর্ডে যায়। কিন্তু চিন্তায় মধ্যে পাহাড়টা লেগে আছে। 'হোয়াটস্ রং উইথ ইউ?' আন্টির কথায় বুকুন যেন ফিরে আসে। দেখে বোর্ডের সহজ অংকটা সে ভুল করেছে। আন্টি অবশ্য খুব কিছু একটা বললেন না। কিন্তু হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষায় সে বাবার কাছে কী বকুনিই না খেল একটা অংক একটু ভুল করে ফেলায়। কিন্তু সে কী করবে? ঠিক সেই সময়েই যে সুন্দর দুটো পাখি এসে তার পরীক্ষার হলের জানালার বাইরের ফুলগাছে বসল। কী সুন্দর রঙ তাদের! তারা যে বুকুনের সব মনোযোগ কেড়ে নিল। ফলে একটা অংকে ছোট্ট একটু ভুল হয়ে গেল। কিন্তু বাবাকে তো আর পাখি দেখার গল্প বলা যায় না। বাবা আরও রেগে যাবেন। এমনিতেই বুকুন বাবাকে ভীষণ ভয় পায়। বাবা যে তাকে ভালোবাসেন না তাও নয়। কিন্তু বাবার ভালোবাসার মধ্যে যেন আনন্দ পায় না সে। সারাদিন 'এটা কর ওটা কর।' এই বই পড় ওই অংক কর, তোমাকে অনেক বড়ো হতে হবে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, ইলেকট্রিক না কি ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে মিষ্টি দিদি, রাহুল দাদা, শমীক দাদা, চুমকি দিদির মতো।' বুকুন বুঝতে পারে না এই মোটে ক্লাস থ্রি থেকে তাকে কেন এত সব করতে হবে। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে আঁকা নিয়ে বসো। আঁকার হোমওয়ার্ক করো। স্নানটান সেরে আবার বসো স্কুলের হোমওয়ার্ক নিয়ে। পড়তে পড়তে চোখ ঢুলে আসে ঘুমে। মা অনেক সময় বলেন, "বুকুন এখন থাক, ঘুম থেকে উঠে কোরো।" কিন্তু বুকুন ভয় পায়। বাবা যদি রেগে যান। বুকুন বুঝতে পারে এই বয়সেই, মার যেন কোথাও একটা কষ্ট আছে। কতদিন মা আনমনা হয়ে যান। বাবা ভীষণ রাগারাগি করেন তখন মার মুখটা কেমন করুণ হয়ে ওঠে। কখনও কখনও মাকে সে কাঁদতেও দেখে। কেন কে জানে। মার কাছে পড়তে বুকুনের খুব মজা। মা আবার তাকে বোঝান, "বুকুন, বাবার কথা শোন। দেখছ তো তোমার বাবা কত বড়ো ইঞ্জিনিয়ার। বাবার মত হও তোমাকে কত বড়ো হতে হবে।" বলতে বলতে মার দুটো চোখ জলে ভরে যায়। বুকুন মার চোখ দুটো মুছিয়ে দেয়। বুকুন তো জানে না মার অজান্তেই তাঁর নিজের ছোটোবেলার দিনগুলো মনে পড়ে গেছে—এত শাসন এত কড়াকড়ি বাঁধাবাঁধি ছিল না। এক বনের পাখির মতো উড়ন্ত জীবন ছিল। ইস্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথটায় কত মজা। পড়ার সময় পড়া-তারপর শুধু খেলা আর মজা। সন্ধেবেলায় নিজের মনের

আনন্দে গান করা। কিন্তু এই কুড়ি পঁচিশ বছরের মধ্যে সব কিছু কেমন যেন বদলে গেল। চারিদিকে খালি কম্পিটিশান আর দৌড়। মই বেয়ে ওপরে ওঠার প্রতিযোগিতা। তা ছোট্ট বুকুন কি এত সব বোঝে? সে জানে বিকেল হলে তাকে আবৃত্তির ক্লাশে যেতে হবে দুদিন, দুদিন আঁকার ক্লাশে। যেতে যেতে মনটা খারাপ হয়ে যাবে যখন দেখবে তাদের পাড়ার একফালি মাঠে তমাল, টুকাই, বুবুন, বাচ্চুরা ক্রিকেট খেলছে, দৌড়োচ্ছে। কিন্তু তাকে তো এখনি যেতে হচ্ছে। তাকে যে আঁকা আর আবৃত্তিতে ফার্স্ট হতে হবে। তার বাবার কাছে ফার্স্ট ছাড়া আর কোনো জায়গা নেই। বুকুনের চোখ দুটো ভিজে ওঠে। পথে যেতে একটু দাঁড়িয়ে যে নদীতে নৌকা বাওয়া দেখবে তাও সময় পায় না। বুকুন ভাবতে ভাবতে যায় নদীর এত জল কোথায় থেকে আসে কোথায় যায়? সারাদিন তারা খালি আসছেই। কেউ তো তাদের বারণ করে না। তবে তার বেলায় এত বারণ বাধা কেন? ওই তো নীল রঙের পাখিটা এ-গাছ ও-গাছ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে আলো কমে আসছে বলে কেউ তো তাকে বকছে না। এই যে এত পিঁপড়ে সারাদিন কত ব্যস্ত হয়ে চলাফেরা করছে ওরাও কি ওর মতো সারাদিন বকুনি খায়! কাকুর মুখে গল্প শুনেছে ওরা নাকি খুব ডিসিপ্লিনড্। ওদের নাকি একজন রানি আছে। কেমন রানি কে জানে। তার মাথায় কি মুকুট থাকে? বাড়ি ফিরে আবার তাকে বসতে হবে অঙ্কের, ইংরেজির বইখাতা নিয়ে বাবা রেস্ট নিয়ে তাকে নিয়ে বসবেন। তারপর দশটা বাজবে। বুকুন আর পারে না। এইবার খেয়েদেয়ে বিছানায় যেতে হবে।....কিন্তু সেদিন যে কী হল? সারাসন্ধে থেকে মাথার মধ্যে যেন রেলগাড়ি চলছে। বাবার কোনো কথাই মাথায় ঢুকছে না। বকুনি মার চলছেই। বুকুন কিছুতেই বোঝাতে পারছে না তার কষ্ট, তার অসহায়তা। বিছানায় শুয়ে চোখের জল আর বাধা মানে না তার। তারপর কখন যেন সে ঘুমিয়ে পড়ল। আবারও তার সামনে সেই সুন্দর বাড়ি। আজ তার গেটটা খোলা, বুকুন ভয়ে ভয়ে ঢুকল। সেই ছোট্ট মেয়েটাকে সে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না। সে কোথায় গেল। বাড়িতে কি আর কেউ নেই। কেউ কি থাকে না এত বড়ো বাড়িতে। বাগানে কত ফুল। একটু কি ছুঁয়ে দেখবে বুকুন। দূরে কোথায় একটা পাখি ডাকছে। সেই নীল পাখিটি কি? সে কি ঘরের মধ্যে ঢুকবে? ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলল সে। আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে এল। কী সুন্দর সাজানো ঘর। হঠাৎ তার মনে হল কে যেন তার মাথায় হাত রাখল। বুকুন তাকিয়ে দেখল নীল পোশাক পরা এক অপূর্ব সুন্দর পরী তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। বুকুনের যে কী ভালো লাগল। আস্তে আস্তে সে দেখল পরীর মুখটা তার মায়ের মতো। আর মনে হল কে যেন তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছে ঘুম ভেঙে গেল বুকুনের। দেখল ঘরে আলো জ্বলছে আর মা তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন আর বলছেন আমার বুকুন বুকুনই থাক আমি আর কিছু চাই না। বুকুন অবাক হয়ে দেখল বাবা দাঁড়িয়ে আছেন টেবিলের সামনে—তাঁর চোখ দুটোও চিক্ চিক্ করছে। আনন্দে বুকুনের চোখ দুটো আবার জলে ভরে উঠল।

ফুলপরির দেশে সাইনি

নিলিপ পোদ্দার

সে এক আশ্চর্য সকাল। কুয়াশার ভোরের মতো দূর থেকে ভেসে আসা পাখির কিচিরমিচির, কাকেদের গম্ভীর কা কা। একটা ঘন নির্মল নীলচে আলোয় যখন মায়াময় পৃথিবী, ঠিক সেই মুহূর্তে সাইনি যেন শুনতে পেলো, টুক্‌টুক্.....টুক্‌টুক্। প্রথমে একটু ভয় ভয় করলো সাইনির। চাদরটা টেনে মাথা অব্দি মুড়ি দিয়ে চুপ করে উৎকর্ণ হয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত। সেই কয়েক মুহূর্ত যেন শব্দহীন বর্ণহীন। যেন পৃথিবীটা মরে গেছে। এতো চুপচাপ আর নিঃশব্দ। ঝিম ধরে চাদরের ভেতর দমবন্ধ অবস্থায় কেটে গেল কয়েক মুহূর্ত এবং যখন মাথা তুলতে যাবে ভাবছে সাইনি আর ঠিক তখনই আবার সেই টুক্‌টুক্.....টুক্‌টুক্। সাইনি মাথা থেকে টেনে চাদর সরিয়ে ফেলে এবং আন্দাজ করতে থাকে শব্দের উৎসস্থল। দরজার দিকে চোখ স্থির রেখে উৎকর্ণ হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত, তারপর চোখ সরায় পশ্চিমের জানালায় এবং সবশেষে মাথার কাছের কাঁচের জানলায়। কাঁচের জানালায় চোখ পড়া মাত্রই সাইনি সটান বিছানায় বসে পড়ে। মুখটা তার আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে।

........"সাইনি......এই সাইনি" একটা হালকা নীল আলোয় সাইনি দেখতে পেল জানালায় দাঁড়িয়ে অপূর্ব এক ফুলপরি। পিঠে দুটি মস্ত ডানা নড়ছে ক্রমাগত। তার সারা শরীরে ফুলের বাহার এবং সব ফুলগুলিই বকের মতো ফুটফুটে সাদা। সাইনি কী করবে বুঝতে পারে না। আর ঠিক তখনই ফুলপরিটা ইশারায় ডাকে তাকে। সাইনি চুপচাপ মশারির ভেতর থেকে উঠে আসে। তারপর জানালার কাছে এসে বলে—

— 'কী? আমায় ডাকছ কেন?

— তুমি এখনো ঘুমোচ্ছ? তোমার তো এখন ছাদে থাকার কথা।

— ওমা, তুমি জানো কী করে?

— তুমি ফুল ভালোবাসো, তাই তোমায় আমি ভালবাসি, তোমার সব খোঁজখবর রাখি।

— সত্যি?

— সত্যি না হলে আমি বললাম কী করে বলো।

— এবার জানালার খুব কাছে এসে সাইনি বলে, তুমি ছাদে গিয়ে দাঁড়াও আমি এক্ষুনি আসছি। ফুলপরিটা বিশাল ডানা দুটি দুলিয়ে নিমেষে ওপরে উঠে যেতে লাগল। সাইনির চোখে অপার বিস্ময়। এবার পা টিপেটিপে সাইনি দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় এবং মুহূর্তে মনটা খারাপ হয়ে যায়। দরজার ছিটকিনি তার নাগালের অনেক বাইরে। তবে কি মাকে বা বাবাকে ডাকবে। সাইনি ভাবতে ভাবতে মন খারাপ করে ফেলল। দু'চোখ জলে ভারী হতে লাগল। আর ঠিক তখনই সাইনির খেয়াল হল চেয়ারের কথা। সে পা টিপে টিপে একটা ডাইনিং চেয়ার নিয়ে এল এবং এক মুহূর্ত ছিটকিনি খুলতে দেরী হল না। তারপর হুড়মুড় করে সিঁড়ি টপকে টপকে উঠে যেতে লাগল ছাদে। ছাদে উঠতেই একরাশ ফুলের পাপড়ি কে যেন সাইনির সারা শরীরে ছিটিয়ে দেয়। সাইনি একটা অদ্ভুত সুন্দর গন্ধ পেলো। তার এতো ভালো লাগল নিজেকে সে "সিনড্রেলা" ভাবতে শুরু করল। তার দীর্ঘ ওড়না ধরে আছে বেশ ক'জন পরিচারিকা। সে মেপে মেপে পা ফেলতে ফেলতে এগিয়ে যাচ্ছে.........

কী ভাবছ বলে ফুলপরিটা এবার ছাদে এসে দাঁড়ায়। মুহূর্তেই একটা অপূর্ব ঘোর ভেঙ্গে যায় সাইনির।

সাইনি বলে, —না কিছু না।

আকাশ এখন নির্মল নীলচে। মাঝে মাঝে সাদা সাদা রংয়ের পোঁচ। খুব দূরে নারকেল গাছের ফাঁকে ফাঁকে একটা হালকা গোলাপি আলোর রেশ দু' একটা পাখি কিচিরমিচির করে আবার শান্ত হয়ে যায়। কাকের কা' কা' শব্দ নেই। মানুষেরা সবাই ঘুমিয়ে আছে। চারিদিকে একটা শান্ত সুন্দর পরিবেশ। সাইনি এতো ভোরে কোনো দিন ওঠেনি, তাই তাকে সবকিছু অবাক করে দিচ্ছে।

— কী হলো কী এতো ভাবছ?

সাইনি এবার লজ্জা পেয়ে যায়। বলে আসলে আমি কোনোদিন তো এতো ভোরে ঘুম থেকে উঠিনি তাই ছাদে এসে আমার কাছে সব কিছু কী অদ্ভুত মায়াময় লাগছে।

— ফুলপরি তার মস্ত পাখা দুটি দুলিয়ে দুলিয়ে বলল, ছাদ থেকে আর কতটুকু দেখা যায়, আমার পিঠে উঠে বসো, তোমাকে সারা শহর ঘুরে দেখাব।

— সাইনি এক মুহূর্ত দেরি করে না, কিছুই ভাবে না। শুধু আনন্দে লাফিয়ে উঠে বলে, কাছে এসো পরি আন্টি। আমি তোমার পিঠে চড়ে সারা শহর ঘুরে দেখব। দেখাবে তো?

ফুলপরিটা ছাদে নমস্কারের ভঙ্গিতে মাথা নীচু করে। সাইনি লাফিয়ে ফুলপরির পিঠে উঠে বসে এবং দু'হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে।

ফুলপরিটা এবার তার পাখা দুটি বেশ জোরে নাড়া দিয়ে অদ্ভুত একটা গতিতে ছাদ থেকে আকাশে উড়তে লাগল যেন একটা চিল। শূন্যে পাক খেয়ে খেয়ে উঁচুতে আরও উঁচুতে উঠতে লাগল। সাইনির একটু ভয় করল না। তার খুব আনন্দ হতে লাগল। সে পরি আন্টির গালে গাল লাগিয়ে বলল, আন্টি একটু জোরে চলো তো। ফুলপরিটা হেসে বলল, আগে ধীরে ধীরে দেখো, তারপর আমরা জোরে যাব। সারা শহরের ওপর দিয়ে

সাইনিরা বেড়াতে লাগল। কোথাও কোনো শব্দ নেই। তারারা এখনো মিটমিট করছে। অদ্ভুত একটা আমেজে সাইনি সব দেখতে লাগলো। জেগে নেই মানুষেরা। শান্ত, বড়ো শান্ত চারিদিক।

পরিটা বললো, এবার চলো তোমাকে আমার দেশে নিয়ে যাই।

— তোমার দেশ কোথায়?

— এই তো মাথার উপর যে একরাশ মেঘ দেখছো তার ওপরে আমাদের দেশ।

— আমি যেতে পারবো সেখানে?

— তুমি একা পারবে না। আমি নিয়ে গেলেই যেতে পারবে। ওখানে এমনিতে কোনো মানুষের প্রবেশ করার অনুমতি নেই।

— তাহলে,

তুমি ভালো মেয়ে, তুমি ফুল ভালোবাসো, যত্ন করো, সময় মতো জল দাও, রোদ দাও। আমি এসব জানি, তাই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার কথা একদম আলাদা।

ফুলপরিটার পাখা দুটো দ্রুতগতিতে দুলতে শুরু করল এবার এবং গতি ক্রমশই বাড়তে লাগল। হঠাৎ করেই সাইনির চোখ যায় পৃথিবীটার দিকে। সে কেমন ভয় পেয়ে গেল। সেবার কলকাতা যাবার পথে প্লেন থেকে দেখা পৃথিবীর মতোই সব কিছু কেমন ছোটো দেখতে শুরু করল। বাড়িঘরগুলো যেন দেশলাই বাক্স। এতো বড়ো নদীটা যেন বাড়ির পাশের ছোট্ট নালাটা। পাহাড়গুলো যেন সরস্বতী পুজোয় বানানো ছোটো ছোট পাহাড়। সাইনি হঠাৎ খেয়াল করল, পাহাড়গুলো যেন নেড়া নেড়া। গাছপালা প্রায় নেই। বিস্তীর্ণ এলাকা ফাঁকা। কেমন যেন বেমানান। সে বলল পরি আন্টি, পাহাড়গুলো এমন কেন? গাছপালা নেই, নদী নেই, পাথর নেই, ঝরনা নেই, সবুজ রংটাই যেন হারিয়ে গেছে।

ফুলপরিটা কিছুই বলল না হঠাৎ করেই আবার নীচে নামতে শুরু করল এবং ধীরে ধীরে পাহাড়গুলো স্পষ্ট হতে লাগল। গাছাপালাহীন ন্যাড়া সব পাহাড়। এবার ফুলপরিটা বলল, দেখতে পাচ্ছো কিছু লোক কেমন করে গাছ কাটছে। সাইনি এদিক ওদিক দেখতে লাগল। চারিদিকে কেমন ছায়া ছায়া অন্ধকার এবং হঠাৎ-ই পরিষ্কার দেখতে পেল বেশ ক'জন লোক গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। সাইনির ভূগোল স্যারের কথা মনে পড়ল। স্যার বলেছিল, আমরাই আমাদের সর্বনাশ করছি। এই যে এত বৃষ্টিপাত, টানা খরা বা প্রচণ্ড তাপ, সবই গাছাপালা বন ধ্বংস করার ফল। প্রকৃতির ভারসাম্য আমরা গাছপালা কেটে নষ্ট করে ফেলছি। সাইনির মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল।

ফুলপরিটা সাইনিকে বলল, মন খারাপ কোরো না। পরে তোমাকে সব বলবো। এবার চলো তোমাকে আমার দেশে নিয়ে যাই। এবার মেঘগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ফুলপরিটা দ্রুত অতি দ্রুত ডানা ঝাপটিয়ে চলতে শুরু করল। সাইনির খুব মজা লাগতে শুরু করল। পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ছোটো ছোটো মেঘগুলো। পৃথিবীর কিছুই এখন আর চোখে পড়ে না। হঠাৎ সাইনি দেখলো বেশ ক'টা ছোটো ছোটো পরি ভেসে বেড়াচ্ছে। সাইনি চিৎকার করে উঠলো, পরি আন্টি, দেখো দেখো, ছোটো ছোটো কতগুলো পরি। ফুলপরিটা বললো, আমরা তো আমাদের দেশের খুব কাছে চলে এসেছি, তাই তুমি ওদের দেখতে পাচ্ছো। ওরা এখন শরীরচর্চা করছে। বলেই ফুলপরিটা চিৎকার করে ডাকল, মিটু, ইস্‌লি, ভিল্টু শুনে যা। সাইনি দেখল ছোটো ছোটো পরিরা

এবার ওদের কাছে আসতে শুরু করলো এবং মুহূর্তেই ওদের চারিপাশে বৃত্তের মতো ঘিরে ধরে চলতে শুরু করলো। এখন চারিদিকে শুধু মেঘ আর মেঘ। কোনোটা লালচে, কোনোটা সোনালি, আবার কতগুলো শুধু নীল আর নীল, কোথাও পৃথিবীর চিহ্নমাত্র নেই। সেই মেঘরাজ্যের এক বিশাল তোরণ দিয়ে প্রথমে ফুলপরিটা প্রবেশ করল, তারপর ছোটোরা। সাইনি চোখে চারদিকে দেখতে লাগল, সব ছোটো ছোটো পরি। দৌড়াচ্ছে, খেলছে, কেউ কেউ মালা বানাচ্ছে। চারিদিকে শুধু ফুল আর ফুল। নাম-না-জানা অসংখ্য সব ফুলের বাহার। একটা ফুল দেখে সাইনি চোখের পলক আর পড়ে না, এতো বড়ো ফুল সে জীবনেও দেখেনি। এবার ফুলপরিটা এগিয়ে এসে একটা বিশাল ঘণ্টা দোলাতে লাগল। ঘণ্টার সুরেলা আওয়াজ আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগল মেঘের রাজ্যে। সাইনি দেখতে পেল বেশ কিছু পরি তাদের সামনে এসে জড়ো হচ্ছে। ফুলপরিটা বলল, শোনো, এ হচ্ছে পৃথিবীর মানুষ, ওর নাম সাইনি। ও কিন্তু খুব ভালো মেয়ে। খুব ফুল ভালোবাসে। তোমরা ওকে তোমাদের সাথে খেলায় নাও। হুড়মুড় করে সব বাচ্চাবাচ্চা পরিগুলো এবার সাইনিকে ঘিরে ধরল। বলল চলো, আমরা হিটাং হিটাং খেলি। সাইনি বলল, আমি তো এমন খেলা জানি না ভাই। ছোট্ট পরিগুলো বলল, আরে ঠিকই-তো, তুমিতো আর আমাদের দেশের লোক নও, ঠিক আছে তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে ওরা সাইনিকে খেলাটার নিয়ম কানুন শিখিয়ে দিল। সাইনির খুব মজা লাগল এই খেলাটায়। মনে মনে স্থির করল, স্কুলের বন্ধুদের এবার সে এই খেলাটা শিখিয়ে দিয়ে অবাক করে দেবে। সাইনি বলল, তোমাদের আমিও একটা আমাদের দেশের খেলা শিখিয়ে দেব। তোমরা সবাই এবার হাত ধরে গোল হয়ে দাঁড়াও। পরিগুলো মজা পেয়ে সবাই হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে দাঁড়ালো। সাইনি বলল, এবার সবাই হাত ধরে চলতে শুরু করো এবং আমার সাথে গান শুরু করো। রিংগা রিংগা রোজেস.......।

বেশ কয়েকবারের পর খেলাটা ছোটো পরিগুলো আয়ত্তে আনতে পারল। তারপর চলল এক প্রচণ্ড হুল্লোড়। পরিগুলো চিৎকার করে করে গাইতে লাগল রিংগা রিংগা রোজেস, পকেট ফুল অব্ পোজেস......। এমন সময় সেই ফুলপরিটা এগিয়ে এল, বলল চলো সাইনি, আমাদের ঘর দেখবে না? সাইনি বলল, কোথায় পরি আন্টি।

তুমি এসো দেখতে পাবে। এবার তার মন না চাইলেও ছোটো পরিদের টা টা জানিয়ে সাইনি পরি আন্টির সাথে চলতে শুরু করল। কাছেই মেঘ দিয়ে তৈরি এক বিশাল প্যালেসের মধ্যে সাইনিরা ঢুকল। চারিদিকে অপূর্ব কারুকাজ। আমাদের দেশের যে-কোনো রাজবাড়ি এর কাছে লজ্জা পাবে। মূল প্যালেসটা ধবধবে সাদা। তার উপর সোনালি মেঘের কারুকাজ। এমন সময় একটা পরি এসে বিশাল একটা থালায় কী যেন নিয়ে এসে দাঁড়ালো। পরি আন্টি বলল, সাইনি এতক্ষণে নিশ্চয়ই তোমার ক্ষিদে পেয়ে গেছে। কিছু খেয়ে নাও। সাইনি বলল, এগুলো কী? ফুলপরিই বলল, এ হচ্ছে আমাদের দেশের ফল। তুমি খাও, তোমার খুব ভালো লাগবে। সাইনি লজ্জা পেতে পেতে অদ্ভুত সুন্দর দেখতে ফুলগুলো খেতে শুরু করল। আর অবাক হতেও শুরু করল। কোনোটা খুব মিষ্টি, কোনটা উপরে টক টক আর ভেতরে মিষ্টি। আবার একটায় ঘিয়ের গন্ধে ভরপুর। সাইনি বলল, পরি আন্টি আমি একটা নিয়ে যাই? ফুলপরিটা বলল এটা তো করা যাবে না, সাইনি। তুমি মন খারাপ কোরো না। আসলে আমাদের দেশের কোনো জিনিস বাইরে যাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ। সাইনির হঠাৎ করেই মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেলো। মনে মনে বলল, এটা একদম বাজে নিয়ম, দেওয়া নেওয়া না থাকলে সমৃদ্ধ হওয়ার রাস্তা কোথায়। ফুলপরিটা সাইনিকে বলল, আমি বুঝতে পারছি তোমার মন খারাপ হয়ে গেছে। তবে তুমি একটু বড়ো হলে বুঝতে পারবে, কেন সব নিয়ম এক রকম হয় না।

সাইনি কিছুক্ষণ চুপচাপ দাড়িয়ে রইলো। তার দু'চোখ জলে ভরে গেল। কেমন কান্না পেতে লাগলো আর ঠিক তক্ষুনি তার মায়ের কথা মনে পড়ল। সাইনি কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল পরি আন্টি, আমি বাড়ি যাব।

আমি মার কাছে যাব। পরি আন্টিটা এগিয়ে এসে সাইনির দুটো হাত ধরে বলল, বোকা মেয়ে, এমন করে মন খারাপ করে। চলো তোমার বাড়ি দিয়ে আসি। ফুলপরিটা আবার প্রণামের ভঙ্গি করতেই, সাইনি লাফিয়ে তার পিঠে উঠে বসলো এবং গলা জড়িয়ে ধরে বলল, চল। এমন সময় হুড়মুড় করে একগাদা ছোটো ছোটো পরি বিচিত্র সব ফুলের রাশি এনে সাইনিকে সাজিয়ে দিতে লাগল। সাইনি লজ্জা পেলেও, ফুলগুলির অপূর্ব গন্ধে এবং বর্ণে সে লোভ সংবরণ করতে পারল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাইনি সেজে উঠল এক অপূর্ব মহিমায়। সবাইকে টা টা করে এবার সাইনিদের যাত্রা শুরু হল পৃথিবীর পথে।

এরই মধ্যে জেগে উঠেছে পৃথিবী। মেঘ কেটে কেটে ফুলপরিটা নীচে নামতে শুরু করল। সাইনি হঠাৎ বলে উঠল, পরি আন্টি দেখো দেখো, কী কালো মেঘ ওপরে উঠে আসছে। আন্টি, আমার না কেমন শ্বাস-কষ্ট হচ্ছে। তুমি একটু আস্তে চলো। ফুলপরিটা এবার বলল, সাইনি এগুলো কালো মেঘ নয়। কালো ধোঁয়া। পৃথিবীর মানুষ জেগেছে। লক্ষ লক্ষ উনুন জ্বলছে। তাদের থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া এখন বিযাক্ত মেঘ হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। আমরাও এখন এই বিষাক্ত হাওয়ায় কাতর। সাইনিরা এখন আরও নীচে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সব কিছু। সাইনি দেখতে পাচ্ছে, টুকটাক করে বিভিন্ন বাড়ি থেকে রাস্তায় ড্রেনে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। গাড়িগুলো বিকট শব্দে কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তীব্র গতিতে চলছে। কোথাও রাস্তার অনেকাংশ জুড়ে ইট বালি ফেলে রাখা হয়েছে। পথচলতি মানুষের অসুবিধার কথা কেউ ভাবে না। অনেকক্ষণ খুব নীচ দিয়ে ঘুরে ঘুরে সাইনিরা সব দেখল। পরি আন্টি কিছুই বলছে না। সাইনি খুব লজ্জা পেল এবং বলল পরি আন্টি আমরা খুব নোংরা, না? ফুলপরিটা বলল, কে বললো তোমরা নোংরা? তোমাদের ঘরদুয়ার তো ছবির মতো সাজানো। ঝকঝকে তকতকে। আসলে তা নয় সাইনি। আমরা শুধু আমাদের বাড়িটাকে নিয়েই ভাবি। ব্যস্ত থাকি আমাদেরকে নিয়ে, পড়শির কথা ভাবি না। রাস্তাঘাট নিয়ে ভাবি না। ভাবিনা আমাদের স্বাস্থ্যের কথা, ভাবি না আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কথা। সবাইকে নিয়ে সুন্দর করে যে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে আমরা সেটা প্রায় ভুলেই গেছি। আমরা যে কেমন অন্ধকারের পথে চলেছি আমরা জানি না। সাইনির মনটা ভারী এবং উদাস হয়ে যায়। সে পরি আন্টির কোনো কথাই অস্বীকার করতে পারলো না। সে চুপ করে রইলো আর ফুলভর্তি মেঘের রাজ্যের সাথে নিজের দেশের তুলনা করতে লাগলো মনে মনে......এমন সময় হঠাৎ একটা বিশাল ঝাঁকুনিতে সাইনি হুড়মুড় করে উঠে বসে। মা তাকে ধাক্কা দিতে দিতে বলল, কি রে এখনো ঘুমোচ্ছিস? স্কুলের সময় হয়ে গেছে, স্কুলে যাবি না? সাইনি এক গভীর ঘোর থেকে যেন জেগে উঠল, চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে, বিছানার পাশে পড়ে আছে বইমেলা থেকে কেনা "রূপকথার গল্প" বইটা।

ঘোতন ও হাঁসের ডিম

সুধীর সরকার

সাতনালা গ্রামের সাত বছরের ছেলে ঘোতনের সাত কাহন গল্প আমরা শুনেছি। সাতনালাবাসীদের সাত রাজার ধনের প্রতি লোভ নেই। বেশি চাহিদা নেই বলে গরিব হলেও ঘোতনদের সুখের সংসার। ওদের সম্পত্তি সামান্যই। ঘোতনের মায়ের সাতটা হাঁস আর সতেরোটা মুরগি আছে। পালা করে প্রায় সবাই ডিম পাড়ে। ঘোতনের ঠাম্মা অবশ্য ডিম খান না, ডিমকে ডিমও বলেন না, তিনি বলেন 'বইদা'। ডিম আর বইদাই বস্তুটি ঘোতনের খুব প্রিয়। একমাত্র অংক পরীক্ষার দিনটা বাদ দিয়ে ও প্রায় রোজই একটা করে ডিম বা বইদা খায়। ওমলেট সেদ্ধ—ঝোল—বড়া—ভাজা খেয়েও সাতদিনে প্রচুর ডিম জমে যায় ওদের বাড়িতে। সাতডুবিয়ার সাত্তার মিয়া ডিম ব্যাপারী এসে প্রতি সাত দিন অন্তর পাইকিরি দরে ডিম কিনে নিয়ে যায়।

হাঁস-মুরগিরা টেরই পায় না, তাদের কষ্টের ডিমগুলো কিছু ঘোতনদের পেটে যায়, বাকিগুলো সাত্তার মিয়ার ঝুড়িতে করে কাঞ্চনপুর পানিসাগর ধর্মনগরে চালান যায়। হাঁস মুরগিরা অবশ্য এত খবরের ধারও ধারে না। তারা প্রতিদিন ডিম পেড়েই খালাস। হাঁসেরা আবার ডিম 'তা' দেয়ারও প্রয়োজন বোধ করে না। ভবিষ্যৎ বংশধর বা বাচ্চা-কাচ্চার প্রতি তাদের কোনো টান নেই। মুরগিরা আবার তেমন নয়, তাদের মনে কিছু স্নেহ-মায়া-মমতা থাকে। মনে আশা নিয়েই হয়তো একটানা মাসখানেক ডিম পাড়ে। তারপর একদিন লক্ষ করে দেখে খাঁচায় একটাও ডিম নেই। অগত্যা খালি খাঁচাতে বসেই অদৃশ্য ডিমে তা দেয়। আহার নিদ্রা ভুলে, খাঁচায় ঠায় বসে বসে কয়েকদিন পণ্ডশ্রম করার পর যখন দেখে বিনা ডিমে বাচ্চা ফুটে বের হবার আশা কম তখন আবার যথারীতি চরতে বেরিয়ে যায়। হাঁস-মুরগিরা আনেক খবরই রাখে না, অনেক কিছুই বোঝে না। ঘোতন জানে, ওরা বোকা বলেই হাঁস মুরগি, আর হাঁস-মুরগি বলেই হয়তো বোকাও। ওরা জানেই না, ডিম সস্তা হলেও আট টাকা দশ টাকা হালি এবং প্রতিদিনই ওরা দু থেকে আড়াই টাকা উপার্জন করে। বিনিময়ে দিনে পঞ্চাশ পয়সার খুদ কুঁড়োও তাদেরকে ঘোতনের মা খাওয়ান না। নেহাত হাঁস-মুরগি বলেই হয়তো বিনা লাভে ওরা দিনের পর দিন খেয়ে না খেয়ে বইদা বা ডিম্ব দান করে।

ঘোতনের ধারণা হাঁস-মুরগিদের চেয়ে তার বুদ্ধি অনেক বেশি। সে ভালো করেই জানে, হাঁসেদের ভোররাতে আর ঘুম হয় না। কারণ ভোররাতেই ওরা ডিম পাড়ে। মুরগিরা আবার দুপুর বেলাই ডিম পাড়ার কাজটা সেরে ফেলে, ভোররাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। রাতেই হোক আর দুপুরেই হোক, মোটের উপর ডিম পাড়ার কথা তাদের মনে করিয়ে দিতে হয় না। একটানা মাসখানেক ডিম পেড়ে অনেকে আবার বেশ কিছুদিন বিশ্রাম নেয়। অনেকে মাসের পর মাস ডিম পাড়ে। কিছু চঞ্চলমতি অথবা অলস প্রকৃতির হাঁস-মুরগি, যারা ডিম পাড়ায় ফাঁকি দেয়, খেয়াল খুশি মতো ডিম পাড়ে, মা তেমন দুষ্টুদেরকে ভালো করে খাবার দেন না। বোকা পাখি হলেও এই রহস্যটা একদিন ওরা বুঝতে পারে। তারপর ফাঁকিবাজগুলো ডিম পাড়ার প্রতিযোগিতা শুরু করে। ডিম পাড়ার জন্যই তাদের খাবার মেলে, আর খাবার মেলে বলেই ওরা ডিম পাড়ে। খাওয়া আর ডিম পাড়া, ডিম পাড়া আর খাওয়া—ঘোতন দেখে, বারো মাস তারা এই করে শুধু।

সপ্তাহে একদিন সাতডুবিয়ার সাত্তার মিয়া ডিম ব্যাপারি আসে ঘোতনদের বাড়ি। সাতদিনের জমানো প্রচুর ডিম পাইকিরি দরে কিনে নিয়ে যায়। দামটা বড়ো কম দেয় ব্যাপারি। ঘোতনের মা প্রায়ই অনুযোগ করেন কিন্তু ব্যাপারী কানে তোলে না কোনো কথা। সাত-পাঁচ কথা শোনায়, ডিমের বাজারের এমন শোচনীয় অবস্থা সাতজম্মে নাকি দেখেনি সাত্তার মিয়া। মিয়ার পো'র বারো মাস এক কথা—

'বইদার গাওক্ নাই রে গ বাজারঅ। দামঅ কম, জলের দর! কিগুএ খায় বইদা? কত খাইবাইন্ বাবুরা বইদা? জোর করিয়া নু বাবুরারে গছাইতায় অয় অত্তা। ঘরঅ রাখা যায় না, পচিয়ানু গোবর অই যায় হক্কলতা।' ঘোতন জানে, এসব সাত্তার মিয়ার মিথ্যে কথা। একা মাকে না জানিয়ে, কতো দিন সাতনালা বাজারে গেছে ঘোতন।

কৃষকদের কাছে ডিমের দামও জিজ্ঞেস করে দেখেছে। দশ টাকা হালির নীচে ডিমের দাম হয় না। অথচ ব্যাপারী পাঁচ টাকা দরও দিতে চায় না। ঘোতনের ইচ্ছে ছিল নিজেই ডিম নিয়ে বাজারে যায়। কিন্তু মায়ের এতে ঘোরতর আপত্তি। লেখাপড়ায় ক্ষতি করে ডিম বিক্রি করতে দেবেন না মা ছেলেকে।

সেদিন সাত সকালে ঘোতন পড়তে বসে একটা কিম্ভূত-বেখাপ্পা-বিচ্ছিরি কবিতা কিছুতেই মুখস্ত করতে পারছিল না। অগত্যা তার প্রিয় সুকুমার রায়ের ডিম বিষয়ক ছড়াটাই পড়ছিল—'হাট্টিমাটিম টিম্/তারা মাঠে পাড়ে ডিম।/তাদের খাড়া দুটো শিং।/তারা হাট্টিমাটিম টিম্' ঘোতনের ইচ্ছে একজোড়া 'হাট্টিমাটিম্ টিম' এনে বাড়িতে পোষে। মাঠেঘাটে কোথায় পাওয়া যেতে পারে হাট্টিমাটিম্ টিম্ তাই ভাবছিল সে। এমন সময় মা ডাকলেন—

'অ রে বা ঘোতন। ডিম লইয়া বাজারএ যাইতায় পারবায়নি?

'বাজারঅ যাইতে আমার ভালাও লাগের.....'

'ব্যাপারী আইয়র্ না কত্তদিন, ডিম জমি গেছে.....'

'ঔ বেট্টা ব্যাপারী দাম কম দের্ গো.....'

'বেচিয়া আইতায় পারবায়নি তুমি?'

'পারতামনায় আবার! তে বেট্টা অইছি কিতাল্লাগি?'

একটা ঝুড়িতে খড়-বিচালীর বিছানায় যত্ন করে ডিমগুলো সাজিয়ে দেন মা। ঘোতন ঝুড়িটা মাথায় করে সাবধানে বাজারে পৌঁছে যায়। বাজারে মুখটায় ঘোতনকে ডিম নিয়ে বসে থাকতে দেখে একটি তালঢ্যাঙা বাবু এগিয়ে আসেন। এ বাবুটিকে ঘোতন আগেও দেখেছে—দেখলেই তার হাসি পায়। ইনি একজন সরকারি বাবু, তাদের সাতনালা গ্রামে থেকে ব্লক অফিসে চাকরি করেন। এখন তালঢ্যাঙা লম্বা আর পাকা বাঁশের মতো রোগা বাবু জীবনে দেখেনি ঘোতন। বাজারের ভীড়ের মধ্যে এই অসম্ভব লম্বা বাবুটির মাথা দূর থেকেও দেখা যায়।

ঘোতনকে ছেলেমানুষ পেয়ে বাবুটি হয়তো ভেবেছিলেন সস্তায় ডিমগুলো কিনে নিতে পারবেন। ঘোতন তার সাত বছরের জীবনে দেখেছে তাদের সাতনালা গ্রামের সরকারি বাবুরা বাজারে এসে কলাটা-মুলোটা নামমাত্র মূল্যে বা বিনি পয়সায় মিনিমাগুনা হাতিয়ে নিতে চেষ্টার কসুর করেন না। তহশিলদার চৌকিদার, কম্পাউন্ডার-হাবিলদার, মাস্টার, ফরেস্টার সবাই এক তালে থাকেন বাজারে এসে। শাক-সব্জি, ফল-মূলটা যেন এমনিতেই গাছে ফলে! নিকুঞ্জ নাথের একটা বিশাল মানকচু নামমাত্র দামে কিনতে না পেরে তালঢ্যাঙা বাবুটি এখন ঘোতনের ঝুড়ির ডিমগুলোর দিকে নজর দেন। লম্বা বাঁশের মতো সিড়িঙ্গে দেহটি নিয়ে ঘোতনের সামনে এসে দাঁড়ান। ঘোতন ঘাড় উঁচু করে দেখে, ওই আকাশে যেন বাবুটির মাথা আর কুত্কুতে দুটো চোখ। তাচ্ছিল্য ভরে বাবুটি ঘোতনের ডিমের ঝুড়ির দিকে তাকিয়ে বলেন—

'কত করি বা তোমার ডিম?'

'ডিম আমার অইত কিতাল্লাগি?'

'তোমার নায়নি? তো কার?'

'ডিম আমার হাঁস আর মুরগির.....'

বাক্কা বুদ্ধি আছে রে বা তোমার! তে কত করি তোমার মুরগির ডিম?'

'দশ ট্যাহা অলী'।

'ই কিতা মাতের্? দশ ট্যাহা করি ডিম?'

'অয়, অয়!'

'কীজাত বইদা রে বা। অক হুরু, কুট্টি কুট্টি?'

'ইতা হুরু হুরু বইদা? কীতা মাতইন আপনে?'

'হুরু যাইবি?'

'অত উপরর থাকি দেখলে ত হুরু হুরুই লাগবে।'

'তে কুনবায় থাকি দেখতাম রে বা?'

'মাটিত্ বইয়া দেখইন্ যে!'

'কেনে?'

'বেশি উপরর থাকি দেকলে বড় জিনিসঅ হুরু মনে অয়, নায়নি?'

পথের রাজা

নকুল রায়

একদিন, একটি পথের ছেলেকে সবাই মিলে মারলো। শিশুটির সব ভিক্ষের পয়সা ওরা কেড়ে নিল। তার ছেঁড়া প্যান্টটা আরও ছিঁড়ে দিল। গা বেয়ে রক্ত পড়ছে। নাক-মুখ ছিঁড়ে গেছে। দুধের দাঁত ভেঙে গেছে।

কয়েকজন রাস্তার লোক তাকে বাঁচায়। কিন্তু ততোক্ষণে ছেলেগুলো ছুটে পালিয়ে গেছে।

লোকগুলো তাকে ওষুধের দোকানে নিয়ে যায় এবং কিছু মলম লাগিয়ে ছেড়ে দেয়।

এখনো সূর্যটা অস্ত যায়নি। পশ্চিম দিক লাল। শহরে লোকের ভিড় বাড়ছে। একটা হলের সামনে বিশাল এক ছবি। ছবিটার চারদিকে বিদ্যুতের আলো। এটা 'রবীন্দ্র শতাবার্ষিকী ভবনের' সিঁড়িতে দুটো বাঁশের খুঁটির ওপর বসানো। সে জিভটা দিয়ে ঠোঁটের ব্যথার ওপর ঘষে। আর বানান কোরে পড়ে। **যাদু প্রদর্শনী পি. সি. সরকার।**

সে চিনতে পারল, ইনিই যাদুকর পি. সি. সরকার। মাথায় বিশাল পালকের টুপি। মুখে হাসি। রাজপুত্র। -সে মার মুখে অনেক রাজারানি রাজপুত্র ও যুদ্ধের গল্প শুনেছে। কিন্তু একবার পি. সি. সরকারকে সে দেখেছিল। গাড়ির ভেতর যখন উঠছিলেন, ঠিক তখন। মা বলল—'এই পি. সি. সরকার। যাদু দেখায়।' সে তখন চিন্তা করেছিল, সে-ও এমনি একজন যাদুকর হবে। মন্ত্রটা শুধু শেখা। তা কষ্ট করে যাদুর মন্ত্র শিখে নেয়া যাবে। আর ১০ বছর পরে সে বড়োদের সমান লম্বা হয়ে যাবে। মা যা শেখায়, সে তা-ই বিশ্বাস করে। আসলে, বাবা নেই তো। বাবাকে কোনোদিন দেখেও নি মা-কে ছাড়া সে কাউকে চেনে না। ক্লাস থ্রি'র বইগুলো সে মা'র কাছেই পড়ে শিখেছে। যদিও স্কুলে পড়ে না, তবে অনায়াসে সে পাশ করতে পারবে।

ধীরে ধীরে সন্ধে নামে। রাস্তার পাশে মাঠে শিশুরা বল খেলছে। কী সুন্দর লাল পোশাক নীল পোশাকের

ছেলেগুলো। মাঠের ঘাসের ওপর বলে শুধু লাথি মারছে। বল এগিয়ে যাচ্ছে। আবার ছুটে গিয়ে বলটা ধরে। আরেক জন হাত বাড়িয়ে বলটা কেড়ে নেয়। ঝগড়া হয়। সে দাঁড়িয়ে দেখে। ওদের ঝগড়া আবার মিটেও যায়। আবার খেলে। সন্ধে নামে।

সে, পথের ধারে কলের জলে রক্ত ধুয়ে নেয়। হাত পা মুখ ধুয়ে নেয়। এবার সে চলে যাচ্ছে হঠাৎ দেখে বলটা গড়িয়ে নর্দমায় চলে গেছে। সবগুলো ছেলে এসে জটলা করে। কেউ বলটা ছোঁয় না। যার বল, সেও না।

সে, পথের ছেলে। নর্দমার জিনিস সে সবসময়ই কুড়িয়ে পায়। তার ঘেন্না নেই। বাঁহাতে বলটা তুলে নিল। কলের জলে ধুয়ে যার বল ওর হাতে তুলে দেয়। সবাই খুশি।

সে একটু হাসল। সে এগিয়ে যায়। পেছনে পড়ে থাকে মাঠের ছেলেরা। হৈ হৈ রব। সে আরও এগিয়ে যায়। তারপর গ্রামের পথ ধরে। গ্রামের পাশেই নদী। নদীর চরে এরা থাকে। অনেকগুলো মুচি-ভিখিরি রিক্‌শাওলারা এখানে বাস করে।

তার মা ঝি-এর কাজ করে। সারাদিন পরের বাড়ি কাজ করে অনেক রাত্রে বাড়ি ফেরে। সে-ও সঙ্গে যায় মাঝে মাঝে।

এখন তার শরীরটা ব্যথা করছে। মুখটা ফুলে গেছে। হাত পায়ের ব্যথা নিয়ে সে মাটিতে শুয়ে পড়ে।

অন্ধকার ঘর। ঘরে মশার উৎপাত। কিন্তু তার ওইসব মনে লাগছে না। প্রচণ্ড ক্ষিধেও পেয়েছে। সারাদিন পথে পথে ঘোরা। তার পর শক্ত মার খাওয়া সবমিলিয়ে সে খুব ক্লান্ত। এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে।

তার হঠাৎ আনন্দ হল। অবাক। সে বাঘ হয়ে গেছে। সে দেখল, যে-ছেলেটিকে বলটি নর্দমা থেকে তুলে দিয়েছিল,—ওর বাবা একজন নামকরা যাদুকর। একজন রাজা তার নদীর পারে বাড়িতে এলেন। এসেই বললেন

—কইরে, কোথায় গেলি!

—'কী বাবু?' সে বললে।

—আমার খুব দুঃখ হয়েছিল, তোকে মেরেছে। তবে, এই দেখ, আমার হাতে একটা যাদুদণ্ড আছে। এটা দিয়ে তোকে আমি বাঘ সিংহ গন্ডার হাতি—যা তুই হতে চাস্, বল্ আমি তোকে তা-ই বানিয়ে দেব। আমাকে চিনিস্ তো? আমি হলাম গিয়ে পি. সি. সরকার। যা বলব, তা-ই হবে।

'আমি পি. সি. সরকার হতে চাই' সে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে।

—না, নাঃ। দুইজন পি. সি. সরকার হলে যাদু নিয়ে ঝগড়া বাঁধে। আর তা ছাড়া, তোর মনের ভেতর এখনো তো রাগ আছে। তাই পি. সি. সরকার হতে পারবি না। এর চেয়ে তুই বরং বাঘ হয়ে যা। সেটাই ভালো হবে। খাবিদাবি, দুষ্টের ঘাড় মটকাবি; হুঁ......আবার তোর কাছে কেউ ভয়ে আসতে চাইবে না।

—'আচ্ছা। তা-ই ভালো।' সে বলল। আর সঙ্গে সঙ্গে সে বাঘ হয়ে গেল। গায়ে ডোরাকাটা দাগ। বিরাট রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। 'হালুম হালুম' করে সে গর্জন ছাড়ে। সারা নদীর চর থেকে সব মানুষ ভয়ে ছুটে পালাতে লাগল। তার খুব আনন্দ হচ্ছে। কারণ, বাঘ হলেও সে তো আসলে মানুষ। আর বাঘ হলেও সে তো এখনো ভালো থাকতে চায়। দুষ্টের ঘাড় ভেঙে খাবে। দুর্বলকে বাঁচাবে। দুর্বল যারা তারা যে শুধুশুধু মার খায়। এবার এর উলটো হবে।

সে আবার সেই শহরে এল। ভয়ে ভয়ে অনেকে হাত জোড় করে তাকে প্রণাম করে। তার এত আনন্দ। বা, তবে এদের কাউকেই খেতে ইচ্ছে করছে না। সে ঠিক করেছে, মানুষ খাবে না। নিরামিষ খাবে শুধু। ফল দুধও খেতে পারে। তবে বেবিফুড খাবে না। শিশুদের খাদ্য শিশুরাই খাবে।

একজন মেমসাহেব তার গা ঘেঁষে যাচ্ছিল, ভাবখানা এমন যেন তাঁর চোখেই পড়েনি। হঠাৎ সে একটু 'হালুম' করতেই—বাপরে, সে কী দৌড়। একেবারে পড়ি-মরি। মেমসাহেব তো একলাফে একটা বড়ো মাঠ তারপর ঘরবাড়ির ওপর দিয়ে ডানা মেলে উড়ে গেলো। অবাক কাণ্ড! মেয়েদের আবার ডানা আছে নাকি।

এবার সে এল। হুঁ, যেখানে ওরা তাকে মেরেছে। দূর থেকেই সে দেখতে পেল। ওরা আজও দলবেঁধে ঘোরাঘুরি করছে। মতলব ভালো না। সূর্যটা গড়িয়ে যাচ্ছে তার পায়ে পায়ে, আগে আগে। বলের মতো, আশ্চর্য, সে তো আকাশে থাকার কথা। জানি জানি, আমি মানুষ হয়ে বাঘ হতে পারি আর সূর্য বল হতে পারবে না কেন শুনি? বাঃ বাঃ, দারুণ ভালো লাগছে। এই শহরটা তো এখন আমার। যেখানে যা খুশি করতে পারি। বাঃ বাঃ, সে আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে। ধ্যাৎ, বাঘের হাতে তালি ভীষণ বাজে। তার গর্জন-ই ভালো। হা লু ম্ ম্ ম্.....

তারপরই ঘটনা। ছেলেগুলোকে এক লাফে গিয়ে থাবা মেরে ফেলে দিল। ওরা এতো ভয়ে চিৎকার করছে আকাশ থেকে হাজার হাজার পাখি দল বেঁধে গান গেয়ে উঠল। রাস্তার সমস্ত মানুষ গাড়ি রিক্সা সাইকেল দাঁড়িয়ে পড়ে। মজা! কী মজা! আর মারবি কিনা বল বল। কয়েকশ' পুলিশ হুঁইসেল মারছে। ভিড়গুলোকে দুহাতে সরিয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ তাকে যেতে দিচ্ছে সবাই। সম্মান। হাজার হাজার লোক ছুটে আসছে তার দিকে। অনেক রঙ-বেরঙের ছেলেমেয়ের হাত ধরে মা-বাবারা। তার খুব আনন্দ হচ্ছে। সে আনন্দের চোটে প্রথম ছেলেটিকে থাবা মেরে বসল। তারপর আনন্দের চোটে কালকের সবকটি ছেলেকে ধরে ধরে থাবা মারল। ওরা পায়ে ধরে কাঁপতে কাঁপতে ক্ষমা চাইল,—আর কক্ক্ষনো মারব না বাবা গো, বাঘ বাবা আর মারব না কাউকে, পথে একলা পেয়েও না'। তখন সমস্ত জনতা বললে,—হ্যাঁ, এবার ছেড়ে দাও বাঘ মহাশয়। ওদের ক্ষমা করো। তা ছাড়া, তুমি না রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার! জাতীয় সম্মান তো আছে।' 'ঠিক আছে। ওদের ক্ষমা করলাম' সে বললে। বাঘের গলায় একটি সোনার মেডেল দর্শকরা পরিয়ে দিল। সে মেডেলটি কামড়ে ছিঁড়বে.....এমন সময় কপালে যেনো কার হাত। চোখ খুলে দেখে,—সে মাটিতে শুয়ে আছে। তার মা বোসে বোসে কাঁদছে। একটি কেরোসিনের কুপি দপ্‌দপ করে জ্বলছে ঘরের ভেতর।

স্বপ্নে

দেবযানী বিশ্বাস
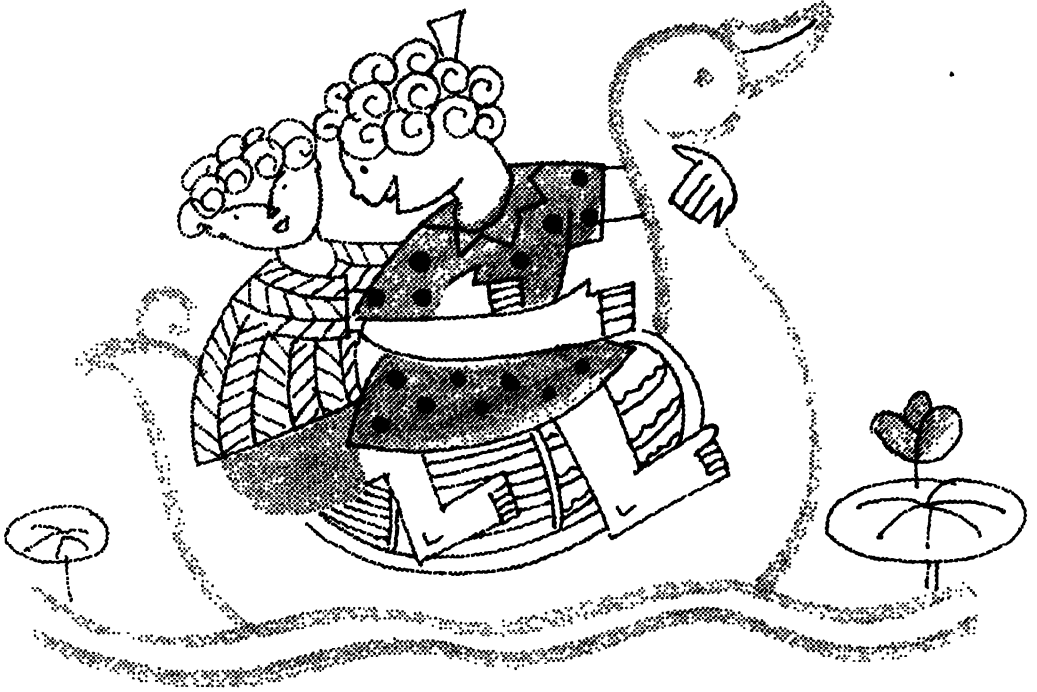
ঘুম থেকে উঠেই দু-চোখ রগড়াতে রগড়াতে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় মহুয়া। বেশ জল জমেছে উঠোনে। পুকুরটা উপচে পড়া জল দেখে আনন্দে চোখ দুটো চিক্‌চিক্ করে ওঠে তার। এক রাতের বৃষ্টিতেই মহুয়ার পরিচিত জগৎটা কেমন যেন পাল্টে গেল এখন। মহুয়ার রঙিন ফ্রকটা ঠান্ডা হাওয়ায় ফুরফুর উড়ছে। দাঁত দিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে মলিদির কাছ থেকে শেখা নতুন গানটার কথা মনে পড়ে তার। সুর তোলে—'নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি—' বাইরের ঘরের পর্দা ঠেলে ছোটো ভাই পুটুর মাথাটা বেরিয়ে আসে 'দিদি তিনি, তিনি'।

মহুয়া দৌড়ে গিয়ে কোলে তুলে নেয় পুটুকে 'ভাই তোর আজ একদমই জ্বর নেই।' দিদির গলা জড়িয়ে পুটু হাসে। বড়ো বড়ো চোখ দুটো তবুও বিষণ্ণ দেখায়। পুটু প্রায়ই অসুস্থ থাকে। বয়েসের তুলনায় ছোটো, এমনকি ভালো করে সব কথা বলতেও পারে না সে। মহুয়া পুটুকে দেখায় কালকের বৃষ্টির দাপটে ডালিম গাছটা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। উঠোনে কাদা। একটা কেঁচো তারই মধ্যে কিলবিল করে এগুচ্ছে। মহুয়ার গা গুলিয়ে ওঠে থ্যু। মহুয়া থুথু ফেলে। পুটু কী যেন কথা বলতে চায়। ঠিক ঠিক পারে না। ঠোঁটটা একটু কেঁপে ওঠে শুধু।

'এদিকে দ্যাখ্ পুটু, কি মজারই না কাণ্ড।' মহুয়ার কথায় পুটু পুকুরটার দিকে তাকায়। সাদা ধবধবে একটা হাঁস, তার হলুদ ঠোঁট ডুবিয়ে ডুবিয়ে প্যাক্ প্যাক্ ডাকছে। পুটুর চোখে মুখে হাসি ফুটে। চোখ খুলে তাকায় আবার, চোখ বুঁজে। তখনই ছোটোকাকার গলা শোনা যায়। এই মহুয়া খেতে আয়। আর পুটু, তোমাকে না ঠান্ডায় বেরুতে বারণ করা হয়েছিল। অপরাধীর মতো মাথা নীচু করে দু'জনেই ঘরে ঢুকে। এক সময় খাওয়া হয়ে গেলে বাবা সাবধান করে যান ওরা যেন বাইরে বের না হয়। চারিদিকে জল। পুটু মহুয়ার মন খারাপ

হয়। কত ইচ্ছে ছিল উঠোনের জলে কাগজের নৌকা ভাসাবে ওরা। মনের ইচ্ছা বাক্সবন্দীই রইল, প্রকাশ করার মতো সাহস হল না একদম। বাবার কোটটাকে পর্যন্ত ওদের ভয় ; কালো কোটটা একবার দেখলেই আমসত্ত্ব চুরির কথা ভুলেও মন চলে যায় পড়ার ঘরে।

বাবা অফিসে চলে গেলে মহুয়া পড়ার বই নিয়ে বিছানায় শোয় একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। পুটু গুটি গুটি জানলার পাশে বসে। দুটো কবুতর উঠোনের জলে ডানা ঝাপটায়। একটা কাক উড়ে উড়ে ডাকে কা-কা। বিছানার একপাশে দিদিটা কী সুন্দর ঘুমুচ্ছে এখন। পুটুর জিভ তেতো লাগে। উচ্চারণ ঠিক হয় না। দিদিটা কেবল বলে এতবড়ো ছেলে এখনও কথাই বলতে পারিস না তুই। ভাবতে পুটুর মনটা টন টন করে ওঠে। রান্নাঘর থেকে মার রান্নার গন্ধ ভেসে আসে। পুটুর ভীষণ ঘুম পায়। চোখের পাতা বুঁজে আসে।

এতো রং কোত্থেকে এলো? লাল নীল হলুদ সবুজ হরেক রকমের বুদবুদে। পুটুর শরীরটা বেশ ভালো লাগে। জিভের তেতো ভাবটাও নেই এখন। নিজেকে বেশ হাল্কা এবং বড়ো মনে হয়। হঠাৎ আয়নায় চোখ পড়তেই ওমা, ওর পোকায় খাওয়া ভাঙা দাঁতগুলো এখন কোথায়?' এ যে ঝকঝকে সুন্দর দাঁতের সারি। কি মজা। কিন্তু দিদিটা কোথায় গেল এখন।

এমন সময় বাইরে থেকে দিদির গলা ভেসে এল। পুটু শিগগির চলে আয়, চলে আয় এখানে। পুটু ছোটো ছোটো পা ফেলে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই কোত্থেকে দমকা হাওয়ার উঁড়িয়ে নিয়ে গেল তাকে, একেবারে পুকুরের ধারে বড়ো পেয়ারা গাছটার ডালে।

এদিকে পুটুর চোখ তো ছানাবড়া পুকুরের মাঝখানে সেই সাদা হাঁসটা, পুটুর দিদি কিনা ওই হাঁসটার পিঠেই চেপে বসে মিটমিট করে হাসছে। দিদিটা চেঁচিয়ে ওঠে একসময়। এই হাঁদারাম অমন হাঁ করে দেখছিসটা কী, তাড়াতাড়ি নেমে আয়।' দেখতে দেখতেই আর একটা দমকা হাওয়ায় পুটুকে উড়িয়ে নিয়ে একদম বসিয়ে দিল দিদির পাশটায়। ওরি বাবা! কী নরম শরীর হাঁসটার। পুটু শক্ত করে দিদির কোমর জড়িয়ে ধরতেই হাঁসটা খট্ খট্ আওয়াজ করে লঞ্চের মতো চলতে শুরু করে। আনন্দে পুটুর চোখ গোল গোল হয়। হাঁসটা জলের নীচে কেমন ডুব সাঁতার কেটে সামনে এগিয়ে চলছে তর তর। চারিদিকে কত রং বেরং-এর শামুক, ঝিনুক। দিদি আঁচল ভর্তি করে নেয়। হঠাৎ পুটু আনন্দে চিৎকার করে ওঠে, আরে আরে ওটা কী? এই তো দেখছি দিদির ইংরেজি বই-এর সেই অক্টোপাশটা এক্ষুনি বোধহয় বই থেকে গুটি গুটি বেরিয়ে এল। মহুয়া আর পুটুকে দেখেই আটটা শুঁড় দিয়ে নমস্কার করে বলে, 'কেমন আছ তোমরা'? কত আর বই-এ বন্দী হয়ে থাকতে ভালো লাগে বল। একটু হাওয়া খেতে বেরুলাম। মহুয়া তার কথার সায় দেয় 'বেশ করেছ', এই দেখনা আমাদেরও বাড়িতে একদমই ভালো লাগে না। তাই তো আমারও বেরুলাম আজ।

অক্টোপাশকে পেছনে ফেলে ওরা এগিয়ে চলো আরও সামনে। পথে যেতে যেতে পরিচিত অপরিচিত অনেকের সাথেই দেখা। বেশির ভাগই যেন দিদির বই থেকে বেরিয়েছে হাওয়া খেতে। বাবার বই থেকে একটা কালো মাছ, যার গা থেকে আলো ছিটকে বেরুচ্ছে, তার সঙ্গেও দেখা হল। বাবার মতোই গম্ভীর সে। ওরা ইচ্ছে করেই কথা বলল না ওর সাথে। কে জানে কখন আবার বাবাকে বলে দেয় সব কথা।

এদিকে হাঁসটা এক সময় থেমে গেলেই শ্যামদাদার অ্যাকোরিয়ামের শ্যাওলার মতো কতগুলো শ্যাওলা লিকলিকে শাখাপ্রশাখা নিয়ে জলের ঢেউ-এ দোল খায়। তখনই হাঁসটা কেমন যেনো ফ্যাস্ ফ্যাস্ গলায় বলে ওঠে 'চল, ওই শ্যাওলা বনে লুকোচুরি খেলি আমরা। মহুয়া আনন্দে হাততালি দিতে দিতে হাঁসের পিঠ থেকে নেমে পড়ে 'চল, খুব মজা হবে খন'।

পুটু কিন্তু ভয়ে পেয়ে ফিসফিস বলে, 'চল দিদি ঘরে ফিরে যাই।'

ধুর বোকা। ভয় কীসের, তুই না হয় এখানে দাঁড়া বলেই মহুয়া হাঁসের গলা জড়িয়ে ধরে শ্যাওলার ভেতর ঢুকে পড়ে। মহুয়ার লাল ফ্রকটা শ্যাওলা বনের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় এখন। হাঁসটা ডাকে প্যাঁক প্যাঁক। পুটু দূর থেকে দেখে। মহুয়া কখনো বা এক গাদা শ্যাওলা তুলে নিয়ে বিনুনীতে জড়ায়, কখনও বা হাঁসের গলা জড়িয়ে দোল খায়। হাঁসটার হাসি হাসি মুখটার দিকে তাকিয়ে ভীষণ হাসি পাচ্ছিল পুটুর। হঠাৎ আলোটা কমে যাচ্ছে কেন এবং কমে কমে অন্ধকার। দিদিকে দেখা যাচ্ছে না বলেই চিৎকার করে কেঁদে ওঠে পুটু। চারিদিকে রাশি রাশি জল যেন ফুঁসতে থাকে এখন। পুটু ভয় পেয়ে হাউ মাউ কেঁদে ওঠে।

'এই এই পুটু কাঁদছিস কেন? দিদির গলা শোনা যায়। পুটু ধড়মড় করে জেগে ওঠে। ওমা আমি তো বিছানাতেই শুয়ে আছি।

পুটুর ইচ্ছে করে দিদিকে স্বপ্নের সব কথা বলতে। দিদির গলা জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হলেও পুটু পারে না। কোনো কথাই সে বলতে পারে না, তার যে জিভ জড়িয়ে যায়।
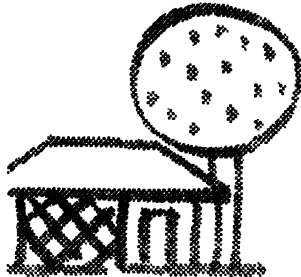
কালু ও ভুলু

হরিহর দেবনাথ
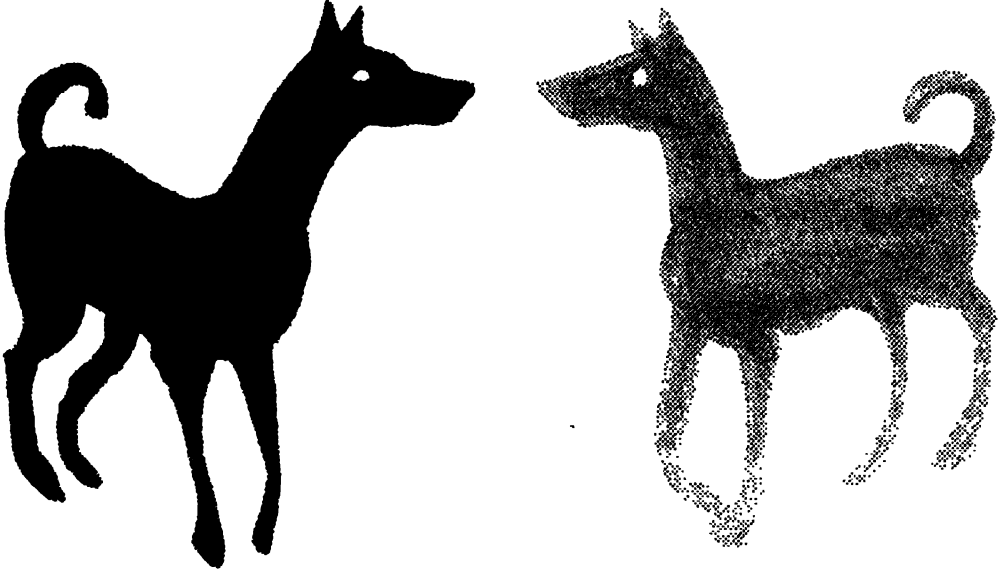
কালু-ভুলু। দুই কুকুর বন্ধু পাশাপাখি বাড়িতে থাকতো। দুটোতে খুব ভালো মিল ছিল। সুযোগ পেলে ওরা ছুটোছুটি করত। একে অপরকে জড়িয়ে খেলাধুলা করত। মনের ভাব বিনিময় করত। রোজ একে অপরকে না দেখে যেন থাকতেই পারত না।

একদিন ওরা ঠিক করল তীর্থ দেখতে যাবে। প্রথমেই ওরা যাবে গয়া। ওদের আনন্দ আর ধরে না। কবে যাওয়ার দিনটি আসবে, কবে রওনা হবে, কবে নানা জায়গা দেখবে, কবে নতুন নতুন কত সব দেখবে—এসব ভাবতেই থাকে।

মনের টানে যাওয়ার দিনটি আর দুরে থাকতে পারল না। এসে যায় যাওয়ার দিনটি। মনের আনন্দে রওনা দিল ওরা। যেতে যেতে কত মাঠঘাট, পাহাড় পর্বত, নদনদী, কত বাড়িঘর পেরিয়ে গেল ওরা। ক্ষুধাও পেয়েছিল বেশ। দুটোতে ঠিক করে নিল—খেতেই যখন হবে তবে তারা বড়ো বাড়ি দেখেই উঠবে এবং পেট ভরে খাবে। কথা মতো ওরা দুটো বাড়িতে গিয়ে ওঠে। কালু যে বাড়িতে গিয়ে ঢুকলো সে বাড়ির মালিক বড়ো দয়াবান। কালুকে দেখামাত্র গিন্নীকে ডেকে বলেন—এসে দেখো, ভারী সুন্দর এক অতিথি এসেছে। ওকে ভালো করে খেতে দিও। কালু মালিকের কথা শুনে খুশিতে ল্যাজ নাড়ে। গৃহিণী খুব যত্ন করে অনেক খাবার দিলেন। কালু ঘপ ঘপ করে সব সাবাড় করে দিল। অপর দিকে ভুলু যে বাড়িতে গিয়ে ঢুকল সে বাড়ির মালিক বড়ো নির্দয়। ভুলুকে দেখামাত্র তার মাথা চড়ে যায়।

ভুলুকে 'নেড়ি কুকুর' 'চোর কুকুর' এসব বলে ও দূর্ দূর্ করে খুব লাঠি পেটা করে তাড়িয়ে দিলেন। ভুলু খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোনোমতে মাঠে এসে মড়ার মতো পড়ে থাকে।

কালু তার সাথীকে দেখতে না পেয়ে এদিক ওদিক খুঁজতে থাকে। খুঁজতে খুঁজতে মাঠে এসে ভুলুকে দেখতে পায়। কাছে গিয়ে দেখে ভুলু পড়ে কাতরাচ্ছে। ধীরে ধীরে জেনে নিল সব কথা। কালু মনে মনে ঠিক করল তার খাওয়ার অর্ধেকটা সাথীকে খাওয়াবে। কালু ঠিক তাই করল, পেটভরে খেয়ে এসে—অর্ধেকটা বমি করে ফেলে রাখে। এই বমি ভুলু খেয়ে নিয়ে কোনোমতে জীবন রক্ষা করে।

কিছুদিন পর ভুলু মোটামুটি হাঁটতে পারে দেখে কালু-ভুলু আবার রওনা দিল তীর্থের উদ্দেশ্যে।

দীর্ঘদিন হাঁটার পর কালু ভুলু খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। আরও কিছুদিন পর ওরা বুঝতে পারল যে তারা আর বেশিদিন বাঁচবে না। ভুলু কাতরাতে কাতরাতে কালুকে বলে 'কালু—শোন, যে আমাকে বিনা দোষে আঘাত করে তোকে ও আমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে তাকে আমি ছাড়ব না। তাকে এমন সাজা দেব যে পুত্র শোকে পাগল হয়ে যাবে।' আর কথা বলা হল না। ধুঁকতে ধুঁকতে কালু ভুলু মারা গেল।

এর ঠিক এক বৎসর পর—যে ভুলুকে মেরেছিল সে নির্দয় লোকটি এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিল। অপর দিকে ঠিক একই সময়—কালুকে যে খেতে দিয়েছিল তারও এক পুত্র সন্তানের জন্ম হল। এই দুই শিশু ধীরে ধীরে বাল্যকাল ছেড়ে কিশোরকাল—কিশোরকাল ছেড়ে যৌবনে পা রাখলো। দুই পিতা ওদের বিয়ের দিন পাকা করে ফেলেন।

শুভ দিন শুভক্ষণে দয়াবান মালিকের পুত্র পালকি চড়ে বিয়ে করতে রওনা দিল। মঙ্গল মতে তার বিয়ে সম্পন্ন হয়। শুরু হল তার সুখময় দাম্পত্য জীবন।

অপরদিকে নির্দয় মালিকের পুত্র যেইমাত্র পালকিতে পা রাখতে যায় অমনি ঢলে পড়ে মারা যায়। পুত্রশোকে পিতা পাগলের মতো হয়ে যায়। স্নান নেই, ঘুম নেই, খাওয়া নেই, কাজকর্ম নেই। শুধু কাঁদে আর কাঁদে। ছেলেকে ডেকে বেড়ায় ছেলেকে—দেখতে চায়।

একদিন রাতে হঠাৎ স্বপ্নঘোরে কে যেন তাকে ডেকে বলে—'যদি তোর পুত্রকে দেখতে চাস্-বাড়ি থেকে সোজা পুব দিকে চলে যা। ওখানেই দেখতে পাবি তোর পুত্রকে।'

ভোর হতেই সেই নির্দয় লোকটি ছুটে চলে বাড়ির সোজা পূর্ব দিকে। কিছু দূর যাওয়ার পর হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। দেখতে পেল তার পুত্রকে। তার পুত্র চেয়ারে বসে টেবিলের উপর কাগজ রেখে সোনার কলম দিয়ে কি যেন লিখছে। বাবা হাউ মাউ করে কেঁদে উঠে ওরে পুত্র বলে জড়িয়ে ধরতে হাত বাড়ালেই পুত্র রেগে বলে ওঠে। 'কে' তোর পুত্র? কাকে ডাকছিস্ পুত্র বলে? মনে পড়ে তোর সেদিন বিনা দোষে আমাকে লাঠিপেটা করে তাড়াবার কথা? যা শীঘ্র চলে যা!

আমি তোর কেউ না—কেউ না!' এ বলে মুখ ফিরিয়ে নিল।

বাবা নির্বাক! শুধু গড়িয়ে পড়ে দুই চোখের জল। অনুতাপের আগুনে পুড়ে যায় দীর্ঘশ্বাস। তারপর নিরাশ হয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

টেলিফোন বন্ধু

সন্তোষ রায়
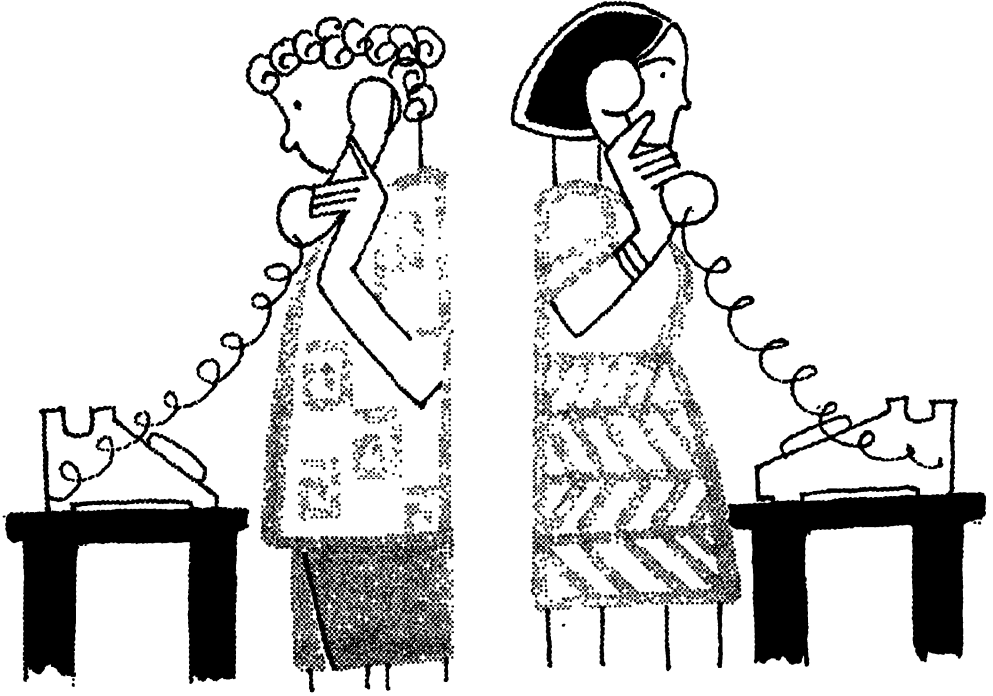
শৈবালবাবুর ঘরে ফোন আসার পর থেকেই মেয়ে রিয়ার খেয়াল চেপে বসে সুযোগ পেলেই সে ফোন করবে কাকে? কোথায়?—এটা সেও জানে না। সে শুধু জানে দুই শূন্য দিয়ে শুরু করে ডায়াল করে যাওয়া। কখনও ফায়ার ব্রিগেড, কখনও দোকান, কখনও কোনো অফিস এতেই তার আনন্দ।

একদিন, সেদিনটি ছিল রোববার। শৈবালবাবু ঘর থেকে বেরিয়েছেন কাজে। রিয়া বসে বসে 'চন্দ্রকান্তা' দেখল, তারপর সিন্দবাদ। এখন সব শেষ। মা এসে টি ভি বন্ধ ক'রে রান্নাঘরের দিকে গেলেন। রিয়ার আবার ছবি আঁকার শখ। পোস্ট অফিসের মাসি কিছু কাগজ দিয়ে যান। ওটাতে ওর ছবি না আঁকলে শান্তি নেই। কিছুক্ষণ ছবি আঁকাআঁকি 'করে হঠাৎই খেয়াল চেপে বসল—ফোন করবে। চেয়ারের ওপর চড়ে সোজা টেবিলের ওপর রিসিভার তুলে নাম্বার লাগায়, রিং হতে হতে আওয়াজ ভেসে আসে—

—হ্যালো, কাকে চাই?

রিয়া বলে—আপনি কোত্থেকে বলছেন?

—হাসপাতাল থেকে।

—আপনি কি ইনজেকশন দেন।

'ওরে বাব্বা' ছেড়ে দিচ্ছি।

ওপার থেকে একটা হাসি ভেসে আসে। রিয়া রিসিভার রেখে কিছুক্ষণ চুপচাপ তারপর আবার চেষ্টা শুরু। এবার ওপার থেকে শিশু গলায় জিজ্ঞাসা ভেসে আসে—

—হ্যালো, কে আপনি?

ফোন গিয়ে লাগল সেনবাবুর ঘরে। সেনবাবু এ শহরেরই একজন উকিল। একই ছেলে সেনবাবুর, নাম রেখেছিলেন 'শালুক'। শালুক-এর খেয়াল, যখন যেখান থেকেই ফোন আসুক আর যার কাছেই আসুক ওই ফোন ধরবে। সেদিন কাছাকাছি কেউ নেই। না বাবা না মা। রিং হতেই রিসিভার তুলে শালুক জিজ্ঞেস করে—

—হ্যালো, কে আপনি?

রিয়া পালটা প্রশ্ন করে—আপনি কে? বলছেন কোথা থেকে?

—ধর্মনগর থেকে। —ও আমিও—আপনি কি করেন?

—পড়ি।

—কোন্ ক্লাসে?—KG-1 -এ। —আমিও তো KG-1 -এ পড়ি।

তাহলে তো আজ থেকে আমরা বন্ধু।

রিয়া আরও বলে—তুমি কি ফার্স্ট হও?

—হ্যাঁ, আমি তো ফাস্ট বয়-ই।

—ইস্ আমি না অঙ্কের জন্যে এবার সেকেন্ড হয়ে গেছি। জানো, তবু ম্যাডাম আমার নাম প্রথমেই ডাকেন। মা বলেছেন। ছোট্ট পরীক্ষা তো এজন্যে। আমি তো বড়ো পরীক্ষায় ফাস্ট হব। কিন্তু এখন যে মাথাব্যথায় পড়তে পারি না। খেলতেও পারি না।

শালুক উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করে—কি হয়েছে তোমার মাথায়?

—ওমা তুমি জানো না! আমি স্কুলের বারান্দায় পড়ে গিয়েছিলাম তো!

ম্যাডামরা কত বরফ লাগিয়েছেন। আমার ঘুম পেয়ে গেছল। হাসপাতালেও দেবেন বলেছিলেন। কিন্তু আমি যাইনি। গেলে ইনজেকশন দিতে দিত।

—না, না, ব্যথা পেলে ডাক্তারমামুর কাছে যেতে হয়। এখন ব্যথা কমেছে?

—একটু একটু আছে। স্কুলে যেতে পারছি না।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে বহু পুরনো পরিচয়ের মতো আলাপ জমে যায় দুজনের। কত কথা! স্বপ্নের কথা! স্কুলের কথা, হজ বুড়োর গল্পের কথা, মধ্যে মধ্যে একজন আরেকজনকে বানান জিজ্ঞেস করা—দুই বর্ণযুক্ত, তিন বর্ণযুক্ত শব্দ আরও কত কী? রিয়ার মার রান্না প্রায় শেষ। বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। বৃষ্টির বাতাসে ইলিশ মাছ ভাজার গন্ধ।

রিয়া বলে—জানো, আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।

—কেন, মাথাব্যথা করছে?

—না, না, বুলবুলিটা আসছে না যে।

শালুক বলে—বুলবুলি কে?

—বুলবুলি পাখি, ওই যে আমাদের বারান্দার পাতাবাহার গাছটায় বাসা বেঁধেছে। ওই তো বাসাটা দেখা যাচ্ছে। রিয়া এমনভাবে বলল যেন শালুকও দেখতে পাচ্ছে।—জানো আমি চুপটি করে বসে থাকতাম আর ও বাসা বানাত। কত কষ্ট করে সুতোর মতো ঘাস আনত আর গোল করে বাসা বানাত। একদিন সকালে উঠে দেখি একটা ডিম। সারাদিন বুলবুলিটা উড়ে উড়ে ডাকাডাকি করত। সারাদিন আমরা যে হাঁটাহাঁটি করি তার জন্য বসতে পারত না বাসায়। ঠিক সন্ধ্যের সময় সব নীরব হলে ঘাড়টি গুঁজে ডিমের উপর বসে থাকত। আমি ওর বাচ্চাগুলোকে কবে দেখব আর আদর করব সেই আশায় বসে থাকতাম। একদিন দেখি ডিমগুলোও নেই, পাখিটাও আর আসে না। আমি ভাবলাম রাতে ঝড় হয়েছিল তো, তাই সব ভেঙে গেছে। বাবা বললেন, পাখিটি ঠোঁটে করে নিয়ে গেছে অন্য ঘরে। পাতাবাহারের ঘরটা এখনও পড়ে আছে। গন্ধরাজ ফুল পাড়তে গেলে বাসাটা দেখে খুব কষ্ট হয়।

সব শুনে বুলবুলি পাখির বাসা দেখতে শালুক খুব আগ্রহী হয়। ও বলে—আমি তো বুলবুলি পাখির বাসা কখনও দেখিনি। তুমি দেখাবে আমাকে? রিয়ার আনন্দ আর ধরে না—চলে এসো আমাদের বাড়িতে। কখন আসবে বলো?

—কাল আসব।

—না, আজকেই আসতে হবে। কত মজা হবে। বাসা দেখব, কথা বলব, খেলবও। শালুক বলল, আচ্ছা বাবাকে বলব আজকেই নিয়ে যেতে।

ওরা এতই বন্ধু হয়ে গেল যে ওদের যেন সবই জানা। তাই কেউ কারও নামও জিজ্ঞাসা করল না। বাড়ি কোথায় তাও না। এরই মধ্যে রিয়ার মা রান্না শেষ করে এসে বললেন—চলো রিয়া, চান করব চলো,—আসছি মা। রিয়া শালুককে আবার আসার কথা বলে বলল এখন ছাড়ছি, মা ডাকছেন, চানে যাব।

রিয়া মার সাথে চানে চলে যায়। চান করতে করতে বলে—মা আজকে ওরা আসবে। মা বলেন, কে আসবে?

—কেন, ওই যে ফোনে, বলল আমার বন্ধুটি।

রিয়ার মা ভাবে হয়তো ওর ক্লাসের কোনো বন্ধু হবে।—আচ্ছা এলে তো ভালোই লাগবে।

—বিকেলে আসবে মা।

—তাহলে তুমি খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়, তাড়াতাড়ি উঠে যাবে।

রিয়া বিকেলে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে ঘর আর গেট, গেট আর ঘর করে। আসে না, কেউ। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়। রিয়ার মন খারাপ হয়ে যায়। রিয়ার বাবা ঘুম থেকে উঠে বললেন—মামণির মন খারাপ কেন? রিয়া রাগতস্বরে বলে—ওরা আসেনি। আদরের সুরে বাবা বলেন—ওরা কারা?

—ওই যে বন্ধুটি।

—কী নাম বন্ধুর? রিয়া বলে—নাম? নাম তো জিজ্ঞেস করিনি।

—ও আচ্ছা, কোথায় বাড়ি?—ধর্মনগর।

ও বাবা, ধর্মনগর তো অনেক বড়ো। তো কোন্ পাড়ায় থাকেন? বন্ধুটি কী তোমার সঙ্গে পড়ে?

—না!

—তবে চিনলে কেমন করে?

—ফোন করেছিলাম।

—তবে নাম্বার বলো, আমি কথা বলি। রিয়া নাম্বারের কথায় চিন্তায় পড়ে গেল। নাম্বার সে দেখেনি কত ডায়াল করেছিল। বাবা আশ্বাস দিয়ে বললেন—ঠিক আছে আজকে আসেনি তো কাল আসবে।

কিন্তু কালও এল না। রিয়া উদাস, কোনো কিছুতেই মন বসে না। খেতেও না, খেলতেও না। ওইদিকে শালুক বাবাকে কেবল বলে আমাকে নিয়ে চল। বাবা বলেন—কোথায়?

শালুক বলে বুলবুলির বাসায়।

—বুলবুলির বাসা কোথায়?—বন্ধুর পাতাবাহার গাছে। সেনবাবুও বুঝতে পারছেন না কিছু। রিয়া শালুকের বাবা মায়েরা কোনো সূত্রই পাচ্ছেন না বাড়ির ঠিকানার। রিয়া সময় পেলেই কত ভাবে ফোনের নাম্বার ডায়াল করে যায় ডানদিক থেকে বাঁদিকে, উপর থেকে নীচে। কোনো সময়ই শালুকের বাড়ি পায় না। ওদিকে শালুক টেলিফোনের রিং হলেই বোঝে বন্ধুর ফোন। ভাবে এবার ধরেই ঠিকানা জিজ্ঞেস করে নেবে নয়তো ফোনের নাম্বার। কিন্তু না, বাবার মক্কেলের ফোন। রাগ করে রেখে দেয়। দিনকে দিন রিয়া শালুকের মন খিটখিটে হয়ে ওঠে। ভাত খাওয়া উঠে যায়। স্কুলে যাওয়ার উৎসাহ থাকে না।

রিয়ার বাবা রিয়াকে নিয়ে কত জায়গা খুঁজলেন, সারাটা শহর প্রতিটি স্কুল। কিন্তু রিয়া কী করে চিনবে শালুককে। ওর মন বদলানোর জন্যে কত চেষ্টা করলেন। আনন্দমেলায় গেলেন। সাকাইবাড়ি গেলেন। না কিছুতে কিছু হল না; দুজনেই বন্ধু বন্ধু করে প্রায় অসুস্থ। মা-বাবারা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত শালুককে নিয়ে সেনবাবু ডাক্তারমামুর শরণাপন্ন হলেন। আজকে তো মামুর সাথে শালুক কোনো কথাই বলল না। একদম চুপচাপ। ডাক্তারমামু বাবার কাছ থেকে সবই শুনলেন, জানলেন। শালুককে ভালো করে দেখলেনও। রোগ তো কিছুই নেই। বন্ধু পেলেই সব সেরে যাবে। কিন্তু কীভাবে? এ সমাধান তো ডাক্তারমামুর কাছেও নেই। অভিমানে গম্ভীর শালুক ঘরে চলে আসে।

বিকেলে রিয়ার বাবা রিয়াকে নিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছেই যায়। ডাক্তারবাবু শৈবালবাবুর বন্ধু। সেই হিসেবে রিয়ার ডাক্তারকাকু। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করেন আজ কতদিন খাওয়া-দাওয়ায় রুচি নেই? বাবা বললেন, দিন চার পাঁচেক হবে। পড়াশুনা, খেলাধুলায়ও উৎসাহ নেই। সারাক্ষণ ফ্যাকাশে ফ্যাকাশে চেহারা নিয়ে থাকে। আর একটি বুলবুলি পাখির বাসার পাশে গিয়ে বসে থাকে। ডাক্তারবাবু বুলবুলি পাখির কথা শুনে নিশ্চিন্ত হলেন, বললেন, এ আর এমন কী অসুখ। পেট তো ভালোই। শরীরেও কোনো অসুবিধা নেই। আপাতত কোনো ওষুধ দেব না। আরেকটু দেখে নেই। প্রয়োজনে রাতে ফোনে বলে দেব সব। ডাক্তারকাকু রিয়াকে আদর করলেন। নিঃশব্দ রিয়া বাবার সাথে আসতে আসতে সমবয়সী দেখলেই আঁতকে চোখ ফেরায়। যেনো ও-ই হবে ওর বন্ধুটি।

সে রাতটি ছিল পূর্ণিমার। ছাদের ওপর নীল আকাশটায় ঝিকমিক করছিল তারা। বাবার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে রিয়া। নীচে পাতাবাহার গাছটায় বুলবুলি পাখির বাসাটা ভরে উঠেছে জ্যোৎস্নায়। সাদা দুধের মতো উপচে পড়ছে সব। রিয়া তাকিয়ে আছে ওইদিকেই। চারপাশ নীরব, ঝি ঝি পোকার ডাক। মা-বাবার মুখেও কথা নেই। ঘরের ভিতর টেলিফোনের রিং বেজে যাচ্ছে। রিয়ার কোনো উৎসাহ নেই ধরবে। মা গিয়ে ধরলেন। মায়ের গলা শোনা গেল—কাকে? রিয়াকে ডেকে দেব? ধরুন, দিচ্ছি মা ডাকলেন—রিয়া, রিয়া তোমার ফোন।

বাবার হাত থেকে এক ঝটকায় ছুটে এসে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে ঘরে। মা বললেন, তোমার ডাক্তারকাকু তোমাকে ডেকেছেন, কথা বলো। রিয়ার উৎসাহ সব নিমেষে নিস্তেজ হয়ে গেল। রিসিভার নেয় না হাতে। মা বললেন—ছিঃ, এমন করতে নেই মা, কথা বলো। মার কথায় ফোন তুলে নিল রিয়া। ওদিক থেকে ভেসে এল—রিয়া আমি শালুক, তোমার বন্ধু। আমি শালুক, তোমার নাম পেয়েছি ডাক্তারমামুর কাছে, ঠিকানাও।

রিয়া লাফিয়ে ওঠে—মা, বন্ধু পেয়ে গেছি। ওইতো বন্ধু কথা বলছে; সত্যি মা বন্ধুরই গলা। ওর নাম শালুক। মায়ের আনন্দও ধরে না, দে তো, দে তো, আমাকে ফোন দে। তোর বাবাকে ডাক শিগ্‌গির। বাবা এলেন দৌড়ুতে দৌড়ুতে। একটা আনন্দের ঘূর্ণি উঠল। রিয়ার মা কথা বলতে চাইল শালুকের সাথে।

—হ্যালো শালুক, কখন আসছো তোমরা।

—হ্যালো বৌদি—

আমি ডাক্তার ভাইয়া। রিয়ার মা স্তম্ভিত হয়ে যায়—কিন্তু রিয়া যে বলল শালুকের ফোন, ও কথা বলছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ সবই ঠিক আছে। বিকেলবেলাতেই রোগ ধরা পড়েছিল। দুজনই এখন সুস্থ। শালুক, আমরা সবাই মিলে কাল আসছি। বুলবুলির বাসায় নিমন্ত্রণে।

রিয়া, রিয়ার মা-বাবার সেকি আনন্দ! শালুক, শালুকের মা-বাবাও আনন্দে আত্মহারা হয়ে রইলেন ভোরের জন্যে। কখন ভোরের আলোয় ভেসে উঠবে বন্ধুর বাড়ি।
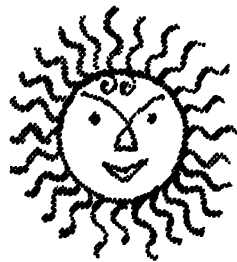
টক্কা, টুকুন আর স্মৃতি

দেবব্রত দেব
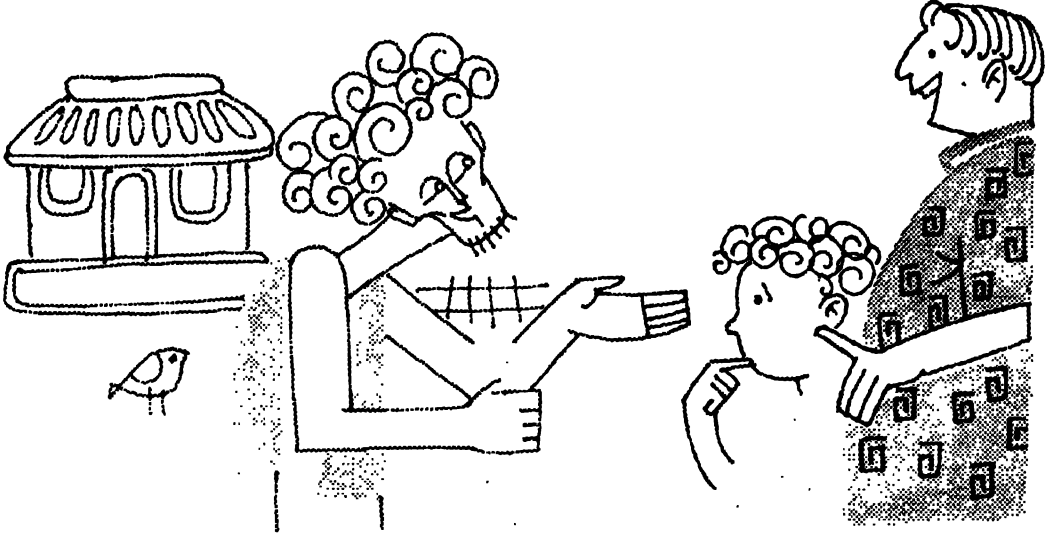
— এটাই গ্রাম!

মুচকি হেসে টুকুনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল অনুপম —'আয়ই না!' চারপাশে তাকাতে তাকাতে খানিকটা আনমনা টুকুন বাবার বাড়ানো হাত ধরল।

চোখের সামনে বিশাল একটা মাঠ। মাঠের ওপাশে টানা লম্বা একটা ঘর। দূর থেকেই বোঝা যায় বাঁশের বেড়ার। ওপরে সবুজ রঙের টিন। পরপর অনেকগুলো দরজাও এখান থেকেই চোখে পড়ছে। লম্বা একটানা বারান্দা। টুকুন বুঝতে পারল বারান্দার খুঁটির বেশ কটাই নেই। উলটোপালটা দূরত্ব দেখেই অনুমান করা যায়। ফেলুদার ফর্মুলা। দরজাগুলোর বেশিরভাগই হাট করে খোলা। মাঠের বুক চিরে সেদিকেই হাঁটছে এখন বাবা।

— ওই বাড়িটা কী, বাপি?

— ওটা তো স্কুল! দেখে বুঝতে পারছিস না? এরকম মাঠ, মাঠের পাশে লম্বা বাড়ি— ওহ্! তোদের স্কুল তো আবার দোতালায়। এই অব্দি বলে চুপ করে গিয়ে কয়েক পা হাঁটল বাপি। তারপর কেমন এক অদ্ভুত গলায় বলল—'ওটা প্রেমদাসুন্দরী নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়....জানিস টুকুন, আমি—আমি ওই স্কুলে পড়েছি।'

অবাক চোখে টুকুন তার বাবার দিকে তাকাল এবার। সত্যি বাপি অন্যমনস্ক হয়ে কী যেন ভাবছে, ভাবতে ভাবতেই হাঁটছে। খুব আলতো করে ধরা টুকুনের হাতটা কখন যে ছেড়ে দিয়েছে সম্ভবত খেয়ালই করেনি।

— ওই স্কুলে পড়েছ, তুমি!

— হ্যাঁরে। প্রেমদাসুন্দরী কে বল তো?

— কে?

— আমার ঠানদিদি।

— তোমার! আপন? টুকুন যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না তার বাপির কথা।

— তা নয়তো কি! হাঁটতে হাঁটতে বাপিও যেন অবাক হল এবার।

টুকুনও এবার চুপচাপ হাঁটে। ভাবেও-ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ বলল, 'আমি তো দেখিনি'।

তুই কী করে দেখবি! সামান্য হাসল অনুপম। 'তখন আমিই তো এ-ই, ধর তোর চে' একটু বড়ো।'

তখন মানে, কখন?

যখন প্রেমদাসুন্দরী ওই-খানে চলে গেলেন! বলে থুত্‌নি উঁচু করে আকাশের দিকে দেখাল অনুপম।

কখন! ইঙ্গিতটা ধরতে পারল না টুকুন।

টুকুন, এটা পেরুতে পারবি? প্রসঙ্গটা খানিক মোড় নিক, চাইল অনুপম।

মাঠ চিরে হাঁটতে হাঁটতে একটা রাস্তায় উঠে এসেছে কখন। লাল ইটের রাস্তা। খোয়া ওঠা এদিক ওদিকে। স্কুলবাড়িটার পেছন দিকে হারিয়ে গেছে। টুকুন বুঝতে পারল না কী পেরুতে হবে। চারদিকে তাকিয়ে খুঁজতে লাগল।

কী রে দেখতে পাচ্ছিস না?

ও হরি। তাই তো। একটা মরা ড্রেন যে সামনেই। মাঝখানে ওটা কী? গোল কাঠের থাম-মতন এপার-ওপার পাতা। বেশ মোটা।

কী ওটা বাপি?

পেরুতে পারবি তো?

কী হবে পেরিয়ে। ওপাশে তো ধানখেত। রাস্তা ধরে যাবে না? বাবার কাণ্ডকারখানা যেন বুঝতে পারছে না টুকুন। একটু অবাক হয়েই বলল।

ধানখেতের মাঝ দিয়ে গেলে হাঁটা অনেক কম। আমরা তো ওই পথেই স্কুল এসেছি বারবার। দারুণ মজা—আচ্ছা, দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি—বলে, অনুপম ওই অদ্ভুতুড়ে পুলটার উপর দিয়ে সার্কাসের লোকেদের মতো হেলে দুলে বেঁকে-টেঁকে ওপারে চলে গেল।

এবার তুই আয়! ভেরি ইজি-ক্যুইক অ্যাকশান-হ্যাঁ, আয়—আয়—এই—তো—অনুপমের বাড়ানো হাত ধরে ফেলেই টুকুনের ভয়টা উধাও। মনে হচ্ছিল পড়ে যাবে। হঠাৎ কীসের যে এক ঘোরে উঠে পড়েছিল ওটার ওপর—তারপর তো এপার!

গ্রেট। তেরা হোগা। বলে অনুপম ছেলের মাথায় দু-তিনটে টোকায় তার চুল এলো করে দিল। ওই পুল পেরুবার পর থেকেই টুকুন ভীষণ উত্তেজনা অনুভব করছিল ভিতরে। একটা অচিন আনন্দও হচ্ছিল। কতদিন বলতে বলতে বাপির আজ সময় হয়েছে তাকে গ্রাম দেখাবার। এ গাঁয়ে আবার বাপিদের বাড়ি ছিল একসময়।

বল তো ওটা কী ছিল—যেটার ওপর দিয়ে পেরিয়ে এলি? মজার একটা হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে টুকুনের দিকে তাকিয়ে রইল অনুপম।

ওটা? ওটা তো—কাঠ!

উ-হুঁ!

তবে?

ওটা হচ্ছে তালগাছের গুঁড়ি।

অবাক হয়ে ঘুরে তাকাল টুকুন। তাই তো! উঁকি মারে আকাশে! এই বুঝি উঁকি মারা হচ্ছে—ইস্! তাল গাছের এইরকম দুর্দশা?

চল। এবার এগোই।

ধানখেতের মাঝখান দিয়ে সরু আলের ওপর পা ফেলে অনুপম। পেছনে টুকুন। ধানের চারা টুকুনের প্রায় কোমর ছুঁই ছুঁই এখন। হঠাৎ দারুণ ভালো লাগে তার। দুদিকে দুহাত ছড়িয়ে ধানের ডগা ছুঁয়ে ছুঁয়ে হাঁটে টুকুন। দূর থেকে এখানে ওখানে নীচু নীচু বাড়িঘর দেখা গেল এবার। ধান গাছের গায়ে হাত দেবার পর থেকে আরও ভালো লাগছে।

আর সপ্তাহ দুয়েক পর সোনালি হবে। তখন দূর থেকে দেখতে যে কী লাগবে না!

বাপি বাপি, ওটা কী?

কোন্‌টা? হাঁটতে হাঁটতেই বলে অনুপম।

ওই যে ও-ই দূরে হল্‌দে ঢিবির মতন—

ওটা! ওটা তো খড়ের চিন। বুঝলি কিছু?

ঠোঁট উলটে মাথাটা দু-পাশে দোলাল টুকুন।

ধানকাটা হয়ে গেলে মাড়ানো হয়। তখন পাকা ধান ঝরে গিয়ে বিচালি আলাদা হয়ে যায়। ওই বিচালি গোরুর খুব প্রিয় খাবার। বিচালিগুলোকে একটা বাঁশে পুঁতে তার চারপাশে পেঁচিয়ে জমিয়ে রাখা হয়। ঠিক ওই রকম করে। এবার চিন ক্লিয়ার তো!

চলতে চলতেই মাথা দোলায় টুকুন। অবাক চোখ মেলে চারপাশ দেখে। হঠাৎ তার চোখ আটকে যায় সামনের একটা দৃশ্যে।

ওরা কী করছে? আর অমন ন্যাংটো হয়ে—

অনুপমও দৃশ্যটা দেখেছে। এক, দুই—এগারোটা ছেলে। প্রায় টুকুনেরই বয়সী। সমস্ত শরীর ভেজা প্রত্যেকরই। ওই পুকুরটা কী তখন ছিল? বোধ হয় না। হয়তো কেউ পরে কাটিয়েছে। ছেলেগুলো পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আবার উঠে এসেই ঝাঁপাচ্ছে। অনেক দিন আগেকার কী সব যেন কিলবিল করে জড়িয়ে ধরতে লাগল অনুপমকে।

কী! চান করবি না কী?

ওভাবে!

কেন, ওরা করছে না!

যাহ—টুকুন সামান্য লজ্জা পায়।

ওরকম স্নান করার মজাই আলাদা। তুই তো কখনও করিসনি তাই অবাক হলি। ছোটো বেলায় আমি কত-ত যে—

ওভাবে, ওদের মতন!

হ্যাঁ!

এ-মা!

এমা কী। চল চান করি। আহা, তোকে ওদের মত করে—প্যান্ট পরেই কর না।

টুকুনের কেমন যেন আস্তে আস্তে ইচ্ছেটা হচ্ছিল তখন। পায়ে পায়ে ওরা দুজন পুকুর পাড়ে গিয়ে দাঁড়াল। জলটা ইতিমধ্যেই বেশ ঘোলা হয়ে উঠেছে। ছেলেগুলো সবাই সাঁতার কাটছে। পাড়ে উঠে গিয়ে আবার লাফিয়ে পড়ছে পুকুরে। ওদের দেখে কারও কোনো লজ্জাটজ্জা হচ্ছে না।

কিন্তু বলি, আমি যে সাঁতার জানি না। হঠাৎ কেমন মনমরা হয়ে গেল টুকুন। অনুপম ভাবল, ঠিকই তো! শহরে ওই টুকুন ছোট্ট ফ্ল্যাটে ছোট্ট বাথরুম—ওই তো টুকুনের দৌড়।

চল, আজ তোকে সাঁতার শেখাব।

লাফিয়ে হাততালি দিয়ে উঠল টুকুন। টুকুনকে ওইরকম করতে দেখে ছেলেগুলো একটু বুঝি অবাক হল। হঠাৎ মুহূর্তের জন্যে ওদের কলকাকলি স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপরই আবার নিজেদের নিয়ে মেতে উঠল ওরা।

না বাপি, আমি না। আজ না—তুমি সাঁতার কাটো, দেখি আমি।

অনুপম নিষ্পলক চোখে একটুক্ষণ দেখল ছেলেকে। ভাবল, এর চে' বেশি তো হবার কথা না। কী দিয়েছি? ভালো স্বাস্থ্যকর খাবার, ভালো স্কুল, ভালো টিচার, টিভি, ফ্রিজ, ভিডিও গেম, হেল্‌থ ক্লাব, কম্পিউটার—এসবই তো! একটা মাঠ, একটু পুকুর, পুকুরে কাক-চক্ষু জল, এক টুকরো তালের গুঁড়ি—পেরেছি দিতে!

ছেলের অগোচরে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ফেলল অনুপম। বলল, 'থাক্। চল, এবার গাঁয়ের ভিতরে যাই। অনেক পরিচিত মানুষ'—

যাব। আগে তুমি সাঁতার কাটো, দেখি!

ইচ্ছে অনুপমের ভীষণই করছিল। সমস্ত শরীর-মন চাইছিল ওই ঘোলা হয়ে ওঠা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বহুদিন ভুলে যাওয়া খেলাটা আবার একবার..........

তারপর টুকুন একসময় পুকুরের চারপাশে দৌড়ে দৌড়ে বাবাকে উৎসাহ দিল প্রচুর। সেই ছেলেগুলোও, প্রথমে অনুপমকে জলে নামতে দেখে অবাক হলেও শেষ পর্যন্ত ওরাও মজে গেল খেলায়।

কেডা! বিশ্বনাথ চৌদ্রির নাতি নি কইলা!

যেন চোখে রোদ পড়েছে। হাত দিয়ে চোখের উপরে একটা ছানির মতো করে ছায়া ফেলল বুড়ো মানুষটা। অনুপমের দিকে অবাক স্বরে বলল কথাগুলো।

হ্যাঁ। খুব মিহি স্বরে বলল অনুপম। 'আপনি তো হরচন্দ্র দত্ত.......আমরা হরকাকা বলতাম—'

তুমি তইলে লেবুদার পুলা, কও! লেবুদা—দিব্যনাথ চৌদ্রি........দিব্যনাথের এক পুলা......কী কইলা যেন্ নামডা—'

অনু—অনুপম চৌধুরী—'

টক্কা!

নামটা শুনে বাবা কেমন অপ্রতিভ হয়ে একবার তাকিয়ে দেখল টুকুনের দিকে। টুকুন বেশ মজা পাচ্ছে এখন।

তুমারে ওই-নাম কইলে এই গেরামে কি কেউ চিনতে পারব? তুমি তো হইলা টক্কা। সারাদিন খালি যহন-তহন 'টক্কে-টক্কে' কইরা গেরাম মাতাইয়া—! যাউক্‌গা, লগে ইলা কেডা! টুকুনের দিকে হঠাৎই যেন নজর আটকে গেল বুড়োর। চোখের উপর হাতটা আগেরই মতো রাখা আছে।

আমার ছেলে। বাবার গলার স্বরটা এবারও অদ্ভুত রকম মিহি শোনাল টুকুনের কানে।

তুমার ছেইলা? আরে কও কি! এই ত্যো হেইদিনের টক্কা অখন টক্কারও পুলা—দেহিছ্নে, দেহিছ্নে!

যাও টুকুন। ইনি দাদু—অনুপম টুকুনকে সামান্য ঠেলে দিল সামনে। একটু ইতস্তত করছিল টুকুন। আবার সেই মজাটাও ছিল একই সঙ্গে। বুড়োর একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়াল এবার।

হাতটাকে আরও খানিক তুলে খুব ভালো করে দেখতে চেষ্টা করল বুড়ো। টুকুন লক্ষ করল চোখ দুটো কেমন ধূসর। ভুরু জোড়া সাদা আর ভীষণ মোটা। মাথার চুলগুলোও সাদা। বুড়ো অবশ্য মিশমিশে কালো।

ইডা তো দেহি সাইক্ষাৎ কৃষ্ণঠাকুর! আইয়ো দাদু, আইয়ো তুমারে এট্টু কুলে লই—'বলে বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াল। বেশ কসরৎ করতে হল মোটা লাঠিতে ভর দিয়ে। টুকুন বুঝতে পারছিল তাকে কোলে নেবার সাধ্যি ওই বুড়োর হবে না। সে বাবার দিকে তাকাল।

কাকা, আপনে কি পারবেন ওরে কোলে তুলতে.........এখন বড়ো হইয়া গেছে'—

হক কথা! বুড়ার কইট্টা গেছে দাঁত গেছে বাঘা অহন হিয়াইল্যা হইছে—নিকিও দাদু!' বলে বুড়ো টুকুনের মাথাটা দু-হাতে টেনে নিলেন। টুকুন টের পেল তার মাথাটা বুড়োর বুকের ঠিক নীচে যেখানে পেট শুরু সেখানটায় চেপে ধরে বুড়ো বিড়বিড় করছে—'বাইচ্যা থাক দাদা ভাই। বাইচ্যা থাক.......'

টুকনের অদ্ভুত অনুভূতি হল। এই অব্দি, এখনও ক্লাস ফাইভে—কেউ কোনোদিন এভাবে আদর করেছে, মনে পড়ে না। বুড়োর শরীরের উপরের অংশ উদোম। শরীরের বেশিরভাগ চামড়া কুঁচকে গেছে। কেমন একটা সোদা গন্ধ বুড়োর শরীরে। ঘাম না মাটি না কী বুঝতে পারছিল না সে।

তো কাকা, আপনারা ভালো—'

'আর ভালো! দিনকাল—' টুকুনকে ছেড়ে দিল বুড়ো। আবার বসে পড়ল আগের মতো। 'খুব খারাপ অইয়া গেছে গিয়া। চাইরো দিকে খালি অবিশ্বাস—কেউ কেউগ্গারে পুছে না'—

এই অব্দি বলে অদূরে ঠায় দাঁড়ানো আমলকী গাছটার দিকে তাকিয়ে রইল বুড়ো। আমলকী গাছটা দেখেই চিনে ফেলেছিল টুকুন। বাবাকে সে-কথা বলতে বাবা পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল।

ভালাই করছিল লেবুদা। সময়মতো গেরাম ছাইড়া দিয়া। তুমি তো তহন ছুট্টু। তুমরার এই বাড়ি লেবুদা আমারে জলের দরে দিছিল। অহন, এই গিয়া ধর তিরিশ বচ্ছর পরে এই বাড়ির দাম কত খাড়াইয়াছে কও ছাইন্! বলে বাবার দিকে চোখ তুলে তাকাল বৃদ্ধ।

বাবা চুপচাপ। টুকুন বুঝতে পারল বাবার কোনো ধারণা নেই এই বিষয়টাতে।

যে দামে কিনছি তার আর্ধেক! বুইজ্যা লও। বলে বাবার দিকে তাকিয়ে হঠাৎই যেন বুড়ো বুঝতে পারল—'তুমার গাও-টাও কেমুন ভিজা-ভিজা লাগে—'

না, মানে—

বাবা সামনের ওই স্কুলের পরে যে পুকুরটা, ওতে স্নান করেছে তো দাদু। সাঁতরে সাঁতরে। এতক্ষণ পর নিজের বলার মতো একটা বিষয় আবিষ্কার করতে পেরে সুখী হল টুকুন।

চল, চল বাড়ির ভিতরে চল। ভালো কইরা ছান-ধ্যান কইরা খাইয়া দাইয়া—

না, কাকা আমরা সকালে ভালো করে খেয়ে—

খারাপ কইরা খাও আর ভালা নিজের বাড়ির থিক্যা না খাইয়া যাইবা ইডা কেমুন কথা! চল, চল—

অনুপম আরও একবার চেষ্টা করল বুড়োকে বোঝাবার। কিন্তু বুড়ো ততক্ষণে—'চল্‌রে দাদাভাই, তর দুদু যুদু তরে না দেহে তইলে আমার মাথা ভাইঙ্গা খাইব—চল্‌ চল্‌......

তাহলে রাতে তোমরা বাপ-ব্যাটা কেউ কিছু খাচ্ছো না?

উহুঁ। টুকুন আর অনুপম এক সঙ্গে দুজনেই বলে ফেলল।

ভালোই হল। আমাকে এবেলা আর রান্নাবান্না করতে হবে না। ও বেলার যা রয়েছে তা দিয়েই চলে যাবে। তা কী এত খাওয়াল গ্রামের মানুষেরা, একবার শোনা যায় না?

সে বিশাল এক ভোজই বলা ভালো। পেটের উপর হাতটাকে মৃদুভাবে বোলাতে বোলাতে বলল অনুপম।

মা, তুমি কী জানো টক্কা কে! টুকুন হঠাৎ উলটো ফোড়ন কাটল।

কী বললি? টক্কা!

হ্যাঁ গো, টক্কা!

ও আবার কী শব্দ, খায় না মাথায় মাখে?

মাথায় মাখবে কী গো? এত বড়সড় একটা মানুষকে মাথায় মাখা যে কী করে সম্ভব—' ছদ্ম বিস্ময় ছড়িয়ে টুকুন মায়ের দিকে মুখ তোলে।

নুষ?

হ্যাঁ, মানুষ। জলজ্যান্ত এই যে আধশোয়া হয়ে—

কে, তোর বাবা!

জিজ্ঞেস করো।

কী গো, কী বলছে টুকুন?

টক্কে! ও তো আমার ছোটোবেলার গাঁ-তুতো নাম। এই টুকুন যা তো গিয়ে ঘরের আলোটা নেভা তো।

টুকুন বুঝতে পারছিল না কেন আলো নেভাবে, কিন্তু কিছু একটা রগড় তো অবশ্যই হবে একটু বুঝতে পারল। আলো নিভিয়ে দিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এসে বসতেও পারল না টুকুন। সমস্ত ঘরময় তক্ষকের ডাকে গমগম করে উঠল। উচ্চগ্রামে শুরু করে ক্রমে যেন নিস্তেজ হয়ে এল গিরগিটিটা। টুকুনের সমস্ত শরীর কেমন কেমন করে উঠল। উঠে গিয়ে আবার জ্বেলে দিল আলোটা।

ঘর ভরে উঠল উজ্জ্বল আলোতে। বাবা খুব মজার মুখ করে টুকুন আর মায়ের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে বলল—কেমন? টক্কে ক্লিয়ার?

ওই শব্দগুলো তুমি করলে।

ইয়েস! আর শৈশবে ওইরকম অবিকল করতে পারতাম বলেই গাঁ-শুদ্ধু সবাই আমাকে টক্কা বলে ডাকত।

কথাটাতো তক্ষক। টক্কা আবার কী? মায়ের বিষয়টা ভালো লাগেনি। তা ছাড়া মা কলকাতার মেয়ে ওসব গেঁয়ো শব্দ মা'র জানার কথাও না।

ওটা এ-বঙ্গে রূপ বদলে টক্কা হয়েছে। বাবা বলল।

প্রেমদাসুন্দরী নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়—নাম শুনেছো?

নাহ্! সে আবার কোন্ স্কুল? মা কি সামান্য বিরক্ত।

প্রেমদাসুন্দরী কে বল তো?

আমার ইন্টারভ্যু নিচ্ছিস মনে হচ্ছে?

বলই না!

আমি কী করে বলব!

আমার ঠানদিদি। বাবা ওনার মায়ের নামে একটা প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সে তো আমাদের গাঁয়ে। টুকুন আজ দেখল। এবারও বাবা উত্তরে দিল মাকে।

ঠিক আছে। বলতো চিন কী? বাবা এবার বলবে না কিন্তু।

সে তো একটা দেশ। সবাই জানে। এশিয়া মহাদেশের—

হিন্ট দিচ্ছি। মা, খড়ের গাদায় খুঁজতে গেলেই পাবে। টুকুন একদম ক্যুইজ মাস্টারের মতো করে বলল।

ধুর! এটা কি হিন্ট হল? চিন মানে তো চিন।

হ্যাঁ, চিন! দেশ না, খড়ের গাদা।

খড়ের গাদা! মা যেন আকাশ থেকে পড়ল খসে।

এবারও বাবা বুঝিয়ে দিল চিন ব্যাপারটা। ততক্ষণে ঘড়িতে রাত দশটা। খাবার সময়। সাড়ে দশ পৌনে এগারোর মধ্যে শুতে হবে। বাবা তাড়া দিল।

যাও তুমি গিয়ে খেয়ে নাও। টুকুন তুই কি সত্যি সত্যি কিছু খাবি না? নাকি আমার দেখা দেখি—

সত্যি বলছিস তো? না, মাঝরাতে উঠে আমাকে রান্না চাপাতে হবে!

সত্যি, সত্যি, সত্যি! বলে মায়ের দিকে এক মুহূর্ত তাকাল টুকুন। তারপর বলল—'আমি আজ তোমার সাথে ঘুমুব না।'

রাত বেশ গভীর এখন। মায়ের পাশে অনেক দিন পর শুয়েছে টুকুন। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না তার। বাবার সঙ্গে গ্রামে ঘোরার স্মৃতি কেবলই তাকে ভাবাচ্ছে। নানা দিক থেকে নানাভাবে তাকে উস্কে দিচ্ছে। কখনও আনন্দে উদ্‌বেল করছে আবার কখনও অদ্ভুত এক নতুন অনুভূতি—কেমন অজানা, সুদূর।

বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছে টুকুন। পাশেই জানালা। জানালায় কাচের সার্সি। টুকুনদের ফ্ল্যাটটা দোতালায়। জানালা দিয়ে আকাশে জ্বল জ্বল করা তারাদের ভিড়ে চোখ পড়ছে প্রতি মুহূর্তে।

কীরে ঘুম পাচ্ছে না?

নাহ্।

আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, ঘুমো।

আচ্ছা, মা—'

হুঁ—

বাবার কাছে কত স্মৃতি, তাই না?

তাই-ই তো। গ্রামে যারা শৈশব কাটায় তাদের স্মৃতি অনেক বেশি থাকে। গ্রামে ক-ত কী আছে......মায়ের ঘুম ঘুম উত্তর থেকে টুকুন বুঝতে পারছে কথা না বলাই ভালো। কিন্তু কথা না বলে সে থাকতে পারছে কই। মা ওই ঘুম ঘুম অবস্থার মধ্যেও তার চুলে হাত বুলিয়ে চলেছে।

মা, ঘুমিয়েছো?

নাহ্—'

আমি যখন বড় হব.........বাবার মতো........... তোমার মতো.........

হবি তো—

আমাদের শহরে তক্ষক নেই, খড়ের চিন নেই, প্রেমদাসুন্দরী নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়—এসব কেন নেই যে.........

শহরে......ওসব তো........গাঁ-গঞ্জেই থাকে........

মা ঘুমের দেশের পথের মাঝামাঝি বুঝতে পারল টুকুন। কিন্তু ওই অবস্থাতেও তার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে চলেছে একটানা। থাক ঘুমোক। সারাদিন মায়ের তো পরিশ্রম কম না।

টুকুন অন্ধার জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। কোনোটা টিপ টিপ কোনোটা পিট পিট কোনটা একেবারে চুপচাপ।

ঘুমো......

ঘুম জড়ানো গলায় মা বলল।

আচ্ছা মা, আমার স্মৃতি কী হবে? যখন বড় হব .... বাবার মতো .... তোমার মতো ....

মায়ের গলায় কোনো সাড়া নেই। এবার কী ঘুমিয়ে পড়েছে। কোনো সংশয় নেই। কিন্তু সারাদিনের ঘোরাঘুরি যে প্রশ্নের জন্ম তার মধ্যে দিয়েছে সেটির সমাধান যে কী হবে, টুকুনের মাথায় সেই চিন্তা কিলবিল করছে এখন।

যা দেখলি, শিখলি......এমনকি বাবার যে স্মৃতি......তক্ষকের ডাক ডাকতে পারা......ঠানদিদির নামে স্কুল......গাঁ-তুতো নাম......গ্রাম......শহর সবই স্মৃতি......তোর আমার.....সবার স্মৃতি....

তারাদের দিক থেকে মুখ সরিয়ে এপাশে ফিরল টুকুন। আবছা আলোয়, তারার আলোয়ই হবে মায়ের প্রায় ঘুমন্ত মুখটা কয়েক মুহূর্ত দেখল। টের পেল তার মাথার চুলে বিলিকাটা মায়ের বাঁ-হাত এখন আর নড়ছে না। শ্বাস নেয়া ফেলায় ঘুমের স্পষ্ট ইশারা। টুকুন আলতো করে মায়ের মাথার চুলে একবার হাত বুলোল। দুবার। তিনবার। তার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে টুকুন সেটা বুঝলে কী না জানতে না চেয়েই মায়ের ঘুমিয়ে পড়া প্রমাণ করে টুকুন বুঝতে পারবেই একথা মা জানত।

একটু অদ্ভুত প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়ল টুকুনের মুখে, চোখ বুজল সে।

চালিতাবাড়ি

জয়া গোয়ালা

(এক)
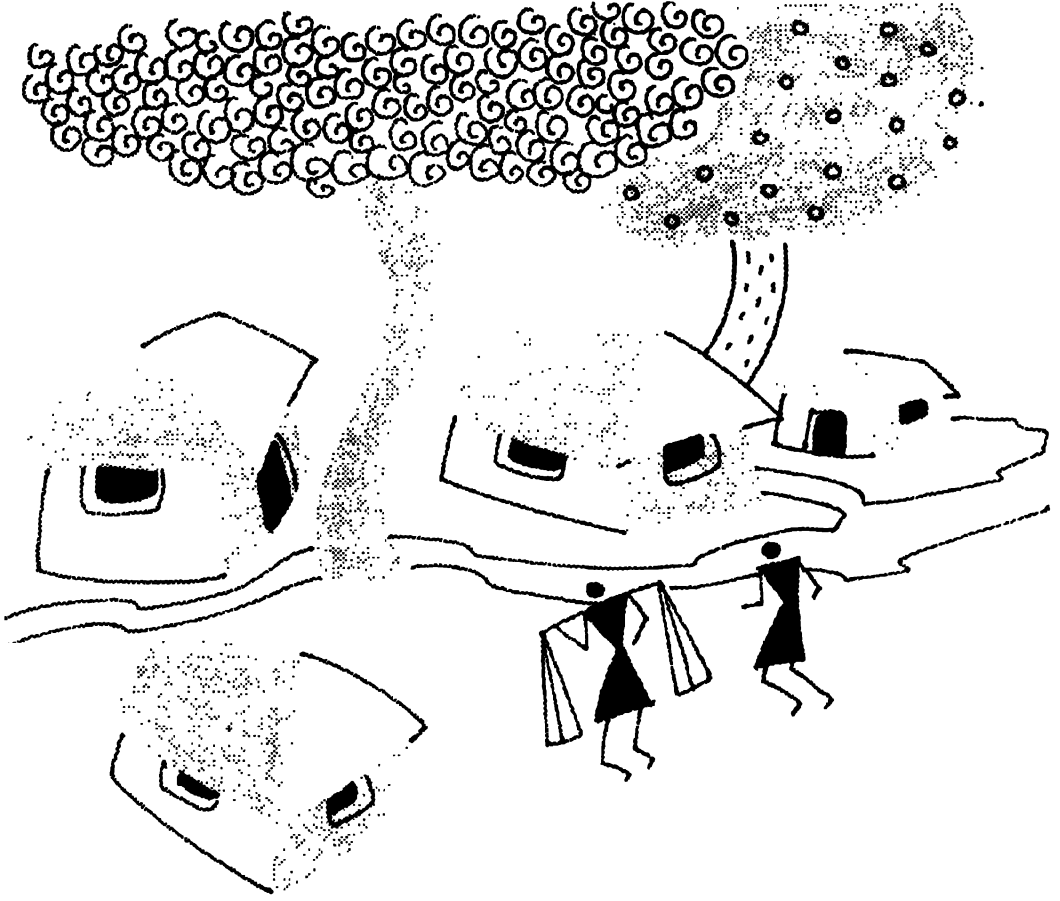
এ জঙ্গালে মুংকুবুইরা, শ্যামল-চম্পা, বিরষারা ছাগল-ছানার মতোই চরে বেড়ায়। আদাড়ে বাদাড়ে চরকি কাটে। হরদম ভোঃ চক্কর মারে। জংলি লতাপাতায়, ঝোপেঝাড়ে ধুলো মাখা হয়ে চিতপাত হয়। খাবি খায় চড়ুই পাখির মতো।

কত নটখট! নিশি-ফলে দাঁত কষায়। ক্ষুদি-জামে পেট ভরায়। রাই গাছের কাঁকই-এ চুল আঁচড়ায়। ধাবিন পাতায় কুটলুস ফল ভরে চমৎকার পানের খিলিতে ঠোঁট রাঙায়।

এদের হাড়পাঁজরে পলকা কাদা-মাটির আস্তরণ। কলজের পাতলা ধুক পুকি দৃশ্যমান। তবু এরা বাতাসে উড়ে না। বাদলে গলে না। রোদ্দুরে পোড়ে না। আলো-হাওয়া, জল-ঝড়, মেঘ-রোদ্দুর, আকাশ-মাটির সঙ্গে এদের আজন্ম মিতালি যে—।

গ্রামটার নাম চালিতাবাড়ি। ইয়া মোটা-লম্বা দু-চারটে চালিতা গাছ আছে বটে। ওই যে গো, সোনারাম তিপরার খেতের ধারে, মাছের খলবলি ওঠা ডোবার পারে। উঁচু মাটির টিবিটা অ-নে-ক দূর পর্যন্ত যার এলানো শরীর। দেখতে তো ছোট্ট খাট্টো পাহাড়ের মতোই ধনুকের মতো নাকি কাঁইচির মতো মাটির পাহাড়টা ধাপে ধাপে উঁচুতে। আসমানটার দিকে। তারপর ধী-রে ঢালু হয়ে আবাদি মাঠের সমতলতায়। মাথায় তার সবুজ মখমলি টুপি। গায়েও পাতা-রঙা উড়নিটা। শুধু ধারে ধারে টাক্কাল খন্তার ক্ষতচিহ্ন।

সাদা মাটির উৎসস্থল এদিকে এই একটাই। বাচ্চা পাহাড়টাকে কেটে চিরে শেষ করেছে সব্বাই মিলে। চুন ধবল মাটির আস্তরণে ঘরকে করছে সাদা কুড়চা ফুলের মতো ধবধবে। পুজো আসছে যে—। টুকরি মাথায়, হাতে খন্তা—গাছ কোমর বাঁধা চঞ্চলা কিশোরী বাগিচার দিকে হাঁটছে, কোমল পায়ে ছন্দ তোলে। কেউ বা কাঁধে বাঁক ভরা মাটি, টিলার উপর উঠছে হেলেদুলে। আড়ঘোমটা গাঁয়ের বধূও মাটি নিয়ে আমলকী বনের পথ ধরে ঘরে ফিরছে দুলকি চালে।

এই সাদা মাটির পাহাড়ের গায়েই চালিতা গাছগুলি। আকাশের দিকে মুখ তোলে কারও কাছে নালিশ জানাচ্ছে। বুড়োহাবড়া গাছগুলি যদি বা না জানায় মুংকুরুই বিরষাদের বুকে কিন্তু অভিযোগের পাহাড়। কী সুন্দর টিলাটি শেষ হয়ে যাচ্ছে—গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ওরা চিন্তায় মরে। গালে হাত ক্ষুদে ক্ষুদে মানুষের। বুড়ো মানুষের মতো বিচলিত ভ্রূভঙ্গি। মাথার উপর বড়োছোটো চালিতা। মুংকুরুই তরতর করে গাছে ওঠে। বানরের মতো ক্ষিপ্রতা। কাঠবিড়ালির মতো এ ডাল ও ডালে লাফায়। ঝপাৎ করে নীচে ফেলে ডাঁসা চালিতা। সকলে হইহই ও রইরই করে ওঠে। বাচ্চা পাহাড়টা পর্যন্ত ওদের সঙ্গে চালিতা লোফালুফির খেলায় মেতে উঠে।

—চাইল্‌তাবাড়ির চাইলতারে—চম্পার সুরে দয়ালক্ষ্মী সুর মেলায়। বিরষা বলে—কয়দিন পরে মাটি শেষ, পাহাড় শেষ, গাছটিও ভাইঙ্গা পড়ব। তখন এই গেরামের নাম কী হইব?

চম্পার খাটো ঝুলের ছেড়া নিমার কোঁচড়ে 'ভটকা' চালিতা। নিমার কোণ দুটো ছেড়ে দিতেই টুকুস্ করে মাটিতে। শূন্যে কোঁচড় দুলিয়ে বিজ্ঞের মতো সে বলে—নাই চালিতা পাড়া।

হো হো, হা হা, হি হি, হে হে কত রকমের হাসি ভ্রমরের মতো ডানা ঝাপটিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। গুঞ্জন তোলে পাহাড় টিলায়, ডোবার জলের আঁজলা আঁজলা সবুজে। পাগলাঝোরার মিঠেল জলে, লতানো পাতার জগে, ফুলে, রাতের হিমমাখা ধানচারায় আর সাদা নীল মেঘের দেশেও।

(দুই)

হামা দিয়ে উঠে সূয্যি মামা, যেন মায়ের কপালের গোল সিঁদুরে টিপটা। উপরে ওঠে। হামাগুড়ি দিতে দিতে পাহাড়ের খাঁজ ছেড়ে একটু একটু করে এগোয়। হামা দেয় মুংকুরুইদের মনগুলিও ঘর থেকে দাওয়া, উঠোন, খিড়কি-দুয়ার, রাস্তা—। তারপর সেই তেমাথায়। ওই যে যেখানটায় পায়ে চলা রাস্তা তিনটে তিন দিক থেকে এসে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়েছে। গল্প করছে। মস্ত অশ্বত্থের ঝুরি মাটির নরম বুকে ঠোঁট চুবিয়েছে সেখানটায়।

হররোজ এখানেই ওরা একে একে এসে থমকায়। যতক্ষণ না সব্বাই আসছে। অশ্বত্থফল দাঁতে কাটে কুটুস্ কুটুস্।

ঝুরি ধরে দোল খায়। কেউ তাক করে পাখির দিকে 'ধেনুক-ঠুটি'। ধেনুকটা তো ধনুক-ই। বাঁশের তৈরি। ঠুটিটা তিরের মতো। কিন্তু তাতে তীক্ষ্ণ ফলা নেই। মুলি বাঁশের গাঁট চিকন শলার মাথায়। তাই দিয়ে বেশ ঘায়েল হয় ছোটোমোটো পাখি। পাখির ছানা। বিরষাকে তো ধেনুক-ঠুটি ছাড়া কল্পনাও করে না ওরা কেউ। শ্যামলের আছে গুইল্লাইল। আর মাটির ছোটো ছোটো ঢেলা। অর্থাৎ মার্বেলের চেয়ে একটু বড়ো মাটির মার্বেল। তাই দিয়ে আকাশ-গাঙে ভেসে থাকা পাখি মাটিতে নামায় শ্যামল। ডুপি কিংবা কালিদয়াল মেরে ফেলে ঠাস্ করে। পোড়ানো পাখির মাংস খায় জম্পেশ করে সব্বাই মিলে।

আড্ডায় পা রাখতে দেরি হয় মুংকুরুই-এর। মুংকুরুইরা জুমিয়া। বাবা মা চলে যায় ভিতরের পাহাড়ে। বুড়ো নানার হুঁকো তামাক পাতা সামলে, শুয়োর, মুরগির খাঁচা তৈরির বেত ছড়িয়ে রেখে আসে মুংকুরুই। বুড়ো আস্তে আস্তে বুনে চলে। ধলী গাইটাকে নিয়ে দেববর্মা পাড়া থেকে বেরিয়ে দেখে বন্ধুরা সব অশ্বত্থতলে। ছেঁড়া পাছড়াটা কাছা মেরে কোমরে কষে মুংকুরুই। তার উপর বাঁধে লালা-ডোরা গামছাটা। কখন কে টান দেবে ঠিক আছে।

শ্যামলও কখনও দেরি করে ফেলে। চম্পা আগাম খবর বয়ে আনে। দাদা বাবার লগে হেই বাজারের দোকানে গেছে। মুখ শুকিয়ে কোনো দিন যোগ করে-কাইল রাইতে মা ভাত রান্ধছে না। জানস্, কী খিদা পাইছে।

তারপরই—

—দেখি গিয়া দাদা কী আনছে। বলেই দৌড় লাগায় বাড়ির দিকে। বিষণ্ণ চোখ দুটি ওর সকালের সোনা-রোদে ঝলমলিয়ে উঠে। বিরষা, মুংকুরুই, দয়ালক্ষ্মীর ঝলমলানো দৃষ্টিটা নিভে যায় কেন যেন।

বিরষার ইচ্ছে করে বাঁশের তাকে রাখা ইয়া মুটকো রুটি দুটো এক দৌড়ে নিয়ে আসে। মা দিদা চা পাতা তুলতে গেছে। বলে গেছে বাবার রুটিটা যেন সে না খায়। বাবা আজ আসবে কি না কে জানে! গেল রাত্তিরে ঝুমুর এসেছে। ঝুমুর নাচে। করম একটা পুজো। সেই পুজোতে সারা রাত দিন এই নাচ হয়। চা বাগানে এই পুজো খু-উ-ব হয়। নাচ গানে সব্বাই মশগুল হয়ে যায়। বাবা কি আসবে ওই খুশির আসর ছেড়ে! কী দারুণ মাদল বাজায় ওর বাবা। হাতের পেশিগুলি ফুটে ওঠে। দেহটা চমকায় মাদল বোলে। গানের তালে।

বিরষা উসখুস করে। ভরা পেটটা নিয়ে দোষী দোষী মুখ করে এদিক ওদিক তাকায়।

শ্যামলদের বাড়ি দেববর্মা পাড়ার নীচে। সমতলে। বিরষাদের চা-বাগানটার ধার ঘেঁষেই। ওর বাবার এখন জমি নেই। কেবল বাড়িটা। আগে নাকি ওদের জমি ছিল। ধান ছিল। ছিল দুটো বলদও।

গত বছর পুজোর ঢের বাদে ওরা ঘুরছে। রায় মাজনের আবাদি মাঠ ন্যাড়া ন্যাড়া। ধান কাটা হয়ে গেছে। খেতগুলি খালি খালি তাই শুধু নাড়া আছে। নাড়া হল ধান গাছের নীচের অংশ। তাতে কোনো কোনোটায় ধান শিষ। পাকা ধানের আস্ত সোনালি শিষ। নীচে খেতে পড়ে আছে ভাঙা অথবা আস্ত শিষ, ধানে ভরা। তা-ই কুড়িয়ে ঘরে নেয় শ্যামলরা। মুংকুরুইরাও ছাড়ে না। এমন সোনার গোল গোল দানা কে ছাড়ে! এক্ষেত ওক্ষেত ঘুরতে ঘুরতে শ্যামল বলেছিল—আমরার জমি মাজনে লইয়া গেছে। এই মাজনেই মনে হয়।

শ্যামলের বাবা মা তাই মজুরি খাটে পরের খেতে। লোকের বেড়া বাঁধে। ঘর বানায়। ঘরে মাটি লেপে। সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যায় ফেরে বাড়ি। শ্যামল চম্পা সারাদিন মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। ওরা সবাই-ই তা-ই। বাবা মা ভাই বোন সবাই যে যার কাজে। ডানা মেলা পাখির মতো ওরা খোলা আকাশের তলায়। টিলা-লুঙ্গা, মাঠ-প্রান্তর, ডোবা-নালা, গাছ-গাছাল, ফুল-পাখি, স-ব ওদের বন্ধু। ওরা ছাড়া চালিতাবাড়ির জঙ্গলে ফুল ফোটে না। ফল পাকে না। পাখি গায় না। ঝরনা নাচে না। লাল-সূর্যটা তো রাঙা মুখটি পাহাড়িয়া খাঁজ থেকে বের-ই করতে চায় না।

মুংকুরুইরা তাই বনবীথির কোলে কোলে চরে বেড়ায়। ছাগল ছানার মতো তিড়িং বিড়িং নেচে বেড়ায়।

(তিন)

বিরষা বলে—যাইবি দুগ্গা দেখতে? পাকা গিন্নির মতো পান রাঙা ঠোঁট নেড়ে দয়ালক্ষ্মী ঝংকার দেয়—ছাগল! এখন কইত্তে দুগ্গা আইব! মাথা খারাপ হইছে নি তর। চম্পাও হি হি হি করে হেসে গড়িয়ে পড়ে—বেবাট। কুটলুস ধাবিনের পানের পিক আরেকটু হলেই বিরষার গায়ে পড়ে আর কি!

বিরষা বেকুব বনে বন্ধুদের দিকে চায়। ওদের কাছ থেকে কোনো রকম সাড়া শব্দই পায় না। রেগে আগুন হয়ে যায় সে।

অবলা জীব দুটোর দিকে অবজ্ঞা ভরে তাকিয়ে বীরদর্পে ঘোষণা করে—বিশ্বাস না করলে নাই—আমি দেখতে যামু।

সত্যিই কাঁঠালি চাপার ছায়াতল ছেড়ে কেয়াঝাড়ের পাশ কেটে রাস্তায় নামে বিরষা। ওদিকেই বাগান মহল্লা। বিরষাদের ঘর বসতি।

চম্পা, দয়ালক্ষ্মীর দিকে আগুনে দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে গরজায় শ্যামল, এই লাইগ্যাই তরারে ভাল্লাগে না।

বিরষার ততক্ষণে চোখ ফেটে জল আসতে লেগেছে। শ্যামল-মুংকুরাই-এর উপর এক বুক অভিমান। বয়সে ছোটো, বুদ্ধিতেও ছোটো। তার উপর 'ফরক্' পরে দয়ালক্ষ্মীরা। ওরা না বুঝলেও খাটে। মুংকুইরা তো বুঝত। রাগে দুঃখে অভিমানে পা ফেলে বিরষা—অই-দাঁড়া—দূরাগত কণ্ঠে কতই না কাকুতি। বিরষা থামে না।

ওরা এসে জাপটে ধরে—ঘিরে ধরে। বাংলা, ককবরক, হিন্দুস্থানীদের 'ছিলমিল' ভাষা সব এক হয়ে যায়। এক সাথে থাকতে থাকতে কোন্‌টা কার ভাষা এখন বলার সময় আর খেয়াল থাকে না। তিনজনেই তিনটি ভাষা পাখির মতো আওড়ায়। অনর্গল। দয়ালক্ষ্মী, চম্পাও কম যায় না। ওরা কেন অবলা থাকবে। দু-তিন বার হোঁচট খেয়ে, চার পাঁচ বার আছাড় পড়ে; দু-একটা দাঁত ভেঙে মোটামুটি বলে ফেলে ভাষাগুলি। দয়ালক্ষ্মী বলে—আমি হইলে পারে মোতামোতি—। হাসির ধুম পড়ে যায়। চম্পা কত কসরত করে ওকে 'ট' উচ্চরাণ করাতে। উঁহুঁ, সেটি হয় না। হাল ছেড়ে দিয়ে এখন চম্পা মাঝে মাঝে নিজেই উচ্চারণ করে বসে—মোতামোতি।

আবার এক চোট হাসি জঙ্গল কাঁপায়। আজ ওরা ফের ভাষা নিয়ে হামলে পড়ে। খড় পেঁচিয়ে প্রতিমার কাঠামো তৈরি হচ্ছে। চাদ্দিকে ভিড়। ওদের-ই মতো আধ ন্যাংটো সিকি ন্যাংটোদের চোখের পলক পড়ছে না।

বিরষার কথায় এ হচ্ছে—মেড়।

শ্যামল বলছে—কাডাম।

মুংকুরুই -এর গম্ভীর মুখের বুলি কাথামু।

শেষতক চম্পা-ই রায় দেয়—হস্মলের কথাই ঠিক। অত ফড় ফড়ানের কি আছে।

মুংকুরুই-এর খুড়তুতো বোন দয়ালক্ষ্মী। চ্যাপটা নাকে 'সিকনি'-র ধারা। হাতের চেটোয় পটাস করে নাক পোঁছে, ভাইয়ের দিকে তাচ্ছিল্য ভরে তাকিয়ে চোখ পিটপিটায়—তুন্দা তক্ক। ছিঃ।

ওর সর্দি মোছার ভঙ্গিমা আর বলার ঢঙে সকলে মজা পায়। ভাষা নিয়ে কচকচানি ভুলে যায়।

শ্যামল-বিরষা-মুংকুরুই-বাগানের নাটমন্দির ছেড়ে কদম বাড়ায় টিলা জঙ্গলের পথে। যেন কারও অদৃশ্য হাতছানি ওদের ডেকে নিয়ে চলে।

(চার)

দাইড়া-বান্ধা খেলতে গিয়ে আজ খেলা হল না। কত কষ্টে গতবছর কোর্ট বানিয়েছিল মুংকুরুইরা। জোরসে খেলা চলত ও বছর এমন দিনে।

আজকের মতো আকাশটা ঝক ঝকে। তাতে নীল জলে সাদা পালতোলা নৌকা সব। বৃষ্টি ধোয়া চাইলতাবাড়ি সাবান কাচা ফকফকে সবুজে হাসছে। ঢেম কুড় কুড় বাদ্যি বাজছে দূরে। বাজারে বিশ্বকর্মা পুজো। সে বাজনায় ওরা শুনতে পাচ্ছিল অন্য কথা—ওরা, মুংকুরুইরা আর জীবন তাপস, সবিতারা।

'দুগ্গা আইয়ে নৌকা বাইয়া'—'দুগ্গা আইয়ে হাতিত্ চইড়া'—ঢাকের আওয়াজে আওয়াজে তারই উচ্চারণ ওরা টের পাচ্ছিল সেদিন। তুখোড় খেলুড়িয়া সবিতা দাইড়া বান্ধা খেলতে গিয়ে 'দাঁড়ি' কাটতে সুর করে বলে ছিল সে কথা কটি-ই।

দুর্গা পুজো এসে গেছে প্রায়। কদিন বাদে কাশের বনে মাতন জাগবে—কুড় কুড় কুড় কুড়—ঢেম্। চাইলতা বন দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানতে চাইবে—সবিতারা কই?

শ্যামল চম্পা দয়ালক্ষ্মী ওরা আজ বেজোড়। 'শ্যাম' নেই। খেলাও বন্ধ। পাঁচ জনায় বেজার মুখে একটু দূরে উঁচু হয়ে ওঠা পাহাড়ের দিকে চায়। ওই উঁচু পাহাড় ওদের কাছে বিষ লাগে। ওখান থেকেই তো 'ওরা' আসে। এসেছিল। জলপাই রঙের পোশাক পরা ভয়ংকর লোকগুলি। তাইতো সবিতা, তাপস, জীবনরা কেউ চলে গেছে শহরে। কেউ গাঁ ছেড়ে অন্য কোথাও।

—না গেলেই পারত হেরা—দাইড়া বান্ধা-কোর্টের দিকে তাকিয়ে ফিস্ ফিসায় চম্পা। দয়ালক্ষ্মী বলে—হ, কত মানুষই তো আছে —। গেছে না।

—হেরারত টেকা আছিল। হেই ডরে না গেলে নইলে যাইতে পারতও না। মুংকুরুই হতাশ কণ্ঠে বলে।

শ্যামল যোগ দেয়—দেখস না আমরা যাইনি?

চম্পা ফিক করে হাসে—তৃপ্তি ভরে মন্তব্য ছাড়ে—ভালোই হইছে—না দাদা? আমরার যে টাকা নাই। ফক্কাঃ—।

বিরষা চম্পার চুড়ো করে বাঁধা পাখির বাসার মতো ছোট্ট খোঁপায় টান মারে—'মিচকি শয়তান—বুড়ির দাদি'

মুংকুরুই ধীরে ধীরে বলে—ঠিকই কইছে চম্পা।

শ্যামল বলে ওঠে—আমরা যাইতাম না। কই যামু? এই চাইলতাবাড়ি ছাইড়া যাইতে পারতাম-ই না। আর হেরার ডরে বাড়ি ঘর কেরে ছাড়ুম? পাহাড়ের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায় সে। তারপর বন্ধুদের দিকে। ওদের চোখে তখন নেই হতাশা। বিষণ্ণতা। দুঃখী দুঃখী চেহারাগুলো বদলে গেছে। আগুন ঝরছে সেখান থেকে।

বিরষা বলে—শয়তানডিরে শেষ কইরা দেঅন দরকার। মুংকুরুই ঠোঁট কামড়ায়—নাইলে ছাড়া ছাড়ি হইয়া যাইব আমরারও। মাগো!

চম্পা-দয়ালক্ষ্মী আরও কাছে সরে এসে জড়াজড়ি করে বসে। যেন কেউ ওদের টেনে হিঁচড়ে আলাদা করে দিতে আসছে। আঙুলের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে জোড় বন্ধ একটি হাত নেড়ে ওরা সবেগে মাথা দোলায়—না, না।

শ্যামল এগিয়ে আসে। মাথায় জব্বর একটা চাঁটি মারবে দাদা—এই আশঙ্কায় দয়ালক্ষ্মীর বাহু বন্ধন থেকে মুক্ত হতে গিয়েও পারে না চম্পা। কেন যে পারে না ওরা কেউ-ই বোঝে না।

শ্যামল কিন্তু মোট্টেও চাট্টি মারে না। দুহাত বাড়িয়ে ওদের দুজনকে কি এক মায়ালু আবেগে জড়িয়ে ধরে।

ফিস ফিসিয়ে বলে—পাগলি।

এরপর বন্ধুদের কাছে সরে যায়। ওদের তিনজনের তখন কাঁধে কাঁধ। হাতে হাত। তিনটি শরীর মিলে যেন একটি শরীর। পাহাড়ের মতো। নীরেট। শক্ত।

চম্পা-দয়ালক্ষ্মী অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। ওদের মনে হয় ওই পাহাড়টা চালিতাবাড়ি পাহাড়। একটা নতুন পাহাড়। পাহাড়টা যেন জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে থাকে ধোঁয়াশা ঘেরা উঁচু পাহাড়ের দিকে। বুক চিতিয়ে।

(পাঁচ)

চালিতা বাড়ির জঙ্গলে আজ চড়ুইভাতি। কানা ভাঙা ছোট্ট ডেকচিতে টগবগ করে ফুটছে আলোচালের ভাত। কী মিষ্টি সুবাস। বুনো আলু টুকরো করছে চম্পা।

পাশের ঝোপে জংলি-বেগুন। ছোটো ছোটো। মুংকুরুই-এর হাতে থোকা থোকা বেগুন। তেতো হলেও খেতে বেশ। তা-ইভাজা হবে। পুটুশ পুটুশ করে তেলে ফুটবে বেগুন—বিচিগুলো ছড়িয়ে পড়বে এধারে ওধারে।

গিন্নি বান্নি দয়ালক্ষ্মীর হাতে বাঁশের তৈরি হাতা। নাড়ছে উথলানো ভাত।

বিরষা-শ্যামল এর হাতে সময় নেই। পাখি শিকারটা আজ জরুরি। মাংস ছাড়া চড়ুইভাতি —ছ্যা! কী লজ্জা। দুজন ডাকসাইটে শিকারি থাকতে। নাক কাটা যাবে যে।

কিন্তু সুয্যি মাথার উপর ওঠে ওঠে। নারকেল মালায় আলু ভাজা, বেগুনভাজা, ডেকের ভাত মুখ উঁচিয়ে চাওয়া। দয়ালক্ষ্মীর বাঁশের চোঙে মায়ের চোখ এড়িয়ে ঢেলে আনা তেল সামান্যই।

মাংসের জোগাড় হয়নি। দয়ালক্ষ্মী বাড়ি গিয়ে দুটো সিঁদল এনেছে। চম্পা এনেছে পেঁয়াজ, দু-কোয়া রসুন, কটা গাছের লংকা।

শিকারিরা মাটিতে অস্ত্র নামিয়ে পরাজিত সৈনিকের মতো ম্লান। এনামেলের কড়াই-এ পেঁয়াজ কুঁচি লালচে ভাজা। নাড়তে নাড়তে চম্পা বলে চাটনি-ই ভালো। পাখি মারলে আমার কষ্ট লাগে। দয়ালক্ষ্মী ঘাড় নাড়ে-হ-কস্ত লাগে আমারও।

ভালোই হইছে তাইলে? বিরষার বিমর্ষ মুখখানি উজ্জ্বল হয়। শ্যামলেরও। মুংকুরুই মুচকি হাসে দেখাদেখি।

—তাইলে তরার রাগ নাই? পাখির মাংস দিতে পারছি না তবু তরা খুশি? শ্যামলের মন থেকে বোঝা একটা সরে যায়। মেঘ কেটে শরতের আকাশটা ঝিলিমিলি হাসে।

বাতাসে এখন সিঁদল চাটনির গন্ধ। আর কোনো গন্ধ নেই। না বারুদের, না ঘর পোড়ার। অবশ্য আরও একটা গন্ধ আছে। কলা পাতায় বাড়া ভাতের গন্ধ, হৃদয় জুড়ে ছলাৎ ছল বইতে থাকা খুশি আর ভালোবাসার গন্ধও।

চালিতাবাড়ির জঙ্গলে এই সব গন্ধ মিলিয়ে এখন একটা স্বপ্ন-মাখা দুপুর। চাদ্দিকে বাতাসিয়া দিনের রুম ঝুম নুপুর। চালিতা গাছের পত্র পল্লবে রোদ্দুরের টাপুর টুপুর।

এ জঙ্গল মুংকুরুইদের। শ্যামল চম্পাদের। এ জঙ্গল বিরষার। দয়ালক্ষ্মীর। ওদের স্বপ্নের আঙিনা—এই চালিতাবাড়ি।

এ আঙিনায় টিয়া-ধনেশ, হরিণ-বনরুই, শাল-চামলের নাচানাচি। দাপাদাপি। হাসাহাসি। মাতামাতি। আলাপি মজলিশ।

এ জঙ্গালে মুংকুরুইদের হুল্লোড় চলে। দস্যিপনা চলে। বালখিল্য ডানা মেলে। মনের সাত রঙা মজা আর আনন্দ ঢেউ তোলে।

দূরে কোথাও ক্ষীণ ঢাকের বোল। পাহাড়ি মোহিনী মা একটু দূরে ঘর লেপবে বলে মাটি কাটছে। কোনো পাহাড়িয়া ঢালে রাখাল বাজাচ্ছে ডাকাতিয়া বাঁশি।

বিরষা-মুংকুরুইদের এবার যে যার ঘরে ফেরার তাড়া। চম্পা-দয়ালক্ষ্মী এক দিনের হেঁসেলের হাঁড়ি-কুড়ি সামলায়। বাড়ি ফেরার তাড়া যে।

চালিতা জঙ্গালে ওদের এগিয়ে দিতে আসে। যেন বলে, কানে কানে মৃদু স্বরে বলে, কাল আবার এসো।

শিশু মনগুলিও কালকের জন্য উন্মুখ হয়ে ঘরে ফিরতে থাকে।

ওদের পেছনে গালিচা, সবুজের। চালিতা জঙ্গালের। যে জঙ্গালে হররোজ ওরা ছাগল ছানার মতো, হরিণ শিশুর মতো, ময়না ছানার মতো যেন মায়ের আঁচল তলের নিবিড় আশ্রয়ে নেচে বেড়ায়। হেসে বেড়ায়। চরে বেড়ায়।
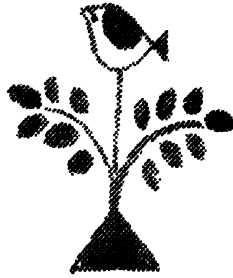
ফাইভ কমরেডস্

বিমল চৌধুরী
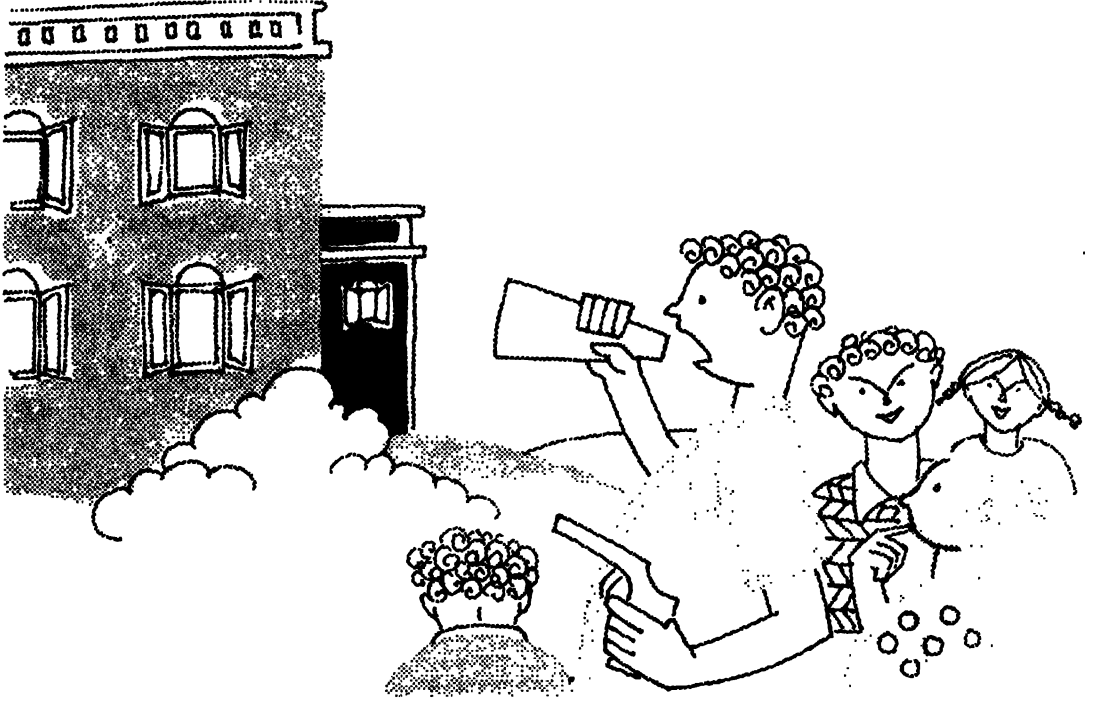
আমার বড়ো দুঃখ, আমার ঠাম্মাকে আমি পাইনি। ঠাম্মার কোলে মাথা রেখে কোনো রাতে রূপকথার রাজপুত্তুর-রাজকন্যে-পক্ষীরাজ ঘোড়ার গল্প শোনার ভাগ্যও আমার হয়নি। তাই আমার নিজের চোখে দেখা, তোমাদের বয়েসি আমার পাঁচজন ছোট্ট বন্ধুর মজার কাণ্ড-কারখানা তোমাদের শোনাচ্ছি। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে।

ইয়া বড়ো বড়ো আগুনের গোলা আমাদের সাধের আগরতলার আকাশে ছুটে আসছে। সেকি স্পিড়! কী বলব। থামাবার কোনো উপায় নেই। পশ্চিমদিক থেকে তীব্র বেগে ছুটে এসেই বাড়িঘরে পড়ছে, মানুষজন আহত হচ্ছে, মরে যাচ্ছে।

না, না। পারমাণবিক - আণবিক বোমা টোমা নয়। এইসব মহা-বোমার আতঙ্ক এখন আমাদের ঘিরে রেখেছে তো! তাই এসব কথা মনে এসে যায়। বুঝলে বন্ধু, আণবিক বোমা যদি পড়ত, তাহলে সে কথা বলার জন্য আমি কি বেঁচে থাকতাম নাকি হে! আমি কেন, আমার বংশ সুধ্ব সবাই যে ছাই হয়ে যেত। আর তোমরা আমার ছোট্ট বন্ধুরা,—যারা আমার এই গপ্পো শুনছ বা পড়ছ, তোমরা কোথায় থাকতে হে বন্ধু! এই সুন্দর পৃথিবীকে আরও সুন্দর করে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তোমাদের কারুর জন্মই হত না যে! আমার বংশের সঙ্গে সঙ্গে, তোমাদের বাবা মা, জেঠু, কাকু, দাদু-দিদা সব কয়েক মুহূর্তে খতম। বাড়িঘর পথঘাট গাছপালা পাখ-পাখালি নদীনালা সব, আমাদের চোখের সামনে যত কিছু দৃশ্যমান, সব কিছু ছাইভস্ম হয়ে পড়ে থাকত। নো-জীবন, নট্-কিচ্ছু।

ওই দ্যাখো, তোমাদের একটা গল্প শোনাতে গিয়ে কী একটা কুৎসিত আশঙ্কায় নিয়ে ফেললাম! কী কর বল? পৃথিবীর নাক উঁচু রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের উত্তর, পশ্চিম রাষ্ট্র সহ আমাদের দেশও—এই ভয়ংকর ধ্বংসাত্মক পাশুপত অস্ত্র তৈরি করে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছে। কার যে কখন হাত চুলবুলিয়ে উঠবে, জিরো আওয়ারে হিরো হবার খোয়াবে সুইচ্‌ টিপে বসে অন্য সবাইকে লেলিয়ে দেবে, খোদায় মালুম। আর ব্যাস্‌,-আমি নেই, তুমি নেই, কেউ নেই, কিচ্ছু নেই, পৃথিবী নামক সুজলা-সুফলা গ্রহটিই বিলকুল লোপাট। তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থলরূপী পৃথ্বী, আটলান্টার মতো তলিয়ে না গেলেও, আপন চিতার ভস্মতলে চাপা পড়ে থাকবে।

তবে আশার কথা, তোমরা এই আণবিক বোমা-টোমা, যুদ্ধ-টুদ্ধর বিরুদ্ধে সচেতন হয়ে ক্রমশ সংখ্যায় বেড়ে উঠছ, তাই তোমরা শান্তি আর শুভপথেই দেশকে, পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

গল্পটি কী শুরু করেছিলাম! হ্যাঁ, বড়ো বড়ো আগুনের গোলা পশ্চিম দিক থেকে তীব্র বেগে এসে আগরতলায় আছড়ে পড়ছে। মানুষ আহত হচ্ছে, মরছে। আগুনের গোলাগুলি আসলে দূরপাল্লার কামানের গোলা। বিশ্বাস করো, আমি সত্যি সত্যি বলছি। আর সেই সময় কোনো একদিন, পাশাপাশি দেববর্মন ভিলা এবং সেনবাড়ির পাঁচ ভাইবোন মিলে আক্কেল-গুড়ুম জাতীয় ব্যাপার স্যাপার করে, দু-বাড়ির বাবা-মাকে চোখের জলে নাকের জলে কাহিল করে ফেলেছিল। অথচ দ্যাখো কী ট্র্যাজেডি, ওরা কিন্তু খুবই ভালো কাজ করেছিল, ব্যাপারখানা এ ধরনের হঠাৎ মোড় নেবে, ভাবা যায়নি। অবিশ্যি সব ভালো, যার শেষ ভালো। শেষতক ওরা পাঁচ ভাই-বোন, বাবা-মায়ের তারিফই পেয়েছিল।

এ বাড়ির দু-ভাই বোন ডোডো-তানিয়া, পাশের বাড়ির টুবলু ফুলকি-বাপ্টু, তিন ভাইবোন, মোট পাঁচজন। এদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটোটি আট, বড়োটি পনেরো বছরের। তোমাদের বয়েসিই হবে কী বল? ক্লাস থ্রি থেকে শুরু করে মাধ্যমিক ছুঁই ছুঁই-এরা. ক্লাশের সেরা তো বটেই, পাঠ্যবইয়ের বাইরের জগৎ সম্পর্কেও যথাসাধ্য টাটকা খবরাখবর রাখার চেষ্টা করে। এবং ওরাই ছিল সেদিনের ঘটনার নায়ক-নায়িকা।

ইতিহাসে তোমরা তো পড়েছ, যদিও এখনও তেমন করে ইতিহাস লেখা হয়নি। আমি সেই উনিশ শ'সত্তর-একাত্তরের কথা বলছি। ত্রিপুরাকে তিনদিকে ঘিরে রাখা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ছকোটি মানুষের কুড়ি-একুশ বছরের প্রচণ্ড অসন্তোষ তখন গর্জমান আগ্নেয়গিরি।

ধর্মের ভিত্তিতে বাংলাভাষাভাষী বাংলাদেশকে ভাগ করে পূর্ব পাকিস্তান করা হল। সেটা উনিশশ'সাত চল্লিশের কথা। আটচল্লিশে জোর করে উর্দু ভাষা চাপাবার বিরুদ্ধে অধিবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। তোমাদের মতো সচেতন ছাত্র সমাজ মাতৃভাষা আন্দোলন গর্জে উঠে, বাহান্নতে নিজেদের প্রাণ বলি দিয়ে সারা দেশে গড়ে তুলল দুর্জয় প্রতিরোধ। শেষতক, সত্তর একাত্তরে প্রচণ্ড মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম হল স্বাধীন বাংলাদেশের।

ওই সময়টা পশ্চিম পাকিস্তানি ফৌজের হিংস্র প্রতিহিংসায় লক্ষ লক্ষ বাঙালি দেশ ছেড়ে আমাদের ছোট্ট রাজ্যে শরণার্থী হয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। হ্যাঁ, আমাদের মোট জনসংখ্যার থেকেও বেশি। ওঁদের মুক্তিযুদ্ধে সহমর্মী আমরা জাতি-উপজাতি সবাই মিলে যথাসাধ্য সহায়তা দিয়েছিলাম। ফলে, দারুণ রাগে যুদ্ধবাজরা, ত্রিপুরা তথা রাজধানী আগরতলাকে দখল-ধ্বংস করার জন্য আমাদের বর্ডারে সৈন্য মোতায়েন করে মাঝে মাঝেই কামানের গোলা বর্ষণ শুরু করে দিল এবং যে-কোনো মুহূর্তে জঙ্গি বোমারু বিমান হানার আতঙ্কেও আমাদের ছিল।

এই ডামাডোলে, আমাদের এই পাশাপাশি দেববর্মন ভিলা-সেনবাড়ি বড়ো মুশকিলে রয়েছে। এক বাড়ির গিন্নি, অন্যবাড়ির কর্তা মাথা আর হার্ট নিয়ে খুবই ভুগছিলেন। কলকাতায় বিশেষজ্ঞের কাছে রেফার করা সত্ত্বেও,

এই অস্থির পরিস্থিতিতে যাওয়াটা আর হয়ে উঠছিল না। কিন্তু মাথা আর হাট নিয়ে ব্যাপার, হঠাৎ গুরুতর মোচড় নিল। কলকাতা না গেলেই নয়। তখন প্রতিদিন ফ্লাইট নেই। দুএকটি বিমান পূর্ব পাকিস্তানের মাটি এড়িয়ে ভারতীয় ভূমিখণ্ডের ওপর দিয়ে প্রচুর ঘুরপথে কলকাতা যাতায়াত করে। তাও অনির্দিষ্ট। তারপর.......বাড়িঘর দূরে থাক্, পাঁচটি ছেলেমেয়ের কী হবে? আট থেকে পনেরোর সেই বীর-এর দল ড্যামকেয়ার। তুড়ি মেরে বলে, —তোমরা চোখবুজে চলে যাও। পুরো চিকিৎসা করে আসবে। দু-একমাস আমরা তোফা কাটিয়ে দিতে পারব। ডোন্ট চিন্তা-ভাবনা।

কী আর করা! দীর্ঘদিনের কাজের লোকেদের, পাড়াপড়শিদের কাছে ছেলেমেয়েদের সঁপে দু-বাড়ির কর্তা গিন্নি যুগল অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে টিকিট জোগাড় করে কলকাতা পাড়ি দিলেন। কিন্তু সংক্ষিপ্ত কদিনের চিকিৎসা। সাজেশান, ওষুধপত্র নিয়ে ফেরা আর হচ্ছিল না। যুধ্বকালীন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় ফ্লাইট প্রায় নেই। সংবাদপত্রে রেডিয়ো ট্রাংকলে গুজবে, আগরতলা অবস্থা জেনে, দু-বাড়ির কর্তা-গিন্নির অবস্থা জটিল ক্রমশ।

এদিকে রাজধানী আগরতলায় সন্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিম দিক থেকে ধেয়ে আসছে কামানের শেল। মানুষ আঘাত পাচ্ছে, মরছে। টান টান উত্তেজনা, আতঙ্ক। স্কুল কলেজ অনিয়মিত বন্ধ। আমাদের সেই ক্ষুদে পাঁচ বন্ধু খবরাখবর কালেকশানে, নানা উপায় উদ্ভাবনে, নিজেরাই নিজেদের গার্জিয়ান হয়ে মহাব্যস্ত।

একসময় মজুর লাগিয়ে দুবাড়ির বিল্ডিং লাগোয়া পুবদিকে 'z' (জেড্) আকৃতি ট্রেঞ্চ খুঁড়ে ফেলল। তারপর....মুলীবাঁশ ধারি দুব্বোঘাসের চাপড়া মায় কচুরিপানা নিয়ে চড়ুই পাখির মতো ব্যস্ত ছোটাছুটি, ট্রেঞ্চের ওপর ছাদ। ঘরের মেঝের ওয়াটার হোল দিয়ে ইলেক্ট্রিক তার, হোল্ডার বালব নিয়ে ট্রেঞ্চ আলোকিত, বসার জায়গা করা, ব্যান্ডেজ তুলো প্লাস্টার ব্লেড কাঁচি ছুরি ডেটল স্মেলিং সল্ট ইত্যাদি মজুদ করা। হেন তেন কত কী। এইসব কাণ্ডকারখানা দেখে দেখে, দীর্ঘদিনের পাহাড়ি-গাঁয়ের কাজের লোকেরা হঠাৎ উধাও। এপার, ওপার, দু-দেশ তখন উত্তেজনায় টান টান। ক্ষণে ক্ষণে সংবাদ পালটাচ্ছে, আগরতলা ধ্বংস হতে যাচ্ছে—মার্কা গুজবে আতঙ্কে কাঁপছে আগরতলা। বাড়িঘর ফেলে বহু মানুষ ছুটছে পাহাড়ে কন্দরে। এমনকি দুবাড়ির পাড়া-পড়শিরাও চলে গেলেন। আমাদের পাঁচ কমরেডকেও সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু ওরা কিছুতেই ভীরুর মতো পালাতে চায়নি।

তখন সন্ধে হলেই মানুষ ঘরমুখো। ঘনঘন পাকিস্তানি কামানের গোলা ছুটে আসছে। মোটরস্ট্যান্ড, বনমালীপুর মেইনরোড লাগোয়া বাড়ি, আমাদের পাঁচ বন্ধুর বাড়ির কাছে বোধজং বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন বাড়ি, দিঘির দক্ষিণ পাড়ের বাড়িতে শেলিং-এ ঘায়েল হলেন অনেকে, মারা গেলেন কজন। এই সময়গুলোতে প্রতিবেশিদের ফাঁকা বাড়িগুলোর নীরবতা, নিজেরা মুখর হয়ে ভরিয়ে তুলছিল ওরা। খাবারের মেনু নিজেরা আলোচনা করে ঠিক করে নেয়, বাজার থেকে জিনিসপত্তর আনা, তৈরি করা, খাওয়া-দাওয়া ধোয়ামোছা সব মিলে মিশে। মাঝে মাঝে তর্কাতর্কি, ঝগড়াঝাঁটিরও কমতি নেই। মুখ গোমড়া, আবার মিল।

ডোডো আর বাপ্টু মাঝে সাঝে কথা শুনিয়ে দেয়। -মাছ না, মাংস না। এসব খেয়ে শরীর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

সবচেয়ে সিনিয়র টুবলু চটে ওঠে। কী, কী খারাপ খাচ্ছিস শুনি? ব্রেকফাস্ট মুড়ি বাতাসা/রুটি মাখন ডিমসেদ্ধ, বিকেলেও তাই। দুপুরে ভাত মুসুর ডাল, আলুভাজা ডিমেরকারি, রাতে আলুভাতে ডিমসেদ্ধ। কলাটা মুলোটা বিস্কিট চকোলেট, এতেও স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছে! বলি, মাছ-মাংসটা কেটেকুটে রাঁধবে কে শুনি। তোরা দুজন। পারবি?

কমান্ডারকে তুষ্ট করে ফুলকি ও সবচেয়ে ছোট্ট তানিয়া। বাপ্টুদা, তুমি বলেছিলে, আমরা দরকার মতো কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, শর্করা মিলিয়ে তোফা খাবার খাচ্ছি, এখন চটছ কেন? মিছিমিছি টুবলুদাদাকে কথা শোনাচ্ছ।

কয়েক মুহূর্ত কিছু ভেবে নিয়ে ফুলকি বলে,—ঠিক আছে, ডো-ডো-দা' আর তুমি মাছ মাংস এনে দাও, তানিয়াকে নিয়ে রেঁধে দেব। দশবছরের ফুলকি, আট-এর তানিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে সম্মতি চায়। ছোট্ট তানিয়া লজ্জায় মুখ নীচু করে।

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে টুবলু অধিনায়কোচিত ঔদার্য দেখায়। ওরে ডোডো, বাপ্টু, তোরা দুজন সন্ধের আগে হোটেল থেকে কিছু মাংস নিয়ে আসবি। রাতে মৌজ করে আলুভাতে, মাংস দিয়ে সবাই ভাত খাব। হল তো! আয় এবার সবাই মিলে হেসে ফেলি। হোঃ হোঃ হিঃ হিঃ হাঃ হাঃ................

এবং এইভাবে আট থেকে পনেরোর এই পাঁচ ভাইবোন, সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক আতঙ্কের পরিস্থিতিকে, মা-বাবা ছাড়া অসীম সাহসে ধৈর্যে পার করতে থাকে। মা-বাবার জন্য আকুল প্রতীক্ষা ওদের মনে, কিন্তু মুখে প্রকাশ করে না ভুলেও। কান্না পেয়ে যাবে যে! সংক্রামিত হবে পরস্পর।

সেদিন বিকেলে গোলবাজার থেকে সওদা নিয়ে ফিরে এসে বাপ্টু শুকনো মুখে বলল, টুবলুদা, বাজারে শুনে এলাম আজ নাকি দারুণ শেলিং হবে তারপর পাকিস্তানি ফৌজ আগরতলা দখল করবে।

গোলবাজারের গুলগপ্পো—উড়িয়ে দেয় লিডার টুবলু।

—বুঝলে টুবলুদা', পরিমল বাড়ির সকলের সঙ্গে চম্পকনগর চলে যাচ্ছে এখনি। আমাকে মোটরস্ট্যান্ডে পেয়ে বলে কিনা-খুউব তো চড়ুইপাখির মতো গর্তের ওপর খড়কুটো জড়ো করে শেলিং আটকাবি, আজ সন্ধের পর বুঝবি ঠ্যালা। সারারাত শেলিং করে আগরতলা ধ্বংস করে দেবে আজ।

সবার বুক দুরুদুরু কেঁপে ওঠে কিন্তু কেউ বুঝতে দেয় না কিছু। শুধু টুবলু তাচ্ছিল্য দেখায়,—ওই পরিমলটা বলেছে। ওতো পায়রা, অন্যের কোটরে আশ্রয় নেয়। আমরা চড়ুই পাখির মতো, নিজেদের আশ্রয় নিজেরা বানিয়েছি। পশ্চিম থেকে গোলা ছুটে আসছে, —আমাদের ট্রেঞ্চের পশ্চিমে পর পর ঘরের চারটে দেয়াল। তার আড়ালে জেড্ টাইপ ট্রেঞ্চ, ওপরে ধারি, বাঁশ দুব্বো ঘাসের চামড়া, কচুরিপানা, দারুণ। বাড়ি ছেড়ে পালাব কেন, অ্যা? বাড়ি ফুল ব্ল্যাক আউট করে রেখেছি, নিকষ অন্ধকার অথচ ট্রেঞ্চের ভেতর আলো। এয়ার রেইড হলে কচু বোমা ফেলবে! বাকি চারজনকে প্রবোধ দিতে গিয়ে টুবলু নিজেকেও একটু ঝাঁঝিয়ে নেয়।

বিকেলটা ঝিম্ মেরে গেছে। এক্ষুণি টুক্ করে সন্ধে নেমে আসবে। তারপরই নিঃশব্দ অন্ধকার আর বুক টিপটিপ আশঙ্কা। ডোডো আর বাপ্টু হাত চালিয়ে আলু ভাতে, ডিমসেদ্ধগুলো খোসা খুলে টুলে টেবিলে ঢেকে রাখছে চটপট। ফুলকি, তানিয়া জলের বোতল গ্লাস তেল নুন লংকা পাশে গুছিয়ে রেখে, টুবলুর দিকে তাকায়। সুইচ-প্লাগ নেড়েচেড়ে টিপে দেখছিল টুবলু। ট্রেঞ্চের লাইট রেখে, ঘরের লাইটগুলো নিভিয়ে ফেলে বলে, দেখেছিস্। এরমধ্যেই সন্ধের আঁধার নেমে এসেছে! সব গুছিয়ে রেখে বই, পত্রিকাগুলো নিয়ে চল্ আমরা ট্রেঞ্চেই গিয়ে বসি। অবস্থা বুঝে রাত আটটা নাগাদ এসে টুক করে খেয়ে যাব।

বাব্লিদের পুষিটাকে দেখছি না! ওকে খাবার না দিয়ে গেলে সারারাত খিদেয় কষ্ট পাবে যে!—করুণ মুখে তানিয়া আবেদন জানায়।

রাখ্ তোর পুষি, সন্ধে পার হয়ে গেছে, আগে গিয়ে ট্রেঞ্চে ঢুকি। খাবার সময় ঠিক এসে যাবে, দেখিস্।—ডোডো তাড়া লাগায়।

ওরা একে একে সবাই গিয়ে ট্রেঞ্চে ঢোকে। তারপর বই পত্রিকায় মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করে রিস্টওয়াচ

টিকটিক..... কুয়াশার ঝুরঝুর...... ট্রেঞ্চের উত্তর মুখ দিয়ে শীতের ঠান্ডা বাতাস ওদের স্নিগ্ধ করে দক্ষিণ মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়......সময় গড়ায়।

এদিক সেদিনই ছেলেমেয়েদের জন্য আকুল বাবা-মায়েরা অনেক চেষ্টা চরিত্তির করে আগরতলামুখী স্পেশাল ফ্লাইটে চারটে সিট জোগাড় করে, অনেক ঘুরপথে থেমে থেমে প্রাক্-সন্ধ্যায় নরসিংগড় এয়ারপোর্টে পৌঁছুলেন। বাড়ি পৌঁছুতে সন্ধে সাড়ে সাতটা। শীতকাল। মনে হচ্ছিল নিশুতি রাত। আশপাশের শূন্য বাড়িগুলোর পাশে নিজেদের খাঁ-খাঁ অন্ধকার বাড়িদুটো দেখে বুকগুলো ছ্যাঁৎ করে ওঠে ওঁদের। মায়েদের শঙ্কিত কান্না, বাবাদের বুক ধড়ফড়। কলকাতা থেকেই নানা গুজবে তিলকে তাল শুনে এসে, এই স্তব্ধ নিথর শূন্যতায় ওঁরা হতবিহ্বল।

ধড়াস ধড়াস বুক নিয়ে ওঁরা ছেলেমেয়েদের নাম ধরে ডাকে। গুটি গুটি এগিয়ে বন্ধ দরজা ঠেলে ঠুলে কোনো সাড়া নেই। এদিক সেদিক, না, কোনো সাড়া শব্দ নেই, শুধু চাপ চাপ অন্ধকার। নিজেদের ধরে রাখতে পারেন না ওঁরা। ছেলেমেয়েদের নাম ধরে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদতে থাকেন মায়েরা। মৈনাক পাহাড়ের মতো মৌন বাবা-রা।

একটু ধাতস্থ হয়ে, আশপাশের খালি বাড়িগুলোতে নজর বুলিয়ে ওঁরা ছোটেন পুব থানায়। দারোগাবাবু শুনে টুনে সান্ত্বনা দেন।—মনে হচ্ছে প্রতিবেশীদের সঙ্গে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। কাল দিনের বেলা খবরাখবর পেয়ে যাবেন। এখন তালা ভেঙে বাড়ি ঢুকুন গিয়ে, শহরে চুরি-টুরি হচ্ছে রোজ। খালিবাড়ি .....মওকা পেয়েছে ব্যাটারা......পথে পথে ঘুরবেন না, আশ্রয়ে চলে যান।

তালা ভাঙতে হল না। গিন্নিদের আঁচলের চাবির গোছায় ডাবল্-চাবি। সবাই মিলে একে একে দুবাড়িতেই ঢুকে লাইট জ্বালিয়ে ঘরগুলো খুঁজে দ্যাখেন। একটি টেবিলে ঢাকা দেওয়া পাঁচ জনের মতো ভাত, ডিম ভাজা। মায়েদের বুক হু-হু করে কান্না এসে যায়। —আহাঃ, খাবার তৈরি করে, প্রতিবেশীদের তাগিদে না খেয়েই ওঁদের সঙ্গে চলে গেছে বাছারা। ঘুরে ঘুরে ওঁরাও এটা-সেটা নাড়াচাড়া করেন, টুপ-টাপ...ঝুপ-ঝাপ......

ট্রেঞ্চের ভিতর আলো জ্বেলে ওরা ফাইভ কমরেড্স্। টুবলু গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করে, —অ্যাই তানিয়া, ঘুমুচ্ছিস্ নাকি রে? সিনিয়র টুবলু—এ কদিনে অভিভাবক সেজে বসেছে।

—না, ক্ষীণ আপত্তি তানিয়ার গলায়, স্বর ভেজা ভেজা। আসলে মা-বাবার কথা মনে এসে, কষ্ট ওকে ভিজিয়ে দিচ্ছে।

আসলে যা', বোঝার, ওরা সব্বাই এক লহমায় বুঝে নেয়। এই অস্বাভাবিক যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি, বেসামাল অবস্থা ওদের ছোট্ট জীবনে এই প্রথম। পাশে পরম আশ্রয় মা-বাবাও নেই।

—আমরা পাঁচজন যে গরমের ছুটিতে দেবতামুড়া-ছবিমুড়া অভিযানে যাব ঠিক্ হয়েছে, এরমধ্যেই ভুলে গেলি তানিয়া! ডো-ডো-র সান্ত্বনা, তখন তো আরও বেশি দিন মা বাবাকে ছেড়ে থাকতে হবে রে।

ফুলকি নিজের দুঃখ উড়িয়ে দিতে চায়, —আর আমরা দুজনে পাহাড়ে জঙ্গলে এদের রান্না করে খাওয়াব, প্রোমিস করেছি না!

টুবলুর কমান্ডিং টোন,—সাড়ে আট-টা বেজে গেছে, খিদে পেয়েছে। শোন, ডোডো, বাপ্টু আর ফুলকি, তোরা গিয়ে ঘরখুলে, ভাত আর ডিমগুলো, দু-তিনটে প্লেট, তিন বোতল জল একটা গ্লাস নিয়ে আয়।

তানিয়া তখন ফুপিয়ে কেঁদে চলেছে সমানে। ধমক, আদর কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না। ওরা তিনজন কুঁজো হয়ে গর্তের সরু মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। টুবলু বলে দেয়,—তালা ভালো করে বন্ধ করে আসবি। এঁটোগুলো এখানেই ওপরে ফেলে রাখব, বুঝলি?

ওরা তিনজন বেরিয়ে দু-মিনিটের মধ্যেই ট্রেঞ্চের সরু মুখে প্রায় ড্রাইভ দিয়ে ঢুকে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে একসঙ্গে বলে ওঠে,—টুবুলদা, সব্বোনাশ। দু-বাড়িতে ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে, চোর ঢুকেছে। সব কিছু নিয়ে পালাবে এখন, জিনিসপত্র নাড়াচাড়ার শব্দ শুনেই ছুটে এলাম তোমাকে জানাতে।

কী বলছিস্? টুবলু আঁতকে ওঠে।

আর সেই মুহূর্তে তানিয়া ভ্যা' করে সজোরে কাঁদতে শুরু করে। সঙ্গে ফুলকিও। সঙ্গীদের উদ্‌বেগ কান্নাকাটিতেও ঠান্ডা মাথায় কয়েক সেকেন্ড ভেবে নেয় টুবলু। হঠাৎ পাশে রাখা দামি টয় পিস্তলটা হাতে তুলে বলে,—তাহলে ওরা একসঙ্গে কয়েকজন এসেছে মনে হচ্ছে। আমরা কিছুই করতে পারব না, চেঁচালেও, কাছাকাছি সব খালি বাড়ি, কেউ এগিয়ে আসবে না। তার চেয়ে, ... টুবলু পত্রিকার কাগজ তুলে মিনি-মাইক সাইজ চোঙ্গা তৈরি করে, পিস্তলটায় ফাঁকা আওয়াজের কার্তুজ ভরে, হামাগুড়ি দিয়ে গর্তের মুখে উঠতে উঠতে বলে যায়,—তোরা কেউ বেরুবি না বলছি, সাবধান। আমার অর্ডার। আমি দেখছি......কমান্ড দিয়ে কমান্ডারের মতো টুবলু বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ছিঁচ্‌কাঁদুনে তানিয়া বাদে, বাপ্টু, ডোডো, ফুলকি হুড়মুড়িয়ে ট্রেঞ্চের মুখের কাছে দলা পাকিয়ে জড়ো হল। ওদের বুকে তখন উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ তোলপাড়। একা যেতে না দিয়ে, টুবুলদার সহযোগী হবার একান্ত ইচ্ছে ছিল ওদের। কিন্তু কমান্ডারের কমান্ড!

দুবাড়ির মাঝখান থেকে টুবলুর গলা ভেসে এল, বাড়ির ভেতরে যারা আছো, এক্ষুনি বেরিয়ে এসো। শিগ্‌গির। ......পর মুহূর্তে, পিস্তলের গুলির শব্দে চারদিকের নিস্তব্ধতা থরো থরো কেঁপে ওঠে। ....পুলিশ বলছি...এক্ষুণি বেরিয়ে এসো.....নয়তো দরজা ভেঙে আমরা ঢুকব.........

ট্রেঞ্চের মুখের বাইরে বসে বাপ্টুরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে টুবলুর কথা। মাত্রই কয়েক কদমের ফারাক তো! কিন্তু ওরা বেওকুফ হয়ে যায় কাগজের চোঙ্গা থেকে বেরিয়ে আসা অচেনা কমান্ডিং টোন শুনে। বুক থেকে দলা পাকিয়ে আবেগ উথ্‌লে ওঠে, টুবুলদা'কে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হয় ওদের।

কিছুক্ষণের শুন্‌শান্ নিস্তব্ধতা। তারপর বাড়ির ভিতর থেকে কেউ বলে ওঠে.....আমরা দরজা খুলে বেরুচ্ছি....গুলি করবেন না......প্লিজ......

—বা-বা! .....বাবা তুমি!! চেঁচিয়ে উঠেই কী করবে ভেবে না পেয়ে টুবলু বরফের পুতুল হয়ে গল্‌তে থাকে। আর............

শুধু কিছু শব্দ। দুমদাম দরজা খোলার............দ্রুত বেরিয়ে আসা কিছু পদশব্দ.........আর পেছন ট্রেঞ্চ থেকে পড়ি-মরি ছুটে আসে চারজোড়া আটটি পায়ের শব্দ................

কমান্ডার টুবলু কমান্ড ভুলে একটা বাচ্চা ছেলের মতো, ঝাঁপিয়ে আসা মায়ের বুকে মুখ লুকোয়।

চোখ

কিশোররঞ্জন দে

আমার চোখের রং ক'টা। এককথায় বিড়ালচোখ। আমাদের পরিবারে ঠাকুমা, ছোটোকাকা আর আমার চোখই বেশি ক-টা। তা, ছোটোবেলায় আমার খেলার সাথীরা আমাকে 'বিড়ালচোখ', 'বিড়ালচোখ' বলে খেপাত। খেপেও গেছি দু-একদিন।

ছোটোকাকা শুনে বললেন, "দূর বোকা। ভাগ্য কত ভালো যে আমাদের বিড়ালচোখ। আমরা রাতের অন্ধকারেও দেখতে পাই। ওরা পায়?"

কথাটা খুব অপছন্দ হল। আর খেপতাম না বলে খেপানো বন্ধ হয়ে গেল। এরপরে অনেকদিন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল—"রাতে অন্ধকারে আমি দেখতে পাই।"

বড়ো হয়েও আমার দেখাটা অন্যরকম। জীবনকে আমি অন্যভাবে দেখি। যে-কোনো সমস্যা আমি তলিয়ে দেখতে ভালোবাসি। এই যেমন, চার-পাঁচ বছর আগে ১৯৮০ সালে ত্রিপুরায় যা হয়ে গেল—আমার দেখার সঙ্গে দেখি অনেকের দেখা মিলে না। কলেজ থেকে বেরিয়ে আমি আগরতলায় একটা সংবাদপত্র অফিসে চাকরি করছি।

আরেকটা কথা—আমার মতো যাদের "বিড়ালচোখ' তাদের বড়ো আপন লাগে। এই যেমন মোহনদা। বন্ধুর দাদা হলেও আমার নিজের দাদা থেকে বেশি ভালোবাসি। মোহনদা আমাকে ছোটভাইয়ের মতো দেখে। 'বিড়ালচোখের' মোহনদা পুলিশের সাবইন্সপেক্টর। মানুষটার স্বভাব চরিত্রের সঙ্গে পুলিশের চাকরির কোনো মিল নেই।

অনেকটা "বিশ্রাম নেব" আর "জায়গা দেখবো" এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আগরতলা ছেড়ে কদিন হল মোহনদার কাছে এসেছি। আসাম-আগরতলা সড়ক থেকে একটা অপ্রশস্ত রাস্তা কুড়ি কিলোমিটার এগিয়ে মোহনদার কর্মস্থলে এসেছে।

ছোটো থানাটার সবার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে। থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে সবাই বড়ো বাবু বলে। তিনি ছাড়াও মোহনদার অন্য সহকর্মীরা আছেন। আর আছে কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশ দলের কুড়িজন জওয়ান। সবার সঙ্গে হৃদ্যতা হয়ে গেছে। তবে এদের সুবেদার সি পি সিং মানুষটা বেশ নিষ্ঠুর। ত্রিপুরার মানুষজনকে বেশি পছন্দ করেন না। তার কথায় ও কাজে স্পষ্টই ধরা পড়ে এটা।

এখন বেলা এগারোটা নাগাদ আমরা ইঁটের রাস্তাটা ধরে হাঁটছি। এ রাস্তায় জিপ চলে। ছোটো বাসও চলে। বড়োবাবু, মোহনদা আর জনাদশেক কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত বাহিনীর জওয়ানকে নিয়ে জায়গা দেখতে বেরিয়েছেন। আমি এসেছি বেড়াতে। মোহনদাকে পুলিশের কাজকর্ম সম্পর্কে নানারকমের প্রশ্ন করে বিব্রত করতে চাই নি।

কোনো বিপজ্জনক বা গোপন অভিযানে যাচ্ছেন না বলে বড়োবাবু আমাকে সঙ্গে নিয়েছেন। থানা থেকে বেরোবার মুখে আমাকে ডেকেছেন ঃ

—"কিহে সাংবাদিক? কি করবে এখন।"

—"কিছু নাতো।"

—"যাবে নাকি আমাদের সঙ্গে?"

'কোথায় যাবো' 'কেন যাবো' জিজ্ঞেস না করেই আমি রাজি হয়ে গেছি। মোহনদার বোধ হয় আমাকে সঙ্গে নেয়ার তেমন ইচ্ছা ছিল না।

—"হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা চলুন। আপনারা বেরিয়ে যাচ্ছেন। আমি একা একা বসে থেকে করবটা কি?"

—"হাঁটতে হবে কিন্তু। হয়তো চার-পাঁচ ঘণ্টা হাঁটব আমরা।"

—"তাতে কী? আমি সারা আগরতলা শহর হেঁটে বেড়াই।"

—"আরে তোমার আগরতলার সৌখিন রাস্তা নয় রে ভাই। এ পাহাড়। রাস্তাই নেই!"

যাহোক আমি চলেছি তাদের সাথে। হাঁটতে হাঁটতে ওদের কথাবার্তা থেকে একটু বুঝতে পারছি—ওরা যাচ্ছেন একটা মানচিত্র তৈরি করতে। এই থানা এলাকায় কোনো কোনো সম্ভাব্য রাস্তা উগ্রপন্থীরা গোপনে চলাফেরার কাজে ব্যবহার করতে পারে সেটা আন্দাজ করে তার মানচিত্র এঁকে আগরতলা পাঠাতে হবে। পুলিশের বড়কর্তার নির্দেশ। বড়োবাবু নিজে আঁকার কাজটা করছেন। তাঁর মোটা ডায়েরি থেকে মাঝেমাঝে একটা ড্রইং সিট বের করে আঁকছেন, নোট নিচ্ছেন। আমার বেশি কৌতূহল দেখানো উচিত নয়। ইটের রাস্তা থেকে কখনও পায়ে হাঁটা পথে লুঙ্গায় নামতে হচ্ছে। পাহাড়েও চড়তে হচ্ছে। বেশ কষ্টকর। কেন্দ্রীয় পুলিশের জওয়ানেরা কাঁধে ভারী অস্ত্র নিয়ে হাঁটছে। মোহনদাদের থানায় অবশ্য কোনো উগ্রপন্থী তৎপরতা নেই। তবু সবাই সতর্ক। প্রায়ই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরামর্শ করছেন নিজেদের মধ্যে। এতক্ষণ হাঁটলাম লোকজন বড়ো একটা পাইনি।

দুপুর যখন চলে যাচ্ছে মোহনদারা একটা পায়ে হাঁটা রাস্তার মুখে দাঁড়ালেন।

—"যাবেন না কি স্যার? এদিকে তিন-চার কিলোমিটার দূরে জুমিয়াদের একটা গ্রাম আছে। আমি একবার গেছিলাম।"

বড়োবাবু ইতস্তত করছিলেন।

—"জুমিয়া গ্রামগুলো খুব অস্থায়ী হয়। এ বছর আছে তো সামনের বছর নাও থাকতে পারে। এরা জায়গা বদলায়।"

আমার ক্লান্তি লাগছিল খুব। বিরক্ত হচ্ছিলাম। জায়গা দেখব, ত্রিপুরার প্রকৃতির মধ্যে হাঁটব বলে চলে এসেছিলাম। কিন্তু জঙ্গলে হাঁটা খুব কষ্টকর।

এই পুলিশ অফিসাররা খুব পরিশ্রমী। মানচিত্রে তৈরির করার কাজটা তাঁরা নেহাৎ দায়সারাভাবে করতে চাইছেন না। থানা থেকে জিপ নিয়ে বেরোতে পারতেন। যেখানে যেখানে জঙ্গালে ঢুকছেন সেখানে সেখানে জিপটা না হয় ইটের রাস্তায় অপেক্ষাই করত। গত তিন চার ঘণ্টা এঁরা হেঁটেছেন। একটু আগে একটা ছোট্ট বাজারে চা বিসকুট খেয়ে আধঘণ্টার মতো বিশ্রাম নিয়েছি। বাজার বলতে একটা চায়ের দোকান, রান্নার লাকড়ি বিক্রির শেড্। আর আছে যাত্রীদের অপেক্ষা করার জায়গা।

অবশেষে ঠিক হল জুমিয়া গ্রামটাতে যাওয়া হবে। ওদের কাছ থেকে কোন তথ্য পাওয়া যেতে পারে। আর আজকের মতো কাজ এখানেই শেষ করব আমরা।

ভাগ্য ভালো। গ্রামটা এখনও আছে। আর তা রাস্তা থেকে দুই কিলোমিটারেরও কম দূরত্বে হবে। আমরা সেখানে পৌঁছালাম।

আমি গেছিলাম একটা অনীহা নিয়ে। কিন্তু পৌঁছানোর পনের মিনিটের মধ্যে আমরা এমন একটা তথ্য আবিষ্কার করলাম যা চমকে দেবার মতো। এই গ্রামটাতে মাত্র পাঁচটা পরিবারের বাস। এরা জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। অতি দরিদ্র গ্রাম। কঙ্কালসার দেহ। নারীপুরুষ শিশু দূর থেকে ভয়ে ভয়ে দেখছে। মোট জনসংখ্যা আটাশ। এই আটাশজনের মধ্যে আটজন অন্ধ। সবচেয়ে ছোটোজনের বয়স তিনমাস। বড়োটির এগারো বছর। এরা সবাই ছেলে।

খবরটা অবিশ্বাস্য। বারবার জিজ্ঞেস করেও খুব বেশি খবর জোগাড় করা যাচ্ছে না। পুলিশ দেখে সবাই ভয় পাচ্ছে। আমরা সবাই হতবাক। এমন হতে পারে? গ্রামের আটাশ জনের মধ্যে আটজন অন্ধ। কেন? শতকরা কতজন অন্ধ? শিশুদের অর্ধেকই অন্ধ এ কী রকমের অভিশাপ। এদের চোখ। দেখলেই ভয় হয়। লাল। ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

অনেক চেষ্টা করে মোহনদা একজন বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে কথা বলেছেন।

—"কতদিন যাবৎ এরা চোখে দেখে না?"

—"ছোটোবেলা থেকে স্যার।"

—"ডাক্তারে কাছে নিয়ে গেছ?"

বৃদ্ধটি ভয় পেলেন।

—"না স্যার।"

—"শোনো। কোনো ভয় নেই। আমার নাম মোহন দারোগা। নাম মনে থাকবে?"

—"হ্যাঁ সার।"

—"কাল তোমরা যে-কোনো দুজন এই বাচ্চাদের নিয়ে আমার কাছে যাবে। থানায়। বাসে যাবে। আমি ভাড়া দিচ্ছি। কত পড়বে ভাড়া?"

এদের ভরসা হয়েছে মনে হল। সাহায্য করার জন্য ডাকা হচ্ছে। বৃদ্ধটি আরও দুজনের সঙ্গে পরামর্শ করে বললেন—

—"ষোলো টাকা স্যার।"

—"ঠিক আছে। আমি এদের ডাক্তার দেখাব। যাবে কিন্তু। না হলে আমি আবার আসব।"

—"না স্যার। যাবো আমরা।"

মোহনদা পকেট থেকে টাকা বের করে দিচ্ছিলেন। সবাই দেখছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরাও। সুবেদার

সি পি সিং মোহনদার কাছে গিয়ে কানে কানে কিছু বলল। দূর থেকে শুনতে পেলাম না। মোহনদা হাত নেড়ে তাকে না করলেন।

আমি বিরক্ত হলাম সুবেদারের ওপর। লোকটা কি কিছুই বুঝতে পারে না। একটুও মায়াদয়া নেই?

মোহনদা বৃদ্ধকে কুড়িটাকা দিলেন। কাল বাচ্চাদের নিয়ে যেন অবশ্যই থানায় যায়—এ কথাটা বারবার বলে আমরা ফিরতে শুরু করলাম। এই নতুন পাওয়া তথ্য আমার সংবাদপত্রের একটা দুর্ধর্ষ খবর হয়ে যাবে। আমি খুব উত্তেজিত হলাম।

যখন ফিরে আসছি ত্রিপুরার পাহাড়ে সূর্য ঢলে পড়েছে। বাঁশঝাড় আর পাহাড়ি কলাগাছের মাথায় এক কালো ছায়া নেমে এসেছে। দুটো পাখি গাছের উপর দিয়ে ভেসে আসছে। তাদের ডানা নাড়া দেখতে দেখতে মনটা হারিয়ে যায়। মনে হয় দাঁড়িয়ে একটু দেখি।

আমার খুব ইচ্ছে ছিল সি পি সিং মোহনদার কানে কানে ঠিক কী বলে ধমক খেয়েছিলেন তা জানার। কিন্তু মোহনদাকে জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেলাম না। বড়োবাবুকে অনুরোধ করে সেদিন রাতেই আমি আগরতলায় ফিরে এলাম। তাজা তাজা খবরটা লিখতে হবে। পুলিশের জিপ আমাকে আসাম-আগরতলা সড়কে পৌঁছে দিল। ট্রাক পেয়ে গেলাম।

ইচ্ছে ছিল দু'একদিনের মধ্যে মোহনদার কাছে আবার যাব। কারণ অন্ধ শিশু কিশোরেরা আমাকে টানছিল। তবু ফিরে যেতে দিন সাতেক সময় চলে গেল। গিয়ে শুনলাম সেই বৃদ্ধ অন্ধ শিশুদের নিয়ে তার পরদিনই মোহনদার কাছে এসেছিলেন। থানা থেকে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে মোহনদা ওদের নিয়ে নিজে গেলেন। ডাক্তারবাবু খুব দরদ দিয়ে পরীক্ষা করলেন। বললেন—"ম্যাল নিউট্রিশন। অপুষ্টিতে হয়েছে এরকম।"

—"শহরে চক্ষু বিশেষজ্ঞকে দেখালে ভালো হত। তবু মনে হচ্ছে তিনজন আর কোনোদিনই দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে না। বাকি পাঁচজন দীর্ঘ চিকিৎসার পর একেবারে স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরে না পেলেও—মোটামুটি দেখতে পাবে।" হাসপাতাল আর নিজের কোয়ার্টার থেকে তিনি বেশ কিছু ঔষধ বের করে দিলেন। প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে মোহনদা কিছু ঔষধ স্থানীয় বাজার থেকে কিনলেন। বাকিটা পরে আগরতলা থেকে আনালেন। তাঁর নিজের পকেট থেকে তিনশো টাকার মতো গেল। ঔষধ খাবার নিয়মটা ওদেরকে বারবার বুঝিয়ে বলা হয়েছে। আর মাসখানেক পরে অবশ্যই যেন তারা আবার বাচ্চাদের নিয়ে আসে হাসপাতালে। ডাক্তারবাবু রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। আগরতলায়। পরে আরো সাহায্য করা যাবে।

খুব ভালো লাগল শুনে। পুরো তথ্যাদি দিয়ে আমার সংবাদপত্রে সংবাদটা পরিবেশিত হয়েছে। ভারতের পুলিশ তো মানুষের কাছে হাত পাততেই অভ্যস্ত বলে আমাদের ধারণা। ওদের হাত দিয়ে কিছু দেবার খবরটা চমকে দেবার মতো।

এবারে এসে দেখলাম সি পি সিং-এর দলটা নেই। অন্য আরেকটা দল এসেছে থানায়।

—"আচ্ছা মোহনদা। একটা কথা বল তো। তুমি যখন পাহাড়ি গ্রামটাতে টাকা বের করে দিচ্ছিলে—আরে বাসভাড়া দিচ্ছিলে যখন—সি পি সিং তোমার কানে কানে কী বলছিল? তুমি যে হাত নেড়ে না করে ছিলে। ও তো স্থানীয় লোকেদের একেবারেই পছন্দ করত না।"

মোহনদা হাসলেন।

—"কী বলেছিল জানিস? ও নিজের তরফ থেকে টাকা দিতে চেয়েছিল। আমি না করে দিয়েছিলাম।

পরে সি পি সিংরা যাবার সময়ে দলের সবাই চাঁদা তুলে বড়োবাবুকে দিয়ে গিয়েছিল অন্ধ পাহাড়িদের সাহায্য করার জন্য। সুবেদারেরই নাকি সবচেয়ে উৎসাহ ছিল একাজে।

আমার বিড়ালচোখ সুবেদারকে দেরিতে চিনল। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

হরেকৃষ্ণ

চন্দন আচার্য
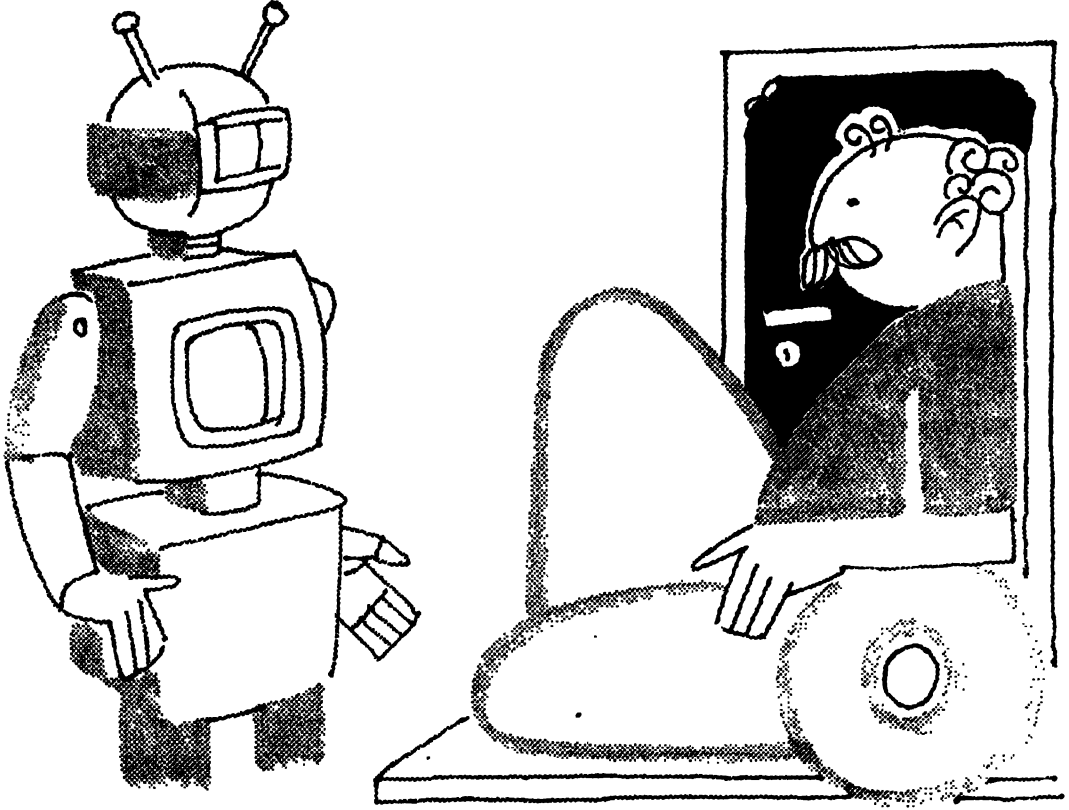
সন্তোষ রায়-খুব দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছেন বেশ কয়েকদিন ধরে। নিজের দেখভাল এবং ব্যবসার হিসেব পত্র দেখার জন্য একজন বিশ্বস্ত লোক দরকার। অনেক রকম ব্যবসা তাঁর, অনেক টাকার লেনদেন। টাকা বাড়াতে অনেক সময় টাকা লুকিয়েও রাখতে হয়, যার হিসেব সরকারের ঘরে থাকে না, যাকে বলা হয় কালো টাকা। আর আগের লোকটি এরকম কিছু টাকা নিয়ে পালিয়েছে। থানা পুলিশ করলেন না ভয়ে, যদি কালো টাকার গোপন কথা ফাঁস হয়ে যায়।

সন্তোষ রায় লোকটি খুব কৃপণ। হাতে দিয়ে সহজে এক পয়সা গলতে চায় না। পয়সা বাঁচবে বলে শাস্ত্রে যত রকম উপলক্ষ আছে পালন করেন। বিয়ে থা করেননি। কাজের লোকও রাখেন না। যখন সাংঘাতিক রকমের খিধে পায়, নিজেই দুটো সিদ্ধ ভাত ফুটিয়ে নেন। কারও সাথেই খুব একটা মেলামেশা করেন না আপ্যায়নের ভয়ে, কিংবা যদি টাকা পয়সা চেয়ে বসে। ওঁর কৃপণতার জন্য লোকে ওঁকে সন্তোষ রায় না বলে বলত কঞ্জুষ রায়।

কৃপণ লোকেরা খুব হিসেবি হয়, সন্তোষ রায়ও তাঁর ব্যতিক্রম নন। তিনি সব সময়ই হিসেবের যোগ বিয়োগ করে বলেছেন। একটি লোক রাখলে মাসে মাসে বেতন দিতে হবে, কয়েক দিন পরই হয়তো বেতন বৃদ্ধির দাবি তুলবে। এছাড়া বিশ্বাসী হবে কি না কে জানে, যদি বেইমানি করে। টাকা চুরি করে পালায়। নাকি রোবট

কিনেই আনবেন। একবার কিনে আনতেই না খরচ, পরে আর মাসে মাসে বেতন দিতে হবে না। এখন তো রোবট সূর্যের আলোয়ও চার্জ হয়, বিদ্যুৎ খরচও নাই। আর রোবট তো মানুষ নয় লোভ থাকবে, সুতরাং চুরি বেইমানি করবে না। বরং একটি মানুষ থেকে অনেক বেশি সুযোগসুবিধা পাওয়া যাবে। অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলেন একটি রোবটই চাই, লোক নয়। খোঁজখবর নিয়ে বেশ বড়ো একটি রোবটের দোকানে গেলেন। চারদিকে ছোটো বড়ো হরেক রকমের রোবট। এত রকমের রোবট যে হয় কে জানত। দোকানদার একগাল হেসে সন্তোষ রায়কে আপ্যায়ণ করে—বসুন। কী চাই আপনার?

—আমি একটি রোবট কিনতে চাই।

—বেশ তো, কোন্‌টি পছন্দ হয় আপনার?

এবার দ্বন্দ্বে পড়ে যান সন্তোষ বাবু ঠিক কোন্‌টি যে পছন্দ করব বুঝতে পারছি না।

—ঠিক আছে, আমি আপনাকে সাহায্য করছি, বলুন কী কী পেতে চান রোবট থেকে?

—আমার দেখাশুনা, বাড়িঘরের নিরাপত্তা, এছাড়া ব্যবসায়িক লেনদেন সংক্রান্ত কাজে ও আমাকে সাহায্য করবে।

—আছে আমাদের কাছে এমন রোবট, ঠিক যেমনটি চাইবেন। আপনার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা, সময় মতো ঔষধ পথ্য দেওয়া, ঘরবাড়ি পাহারা দেওয়া, ব্যবসা সংক্রান্ত চিঠিপত্র লেখা, হিসাব রাখা, যা যা বলেন সব কিছুই মডেল ফাইভ রোবট থেকে পাবেন। আবার মডেল ফাইভ ওর মধ্যেও হাইফাই কোয়ালিটির একটিমাত্র রোবট এনেছে। এর একটি বিশেষ গুণ আছে, আপনার ঘুম না এলে, আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে।

আজকাল সন্তোষবাবু ঘুমে বেশ কষ্ট পাচ্ছেন, ঘুম প্রায় হয় না, বললেই চলে, ঘুমের আশায় বিছানায় এপাশ ওপাশ করে রাত কাটান। মনে মনে ভাবলেন, ও রোবটটিই নেওয়া উচিত উপরি পাওনা হিসেবে ঘুমটুকু মিলবে।

—এর দাম কত?

—এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা।

—এত টাকা! থমকে যান সন্তোষবাবু।

এত কিছু সেবার বিনিময়ে তো দাম কমই। কয়েকদিন পরই বাজেট, তখন যে দাম বেড়ে কত হবে কে জানে। অবশ্য যদি টাকার অসুবিধে হয় পাঁচ কিস্তিতে টাকাটা দিতে পারেন।

—দাম কিছুটা কম হয় না?

না মশাই, একদর।

কিছুক্ষণ ভেবেটেবে কিনতে রাজি হলেন, তবে টাকাটা পাঁচ কিস্তিতেই দেবেন।

দোকানদার দু'টো কোল্ড ড্রিংকসের অর্ডার দিয়ে বললেন—আপনি একটি নাম ঠিক করবেন, যে নামে ওকে ডাকবেন। আর কখনও ওর সামনে মিথ্যে কথা বলবেন না, বকাবকি কিংবা আঘাত করবেন না। যদি কোনো সমস্যা হয় আমাদেরকে জানাবেন। চব্বিশ ঘণ্টার দুঘণ্টা সময় দেবেন সোলার চার্জ এবং কম্পিউটারের বিশ্রাম এর জন্য।

বাড়িতে নিয়ে এলেন। রোবটটিকে, নাম রাখলেন হরে কৃষ্ণ। বেশ বিনয়ী এবং চটপটে। যে-কোনো কাজই

একবার বলে দিলে আর বলতে হয় না, ঠিক সময়ে নিখুঁতভাবে কাজটি শেষ করে। রান্না—চা তৈরি করা এসব করতে পারে না, এছাড়া ঘরের সব কাজেই পারদর্শী, ব্যবসায়িক চিঠিপত্রের জবাব সন্তোষ বাবুর কথামতো টাইপ করে দেয়, হিসাবপত্র লিখে রাখে, সমস্ত রাত্রি জেগে থাকে এবং সন্তোষ বাবুকে সময় মতো ঘুম পাড়িয়ে দেয় ঘুম পাড়ানি অদ্ভুত একটা সুরের সাহায্যে।

হরেকৃষ্ণের কাজকর্মে সন্তোষ বাবু খুবই খুশি, এককালীন এত টাকা বের হয়ে যাওয়ায় মনের ভিতরে যে টাকার জন্য কষ্ট ছিল, সেই কষ্টটাও দুর হয়ে গেল। এখন গভীর ঘুম হয়, এছাড়া হরেকৃষ্ণ খুব তাড়াতাড়ি কাজকর্ম শেষ করে দেয়, তাই বিশ্রামের সময়ও পাওয়া যায় অনেক।

এত খুশিই যে ভাবেন একটা কিছু দেবেন হরে কৃষ্ণকে। কী দেওয়া যায়? মানুষ হলে তো অনেক কিছুই দেওয়া যেত। জিজ্ঞেসও করেন—তোমার কি কিছু চাই?

খুব বিনয়ের সঙ্গে জবাব দেয়—ধন্যবাদ মহাশয়, আমার কিছু চাইনে, বেশ কিছুদিন পরের কথা। সেদিন রবিবার। দোকানপাট বন্ধ। সন্তোষবাবু বসে ব্যবসার কাগজপত্র দেখছেন, পাশে দাঁড়িয়ে হরেকৃষ্ণ, এমন সময় একটি ছেলে এসে হাজির, রোগা-লম্বা চেহারা, চোখ দুটি বুদ্ধিদীপ্ত এবং তীক্ষ্ণ, দেখলে বোঝা যায় উঁচু ক্লাসের ছাত্র। সন্তোষ বাবুকে পায়ে ধরে প্রণাম করে বলল জ্যেঠু, এবার আমি এন্ট্রান্স পাস করে ডাক্তারিতে চান্স পেয়েছি।

—বেশ, ভালো, ভালো। গলায় তেমন একটা খুশির সুর নেই।

—জ্যেঠু, পড়তে আমায় দিল্লি যেতে হবে, যাতায়াত ভাড়া, বিছানা ইত্যাদি মিলিয়ে হাজার দশেক টাকা লাগবে, যদি সাহায্য করেন।

—কী বলছিস তুই? এতটাকা এখনো আমি এক সঙ্গে দেখিনি, দুদিন পরে আসিস, যদি পারি একশত টাকা দেব।

ছেলেটির মুখ ম্লান হয়ে গেল, কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বলল—চলি জেঠু। ছেলেটি চলে যায়, সন্তোষ বাবু রাগে গজ গজ করতে থাকেন। —সবাই দুহাতে খরচ করে ভালোমন্দ খাবে, পরবে, টাকা জমাবে না। আমি কষ্ট করে টাকা জমাব সেদিকেই সবার চোখ। সন্তোষবাবুর গোপন লকারে এখনও দু'লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা আছে, সে হিসাব হরে কৃষ্ণ জানে, তাই এত বড়ো মিথ্যা কথায় তার মেইন কম্পিউটার উত্তপ্ত হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। সন্তোষ বাবু ডেকেও সাড়া পেলেন না।

ঘণ্টা দুয়েক পর কিছু ছেলে এসে উপস্থিত। —দাদু, আমরা গুজরাটে যা ভূমিকম্প হয়ে গেল, সে জন্য চাঁদা তুলছি, আপনাকে পাঁচশ' টাকা চাঁদা দিতে হবে।

সন্তোষ বাবু তাদের দাবি শুনে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যান আর কি।

—কত বললে তোমরা, পাঁচ টাকা?

ছেলেরা হেসে বলল না দাদু, পাঁচশ' টাকা।

—ইয়ার্কি পেয়েছ? টাকা কি গাছের পাতা, গাছ নাড়া দিলেই ঝরে পড়বে। সামান্য ব্যাবসা করে চলি, জান ব্যাবসাবাণিজ্যের অবস্থা, বেচাবিক্রি নেই, আমদানি নেই। বুঝলে লোকসান চলছে, পুঁজি ভাঙিয়ে এখন খাচ্ছি। আচ্ছা, পাড়ার ছেলে তোমরা, দুদিন পরে এসো, পাঁচ টাকা নিয়ে যেও।

—না দাদু, পাঁচ টাকা লাগবে না, রেখে দিও। ভবিষ্যতে তোমার কাজে লাগবে। ছেলেরা চলে যায়।

সন্তোষ বাবু এখনও মিথ্যে কথা বললেন। হরে কৃষ্ম জানে, গতকালই পেঁয়াজ আর সরিষা তৈল বেশি দামে বিক্রি করে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা লাভ হয়েছে। এবারও তার মেইন কম্পিউটার উত্তপ্ত হয়ে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল।

এইদিন রাত্রে একটু তাড়াতাড়ি ঘুমোতে গেলেন। কিন্তু আজ হরেকৃষ্ম ঘুম না পাড়িয়ে সম্মোহিত করে ফেলল সন্তোষ বাবুকে।

—সন্তোষ, তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

—হ্যাঁ, বল।

—যে ছেলেটি টাকা চাইতে এসেছিল সকালে, ওর নাম কী?

তোমার আত্মীয়?

—ওর নাম অনুপ, আমার আপন ছোটো ভাইয়ের ছেলে।

—আমি চাই ওকে তুমি দশ হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করো।

—ঠিক আছে দিয়ে দেব।

—এখনই দিয়ে দাও।

—ঠিক আছে।

—আর শোন, পাড়ার ছেলেদেরও পাঁচশ' টাকা দিয়ে দাও।

—তবে আমি টাকাটা নিয়ে আসি, তুমি হরিচরণকে দিয়ে—পাঠিয়ে দাও।

—আচ্ছা।

হরেকৃষ্ম টাকাটা গোপন লকার থেকে বের করে এনে বাড়ির ভাড়াটে হরিচরণকে ডাক দেয়।

—তুমি, বল এই দশ হাজার টাকা অনুপকে আর এই পাঁচশ টাকা পাড়ার ছেলেদের এখনই দিয়ে আসতে।

—হরিচরণ, দশ হাজার টাকা অনুপকে আর পাঁচশ' টাকা পাড়ার ছেলেদের দিয়ে এস।

বিস্মিত হরিচরণ টাকাটা নিয়ে বের হয়ে যায়। হরেকৃষ্ম সন্তোষ বাবুকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

প্রতিদিন সকালে সন্তোষ বাবু ধূপধুনা দিয়ে গোপন লকারের টাকাগুলি নেড়ে চেড়ে দেখেন। পরদিন সকালে টাকার বান্ডিল কম দেখে সন্তোষবাবুর মাথায় হাত। দশ হাজার পাঁচশ' টাকা কম। কী হল? চিৎকার করে হরেকৃষ্মকে ডাকেন। কিন্তু এই সময় তো হরেকৃষ্মর বিশ্রামের সময়। তাই কোনো সাড়া নেই। দৌড়ে আসে হরিচরণ।

—কি হয়েছে?

—আমার টাকা চুরি গেছে।

—কত?

—দশ হাজার পাঁচশ'।

—কত টাকার নোট ছিল?

—সব পাঁচশ' টাকার।

এবার চোখ কপালে ওঠে হরিচরণের। গতকাল-ই তো সন্তোষ বাবু নিজের হাতে টাকাটা দিয়ে বলেছিলেন-টাকাটা অনুপ আর পাড়ার ছেলেদের যেন দিয়ে আসে। সবই ছিল পাঁচশ' টাকার নোট। আর এখন বলছেন টাকা চুরি গেছে। তা হলে ব্যাপারটা কী হল? গতকাল রাত্রের কথা তিনি সকালেই ভুলে গেলেন।

—ও দাদা, গতকাল আপনি এই দশ হাজার পাঁচশ' টাকা আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন—দশ হাজার টাকা যেন অনুপকে দিয়ে আসি আর পাঁচশ' টাকা পাড়ার ছেলেদের। সামনে তো হরেকৃষ্ণও ছিল।

—কী বললে এত টাকা বিলিয়ে দেবার জন্য দিয়েছি? পাগল নাকি? প্রায় লাফিয়ে উঠে সন্তোষ বাবু।—হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ। ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে যান।

হরেকৃষ্ণ তো চুপচাপ ছাদে দাঁড়িয়ে আছে। কোনো সাড়া শব্দ নেই। ডেকে সাড়া শব্দ না পেয়ে রাগে গজ গজ করতে থাকেন—বুঝেছি ও ব্যাটারই কীর্তি, আমাকে ঘুমের মধ্যে কী করতে কী করিয়েছে। আমি এখনই যাব দোকানে।

দোকানদার সবে দোকান খুলেছে, এমন সময় সন্তোষ বাবু হাজির। রাগে ফেটে পড়েন।

—জানেন আপনার রোবট আমার কত ক্ষতি করেছে?

দোকানদার মৃদু হেসে বলল—বলুন আপনি। রোবট আপনি কিনে নিয়েছেন, তা হলে সেটা আমার হবে কী করে? আচ্ছা বলুন তো কী হয়েছে?

সন্তোষবাবু হা হুতাশ করতে করতে সবকিছু বলে যান। ও এরকম ব্যাপার। ভারী ইন্টারেস্টিং। সে রকম ভাবলে তো খারাপ কোনো কাজ নয়। আপনাকে তো বলেছিলাম। ওর সামনে মিথ্যে কথা বলবেন না। যাই হোক এরকম যে করবে আমাদের জানা ছিল না। এখন দেখুন ওকে রাখবেন কি না, এরকম অদ্ভুত রোবট কিনতে অনেকেই আগ্রহী। যদি বলেন ওকে বিক্রি করে দেওয়া কোনো ব্যাপারই নয়। উঠতে উঠতে সন্তোষবাবু বললেন—লোক দেখুন, ওকে আমি বিক্রি করে দেব।

বাড়ি ফিরে দেখেন হরেকৃষ্ণ কতকগুলি কাগজ টাইপ করছে। সন্তোষ বাবু রেগেই জিজ্ঞেস করেন—কোন্ সাহসে তুমি আমাকে ঘুমের ঘোরের মধ্যে রেখে এতগুলি টাকা বিলি করে দিলে। তোমার ওই বদ্‌বুদ্ধি হল কেন?

—সবই ভালোর জন্য মহাশয়।

—তোমাকে আর আমি রাখব না।

—সে আপনার অভিরুচি মহাশয়।

কোনো কথা না বলে দোকানে চলে গেলেন। দুপুরের দিকে পাড়ার ছেলেরা এসে হাজির। দাদু আজ আমাদের ক্লাবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা, আপনাকে বিশেষ অতিথি হিসেবে পেতে চাই।

সন্তোষবাবু জানেন, পাড়ার ছেলেরা তাঁকে খুব একটা পছন্দ করে না, আড়ালে কঞ্জুষ বলেও ডাকে। বুঝলেন

পাঁচশ' টাকার কদর। ভাবলেন, টাকাটা যখন বেরিয়েই গেছে, তাই এই আপ্যায়নটুকু ছাড়া ঠিক হবে না। বিশেষ অতিথি হিসেবে গেলে পাড়ার লোকেরাও চমকে যাবে। সম্মতি দিলেন যাবেন। সন্ধ্যার দিকে ছেলেরা এসে, বাড়ি থেকে সসম্মানে নিয়ে গেল। মঞ্চে বসিয়ে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করা হল. ক্লাবের সেক্রেটারি বক্তৃতার সময় যথেষ্ট প্রশংসাও করল। নিজেকে বেশ গর্বিত, ওজনদার মানুষ মনে করলেন সন্তোষ বাবু। ভাবলেন, আজকের দিনটা ছিল ওঁর জীবনের অন্যতম একটা দিন। সে দিন রাত্রে হরেকৃষ্মর সাহায্য লাগল না, নিজে নিজেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরদিন সকালে অনুপ এল নিমন্ত্রণ করতে—জ্যেঠু, আজ দুপুরে আমাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ, যেও কিন্তু।

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই সন্তোষবাবুর মনের মধ্যে একটা গানের কলি গুণগুণিয়ে উঠছে—কী আনন্দ আকাশে বাতাসে.....। সকালটাকে মনে হচ্ছে যেন সোনা ঝরা। ফুলের গন্ধ, পাখির ডাক সবই আজ যেন নতুন করে টের পাচ্ছেন। অনুপকে বললেন—যাব বইকি!

—কী জন্য রে আজ নিমন্ত্রণ?

—জ্যেঠু, আমি যে পাস করেছি, তাই।

—কবে দিল্লি যাবিরে তুই?

—সামনে মাসের সাত তারিখ। আমি যাই জ্যেঠু।

—মহাশয়, দোকানে যাবেন না? হরেকৃষ্ম সামনে এসে দাঁড়ায়। না, আজ ব্যবসাপত্র নিয়ে ভাবতে ভালো লাগছে না সন্তোষবাবুর।

ভাবলেন, অনেক হয়েছে টাকা পয়সা. এবার অন্য রকম ভাবে বাঁচতে হবে।

—মহাশয় দোকানে যাবেন না। হরেকৃষ্ম আবার মনে করিয়ে দেয়। না, হরেকৃষ্ম বলো তো, অনুপটা ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেল সে জন্য ওকে কী দেওয়া যায়?

—ভালো দেখে একটা ঘড়ি দিতে পারেন।

—ঠিক বলেছ তুমি। বিকেলের দিকে দোকানের লোক এসে হাজির। সন্তোষ বাবুকে বলল-স্যার, আপনার রোবটটি কিনতে আগ্রহী একজন লোক। আপনি যে একলক্ষ টাকা দিয়েছিলেন, এনেছি, টাকাটা রেখে রোবটটিকে আমার সঙ্গে দিয়ে দিন।

সন্তোষবাবু দেখলেন হরেকৃষ্ম সামনে দাঁড়িয়ে। ভাবলেন গতকালের সকাল আর আজ বিকেল এই এতটুকু সময়ের মধ্যে নিজের মনের কত পরিবর্তন হয়েছে। ভালোবাসা, ভালোলাগা মনের মধ্যে স্বতঃউৎসারিত গান আনন্দ সবই এখন পেয়েছেন, অনুভব করতে পারছেন। মানুষ তো এইসব নিয়েই বাঁচে, বেঁচে থাকতে চায়। আর এত সম্ভব হল হরেকৃষ্মর জন্য। তাই তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বাকি পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এনে দিয়ে বললেন—মালিককে বলো, হরেকৃষ্মকে আমি বিক্রি করব না, ওকে আমার দরকার।

মাত্রাহীন সাহস

সুবিমল রায়

পুজোর ছুটি। বাবুলের ঘুম আসে না অবকাশের দীর্ঘ দুপুরে। মা'র ভয়ে গোটা দুই অঙ্ক করে ঘরে বসে। মা ঘুমিয়ে পড়লে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। ছুটে যায় বন্ধুদের আড্ডায়।

বাবুল, সুদীপ, কল্যাণ, তপন—ওরা সবাই বসে গুলতানি মারছিল বড় রাস্তার পাশে এক পুরনো বাড়ির রকে বসে। বাহাদুরির পর বাহাদুরি চলল। বাবুল বললে বন্ধুদের, আমি যা দেখি তোরা দেখিস?

সবাই তাকাল আশেপাশে। কল্যাণ বললে, দেখি। বাবুল বললে, আমি দেখেছি একটা মরা কাক। বলেই সে নির্বিকার বসে রইল কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে।

বন্ধুরা বেজায় খুঁজল চারপাশে। কোথাও মরা কাক পাওয়া গেল না। সুদীপ বললে, গুল মারছিস্ বাবুল। মিথ্যে কথা।

বাবুল বললে, হেরেছিস বল। দেখিয়ে দেব?

কল্যাণ বললে, হারলাম। বল এবার কোথায়।

বাবুল একটু এগিয়ে রাস্তার ওপাশে গেল। তারপর উঁচু হয়ে দূরের ইলেকট্রিক তারে ঝুলে থাকা একটা মরা কাক দেখাল বন্ধুদের। বন্ধুরাও দেখল।

ওরা হারল ঠিকই কিন্তু হার মানতে ওদের কষ্ট হল।

ওখানে দাঁড়িয়েই সুদীপ বাবুলকে বললে, এখান থেকে ওই টেলিফোনের পোস্টটাকে পাঁচ ঢিলের মধ্যে তাক করতে পারবি?

বাবুল বললে, তুই পারবি?

হ্যাঁ। সুদীপ অনায়াসে পারবে এমন ভাব দেখাল।

তুই পারলে আমিও পারব। বাবুল হেসে বললে।

সুদীপ রাস্তা থেকে ইঁটের টুকরো কুড়িয়ে নিল কয়েকটা। সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য ঠিক করতে বেশ খানিকটা সময় নিল। নানা অঙ্গ-ভঙ্গি করে ঢিলটা ছুঁড়ল। কিন্তু লাগল না। দ্বিতীয়বার ছুঁড়ল। সেটাও লাগল না। একে একে পাঁচটা ঢিল লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। সুদীপ অবশেষে অসাফল্যে ভেঙে পড়ে রাস্তায় অবসন্ন ভঙ্গিতে বসে পড়ল।

বাবুলের পালা এবার। সে একটু ভারী দেখে গোটা তিনেক ইঁটের টুকরো বেছে নিয়ে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াল। মনে মনে বুঝি লক্ষ্য স্থির করে নিল, তারপরেই বিদ্যুৎ গতিতে ছুঁড়ে মারল ঢিল। সঙ্গে সঙ্গে পোস্টে ঢং করে শব্দ তুলে ইঁটের টুকরো ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ল। বন্ধুরা হেসে বাবুলকে এসে জড়িয়ে ধরল। সুদীপ বসেই রইল বিস্ময়ে বন্ধুর দিকে চেয়ে।

ঠিক তখুনি ওরা শুনতে পেল অদূরে কীর্তনের আওয়াজ। ফাঁকে ফাঁকে আকাশ ফাটানো আর্তনাদ। হরি, হরি, হরিবোল।

বন্ধুরা উৎকর্ণ হল ওই দিকে তাকিয়ে। দেখল একদল লোক পালঙ্কে এক মড়া নিয়ে শ্মশানের দিকে যাচ্ছে। শবযাত্রার কীর্তন। বন্ধুরা পাশে দাঁড়িয়ে দেখল শব নিয়ে দলটি শ্মশানের পথে দ্রুত চলে গেল। ওরা নির্বাক হয়ে পড়েছিল মুহূর্তের জন্য। প্রথম বাবুলই বললে, কে মরল রে?

বন্ধুরা বললে, মনে হচ্ছে বুড়ো কেউ।

তপন বললে, চল্, দেখে আসি শ্মশানে গিয়ে।

কল্যাণ আপত্তি করলে, না থাক। শ্মশানে যেতে ভয় লাগে।

সুদীপ খেঁকিয়ে উঠলে, ভীতু কোথাকার। শ্মশানকে আবার ভয় কী? ওখানে তো মহাদেব থাকেন।

বাবুল বললে, আমি রাতেও শ্মশানে যেতে পারি একা।

সুদীপ হেসে বললে, রাখ, রাখ, চাল মারতে হবে না।

বাবুল বললে, বাজি ধরবি?

বন্ধুরা বললে, বাজি।

বাবুল সিরিয়াস হয়ে বললে, গেলে কী দিবি?

বন্ধুরা ভাবলে খানিকক্ষণ। তারপর বললে, তিনজনে তিনটে সিনেমা দেখাব।

বাবুল হেসে বললে, ঠিক আছে। আজই যাব।

সুদীপ বললে, রাত এগারোটার পরে একা যাবি। সঙ্গে বাতি নিতে পারবি না। রাজি?

বাবুল ঘাড় নাড়ল। রাজি।

কল্যাণ বললে কি করে বুঝব যে তুই শ্মশানে গিয়েছিলি?

সুদীপ বললে, আমি একটা লাঠি দেব। ওতে বাবার নাম লেখা আছে। সেই লাঠিটা তুই শ্মশানে পুঁতে দিয়ে আসবি, আমরা খুব ভোরে গিয়ে দেখব লাঠিটা শ্মশানে আছে কি না।

বাবুল উৎফুল্ল হয়ে বললে, বেশ।

সন্ধ্যার পরে সুদীপ বাবুলের কাছে বাবার লাঠিটা দিয়ে গেল। রাত এগারোটা নাগাদ বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়লে বাবুল বাড়ি থেকে চুপি চুপি বেরোল। একটু শীত শীত করছিল। শ্মশানের খোলা হাওয়ায় সেটা বেশি হতে পারে মনে করে বাবুল জামার উপর একটি চাদর জড়িয়ে নিল। মাথায় চাপাল পাগড়ির মতো এক খণ্ড বস্ত্র। লাঠিটা হাতে নিয়ে সে রাস্তায় নেমে এল।

রাস্তা নির্জন, অন্ধকার। আকাশে তারার মালা। নিশীথের হাওয়া ফাঁকা রাস্তায় ঘোরপাক খাচ্ছে। বাবুল দ্রুত হেঁটে চলল শ্মশানের দিকে। তাকে খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে কাজ সেরে। জানাজানি হয়ে গেলে বাবা মেরে হাড় গুঁড়ো করবেন।

সহর ছাড়িয়ে বাবুল শ্মশানের চত্বরের কাছাকাছি এসে পড়ল দ্রুত হেঁটে। এবার সে নদীর পাশের উঁচু বাঁধের উপর দিয়ে চলতে লাগল। অন্ধকারে নদীর জল চোখে পড়ে না।

বাবুলের কানে আসে জলের ছল্ ছল্ ক্রন্দন। দক্ষিণের মুক্ত হিমেল হাওয়া বাবুলের মুখে আঘাত করে। নির্জন পথে একাকী পথিক বাবুলের বুকে দোলা লাগে। তার দেহ কেঁপে উঠে কেন, সে বোঝে না। তার ভয় করে, কিন্তু বুকে সাহস সঞ্চয় করে মা কালীর নাম স্মরণ করতে করতে সে এগিয়ে চলে শ্মশানের দিকে।

অন্ধকার; শুধু অন্ধকার চারদিকে। বিশাল নির্জনতা চারধারে। জমাট বাঁধা নিস্তব্ধতা সমস্ত পৃথিবীতে। হাওয়ার দীর্ঘশ্বাস আর জলের ছল্ ছল্ রহস্যময় ক্রন্দনধ্বনি খুব স্পষ্টভাবে তার কানে বাজছে। বুকে তার এক দুর্বোধ্য চঞ্চলতা। শরীরের রক্তস্রোত হিম হয়ে গিয়ে বয়ে চলেছে। শির্ শির্ করছে মাথা থেকে পা পর্যন্ত।

সে শ্মশানের চত্বরে নামল ধীরে ধীরে। শ্মশানের গাছগুলোতে জমাট বাঁধা অন্ধকার। তাদের আকৃতি ভীষণ, ভয়ার্ত। স্মৃতিফলকের সারগুলো স্থানুর মতো জ্যামিতিক ছন্দে দাঁড়ানো। বাবুলের মনে হল সে বহু শতাব্দী আগের কোনো এক প্রেতপুরীতে প্রবেশ করেছে। মৃত জগৎ। মৃতের বিষাক্ত দীর্ঘশ্বাস তার বাতাসে ; ক্রন্দন প্রবাহিত নদীর জলে।

বাবুল নদীর আরও কাছে গেল, যেখানে লাঠিটা পুঁততে হবে! পাশে দেখল একটি সদ্য নিবানো চুল্লি। তার আশেপাশে জ্বলন্ত অঙ্গার। বাবুলের মনে হল যেন শত শত রক্তচক্ষু তার দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। বাবুল ওই দিকে তাকিয়ে ভয়ে ঘেমে উঠল। সে চাদরের নীচে ধরে রাখা লাঠিটিকে আরও শক্ত করে ধরল। সে কয়েক বার চোখ বুজল ; আবার খুলল। অনুভব করল তেষ্টায় তার কণ্ঠ শুকিয়ে উঠেছে, উত্তেজনায় দেহ কাঁপছে।

ভাঙা কলসি, কুলো, ছিন্ন বিছানার পাশ দিয়ে সে এগিয়ে গেল ধীরে ধীরে মন্ত্রমুগ্ধের মতো। বস্তুতঃ বাবুলের তখন কোনো হুঁশ ছিল না। সে যান্ত্রিকভাবে তার কাজ সমাধা করে ফিরে আসার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েছিল। অতএব সে দ্রুত লাঠিটা বের করে নদীর তীরে পুঁতে দৌড়ে সরে আসবার চেষ্টা করল। সে লাঠিটা পুঁতল গায়ের জোরে এবং ফিরে আসবার জন্য দৌড়ুতে গেল। কিন্তু পারল না। কে যেন প্রচণ্ড শক্তিতে নদীর দিকে টেনে ধরল। বাবুল চোখ বুজে ছিটকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করল, কিন্তু ব্যর্থ হল। অতএব সে চীৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল। ঠিক তক্ষুণি একটা ভীষণ ভয়ার্ত আর্তনাদ তার কানে এল। সে অনুভব করল ওই বীভৎস চিৎকার শ্মশানের শূন্যতাকে বিভীষিকায় পূর্ণ করে তুলল। সে বুঝে উঠতে পারল না সে কীসের হুঙ্কার। সে বুকে দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করল এবং মুখ দিয়ে অস্ফুট শব্দ বের করতে করতে এক সময় চেতনা হারিয়ে লুটিয়ে রইল শ্মশানের নদী তীরে।

পরদিন খুব ভোরে বন্ধুরা উৎসুক ভাবে শ্মশানে গিয়ে দেখল বাবুল মুখ থুবড়ে পড়ে আছে নদীর চড়ায়। তার দেহ চাদরে জড়ানো এবং চাদরের একটি অংশ লাঠির সঙ্গে শক্তভাবে পোঁতা। সংজ্ঞাহীন বাবুলের চারপাশে কয়েকটি কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মিম্মির জন্য গল্প

সুমন ভট্টাচার্য
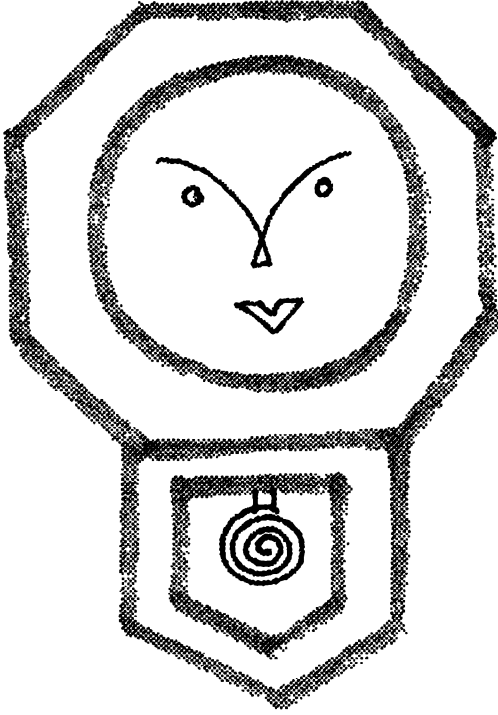
ফিসফাস-টুং-টাং যান্ত্রিক শব্দে চোখের উপর থেকে ঘুমের চাদরটা সরে গেল। মাসিমণি চোখ মেললেন। ঘুরঘুট্টি অন্ধকারের বুকে ঘরময় সবুজ-লাল-সোনালি-নীল বিন্দুরা যেন গোল্লাছুট খেলছে। আর ফিসফাস জরুরি মিটিঙের মতো একদম নিজেদের মধ্যে একান্ত গোপন, কান খাড়া করেও কিছু বোঝা যাচ্ছে না। চোখের সামনে লাল-নীল-সবুজ-সোনালি আলোরা উজ্জ্বল হতে হতে প্রায় ঘরের সব কিছু পরিষ্কার হয়ে এল। একটা মায়াবি স্বপ্নের মতো, বাহ্ স্বপ্নই তো, জেগে-জেগে স্বচক্ষে দেখছেন তো কি! মিম্মি বুঝতেই পারবে না। আর পারলেই কী ; ও তো আর নিজের ঠাম্মার কথা অবিশ্বাস করবে না—তা ছাড়া, স্বপ্নতো স্বপ্নই, স্বপ্নের গল্প শুনলে বরং আরও বেশি মজা পাবে। উনার এই ছোট্ট নাতনিটাকে নিয়েই যত ভাবনা। যতক্ষণ জেগে থাকবে, 'ঠাম্মা একটা গল্প—শুধু একটা বললেই হবে।' এমন একটা মুখ করে বলবে না, বাধ্য হয়েই শুরু করে দেন—একবার একদেশে....।' মিম্মি তখন আর এসব গল্পে ভোলে না। তাই ঠাম্মাকে ওর জন্য নিত্যনতুন গল্প ফাঁদতে হয়।

ঘরের সবকিছু পরিষ্কার হয়ে উঠতেই মায়াবি আলোয় এমন আশ্চর্য কাণ্ড কারখানায় একদমই চমকে গেলেন। ঘরের মধ্যে অদ্ভুত-অদ্ভুত সব জীব দু'ঠ্যাং-তিন ঠ্যাং-চার ঠ্যাঙে কাঠখোট্টা শব্দে হাঁটছে। মানে ঠিক হাঁটছে না, তবে কোনোরকম চলছে-ফিরছে সারা ঘরময়। প্রথমে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। তারপরই ওই জীবগুলোকে চিনতে

পারলেন, অবাক হয়ে গেলেন আরও বেশি। এ কীরে, টিভিটা চার ঠ্যাঙে গট গুট করে চলাফেরা করছে। একটা লালচোখ গালের কাছাকাছি জায়গায়, পাশাপাশি আরেকটা নীলচোখ—সঙ্গে বিভিন্ন মাপের সোঁ-সোঁ আওয়াজ। পাশেই ছোট্ট ভাইটির মতো ছোটো-ছোট্ট তিনটে ঠ্যাঙের উপর পাশাপাশি চলছে। লাল-সবুজ দুটোই একসঙ্গে জ্বল জ্বল করছে। ওহোঃ স্ট্যাবিলাইজার! কিন্তু ওটার ঠ্যাং গজাল কখন, চলতেই শিখল কখন! কত কিছুইতো হচ্ছে। যাগগে, টি ভি যদি চলতে পারে—হাঁটতে পারে স্ট্যাবিলাইজারের ঠ্যাং গজিয়ে হাঁটতে শুরু করে দিলে কিছু করার নেই। মাসিমণি একথা ভাবতে ভাবতেই ডানদিকে দেয়ালে তাকিয়ে দেখেন ঝলমলে সোনা সোনা চেহারার দেয়াল ঘড়িটা আস্ত একটা দেয়াল পোকার মতো তরতর করে নীচে নেমে আসছে। তরাক করে একলাফে সামনে দাঁড়িয়েই কোমরে হাত দিয়ে মাথা দুলিয়ে হিন্দি-বাংলা-ইংরাজি মিলিয়ে হিজিবিজি কতোকিছু বলে যাচ্ছে। মাসিমণি হাঁ করে তাকিয়েই রইলেন, কিছু বুঝলেনওনা জবাবও দিলেন না। 'ওহোঃ আপনিতো নিপাট ভালোমানুষ বাঙালি আমার তিনমিশালি কথায় হয়তো আপনার জট পায়ি যাচ্ছে। আসলে যে কারখানায় আমার জন্ম তা বাংলা মুলুকে হলেও আমাকে যিনি তৈরি করেছিলেন তিনি আবার হিন্দি বলতেই অভ্যস্ত। আর মগজ জুড়ে ব্রিটিশ পোরা। পোশাক, শিক্ষা, জ্ঞান সব মিলিয়ে বনেদি ব্রিটেন ব্রিটেন গন্ধ।' এমন বিস্তৃত তথ্যে ঠাসা কথাবার্তা সত্যি না বোঝার কোনো উপায়ই নেই, হঠাৎ ঘড়ির কথার সুরটা পাল্টে যায়।

আপনারা আসলে নিপাটও নন, ভালো মানুষও না। ভাঁজে ভাঁজে দুষ্টু বুদ্ধি। বিন্দুমাত্র দয়ামায়া নেই, একটু খালি ঢিলেমি দিচ্ছিলাম, বিশ্রাম সবার জন্যই জরুরি—সেরকমই চলছিলাম। কিন্তু সহ্য হলনা আপনাদের। ঝট করে পুরোনোটা সরিয়ে দিয়ে নতুন আরেকটা। খাওয়া, ঘুম, বিশ্রাম আপনাদের বেলায় তো ঠিক আছে। পরের চরকায় অত বেশি করে তেল ঢালা কেনোরে বাবা, নিজের চরকায় যে এদিকে জং ধরে যাচ্ছে। বলেই খপ্ করে হাতের শিরায় চেপে ধরে লাফালাফি মাপতে শুরু করে দেয়। বুকের ধুকপুকুনি শোনার জন্য একদম বুকে কান লাগিয়ে বসে থাকে। ভয়ে মাসিমণির চোখ বুজে যায়—ভিতরে লাফালাফিও যেন বেড়ে যায়।

এইতো পেয়ে গেছি। হৃদয়টা লাফাচ্ছে বড্ডো বেশি। হাইপারটেনশান, উদ্‌বিগ্ন রোগের চূড়ান্ত লক্ষণ আর আমাদের বেলায় যত, ইস্ কী তেজ! নতুনটা লাগানোর পর থেকে খালি ছুটছি—ছুটছি—বুকের ভিতর ঠিক এমনই হাঁপর ছুটতে থাকে।' মাসিমণির মাথাটা যেন একদম নুয়ে পড়েছে। কিছুটা ভয়—কিছুটা লজ্জা, কোনোদিন এমন ভাবেননি তো। সত্যি কত নিষ্ঠুর আমরা। কিন্তু ঘড়ির ব্যাপারে আমরা কত অসহায় এক পাও চলতে পারবনা যে, যদি সান্ত্বনা দিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে জায়গার ঘড়ি জায়গায় ফেরত পাঠানো যায়। কিন্তু কিছু বলার আগেই চোখ পিট পিট করে দেখেন দেয়াল পোকার চালে সোনা সোনা ঘড়িটা ফের নিজের জায়গায় যে-কে সেই একইভাবে স্থির হয়ে আটকে রইল। একদম ভাবলেশহীন, খানিকটা আগেও যে তরতর করে চলছিল তার কোনো চিহ্নই নেই। মিম্মি ছাড়া আর কেউ বললেও বিশ্বাস করবে না। এখনও টের পাচ্ছেন যেন বুকের কাছে এসে ধুকপুকুনি মাপছে।

এসব ভাবতে ভাবতেই কে যেন কানে একটা কী দিয়ে হালকা খোঁচা দিল। মশা ভেবে হাত ঘুরিয়ে চাপড় মারেন। নাহ্, কিচ্ছু নেই। ওমা, আবার খোঁচা। এবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখতেই হল। মশার পিন পিন নয় অন্যরকম একটা শব্দও সঙ্গে। টুং টাং শব্দে কেউ হাসলে যেমনটি হওয়ার কথা পাশাপাশি আরেকটা শব্দও অবশ্য আছে। ওই বিভিন্ন মাপের ঝড়ো সোঁ-সোঁ। আগে খেয়াল করেননি। স্ট্যাবিলাইজারের ঠিক কোথা থেকে যেন আরেকটা অ্যারিয়েল মার্কা কিছু। আরেকটা খোঁচা খাওয়ার আগে মাথাটা সরিয়ে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কানটাও সরে গেল। লাল সবুজ চোখ দুটো বিরক্তিতে কুঁচকে ছোটো হয়ে এল। টুং টাং শব্দটা বিভিন্ন মাত্রায় নাচতে লাগল। শুনতে শুনতে-হঠাৎ মনে হল, আরেঃ। এ-তো কথা বলছে যেন।

—শুনুন, আমি অকৃতজ্ঞ নই। মানুষই আমার স্রষ্টা, এই ভেবেই এতদিন কিছু বলিনি। কিন্তু আর পারনা। জানেন ভিতরটা পুড়ে-পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। এতটা আগুনে উঠা-নামা। জানেন যখন কাজ থাকে না, বুকের

ভিতর সে বীভৎস উঠা নামার স্বপ্ন তাড়া করে বেড়ায়। আমি ঘুমের মধ্যে ছটফট করতে থাকি।' মাসিমণি মনে মনে ভাবেন, বাহ্, জানতামন নাতো অফ্ অন ছাড়াও স্ট্যাবিলাইজার ঘুমোয়, ছটফট করে, জেগেও উঠে। মনের কথাটা যেন কেমন করে টের পেয়ে গেল।

—ভাবছেন, ঘুমোনো, স্বপ্ন দেখাতে একমাত্র আপনাদেরই একচেটিয়া অধিকার। ওহু, আমরা স্বপ্ন দেখি, ভালো স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন। আগুনের উঠানামায় ভিতরকার শিরা ধমনিতে প্রচণ্ড টান পড়ে-পড়ে যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যেতে চায় মাথা। আচ্ছা আপনাদের ওই আগুনের উঠা-নামার নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না? না হয় এজন্যেই আমি তৈরি। কিন্তু তা বলে কি সবসময় এমন করতে হবে? বিশ্রাম নেই-কিচ্ছু নেই, শুধু কাজ আর কাজ। কী ভাবেন যন্ত্র বলে কি মন নেই? স্ট্যাবিলাইজারের কথাটা শেষ হতে না হতেই পিছন থেকে ঘ্যাস্ ঘ্যাসে গলা, 'হ্যাঁ হ্যাঁ এগজাক্টলি, যন্ত্র বলে কি মানুষ নই। ঘুম নেই, স্বপ্ন নেই—বিশ্রাম নেই?' শেষ কথাটা বেশ গমগম করে উঠল লাউডস্পিকারের মতো। ওটার পেছনেই সশব্দে টিভিটা। পোকা দৌড়ানো স্ক্রিনটা যেন চোখ ঝলসে দিচ্ছে। শব্দের তালে তাল পোকার নাচনের ঢঙটাও পাল্টে যাচ্ছে। মাথার উপর সাপের মতো দুলছে। আর শব্দ তো আছেই।

—আপনারা খেলা দেখবেন, সিনেমা দেখবেন, আর আগুনে পুড়ে পুড়ে ফুটো হবে আমাদের বুক গলা সব কিছু। তবে যদি আমার সুস্বাস্থ্য চান, আমার উপর চাপটা কম রাখবেন, আর এই স্ট্যাবিলাইজার ছোকরাকে একটু যত্নে রাখবেন। মানে ঠিক উল্টোটাই আর কি। আমাকে যত্নে রাখবেন ওর উপর চাপটা কম রাখবেন'। স্ট্যাবিলাইজারও যান্ত্রিকভাবে সায় দিয়ে কাঠখোট্টা চালে নিজের নিজের জায়গায় শান্তছেলের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল। কোনোরকম কিছু নেই। সব আগের মতো।

মনে মনে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে যাবেন। এমন সময় কে যেন কানফাটানো শব্দে হাউমাউ করে উঠল। বুকের ভিতরটায় সাংঘাতিক ধুকুর পুকুর। মুখফুটে একটা আর্তনাদও ছড়িয়ে পড়ল। শব্দের তীব্রতায় কানে আঙুল দিয়েছিলেন। শব্দগুলোকে এবার একটুখানি পথ করে দিলেন। বা, বেশ মানে বোঝা যাচ্ছে।

—আমার বুকের ভিতর জগঝম্প ঢুকিয়ে দিয়ে আমার বুক ফাটিয়ে দিচ্ছেন, আওয়াজ বাড়িয়ে গলা চিরে দিচ্ছেন। মাথার কথা তো বলেই লাভ নেই—আমি বিগড়ে যাচ্ছি। সাংঘাতিক ক্ষেপে আছি। বলেই প্রায় গায়ের উপর হামলে পড়ল। এবার চিনতে পারলেন, ঢাউস টেপ রেকর্ডারটা হিংস্র লাল চোখ মেলে দেখছে আর ফুঁসছে। যেন এক্ষুনি ছিঁড়ে খাবে। যথারীতি ওটার হাত-পা গজিয়েছে। এ ব্যাপারটায় আর অবাক লাগছে না। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, বিগড়ে গিয়ে হামলা করা। হামলা করা মানে দস্তুর মতো হাত ধরে টানাটানি 'আরাম করা চলবে না। আমাদের কষ্ট দিয়ে তোমরা আরাম করবে' বলতে বলতে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেবার অবস্থা। কোথায় ধরবেন, কী করবেন, ভাবতে ভাবতে নাজেহাল, 'বাবা বাছা' করে বোঝাতে গেলে আরও ক্ষেপে যায়। অসহায় ভাবে কোনো উপায় না দেখে গোঙানোর মতো শব্দ বের করতে চোখ মেলে তাকান, কোথায় কী? রোদ এসে ঘরের দরজা ছাড়িয়ে খাট ছুঁই ছুঁই। মিম্মি তখনও হাত ধরে টানছে আর আদর মিশিয়ে ডাকছে 'ঠাম্মা ওঠোনা, এত বেলা করে ঘুমোচ্ছ? আমি শুধু উঠে গেছি লোকে বলবে কী? ছিঃ ছিঃ মিম্মির ঠাম্মা এত বেলা অব্দি ঘুমোয়!'

মাসিমণির মুখে একটা হাসি ফুটে ওঠে। খানিকটা স্বস্তির, খানিকটা লজ্জার। আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়েন স্বপ্নের ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতেই বিড় বিড় করেন একটুখানি 'ওহ কি সাংঘাতিক, দুঃস্বপ্ন বলে দুঃস্বপ্ন, জীবন নিয়ে টানাটানি'।

—কী বলছো ঠাম্মা, আমায় বলো। 'স্বপ্ন দেখেছো?' মিম্মি জিজ্ঞেস করে।

—নাহ্, একটা গল্প তোমাকে বলবে'খন হাসি ছড়িয়ে কথাটা বলেই ঝটপট দাঁতন হাতে নাতনিকে সঙ্গে করে হালকা শীতের রোদে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন মাসিমণি। মিম্মিও গল্প শোনার লোভে দ্রুত দাঁতন সারতে থাকে।

স্বপ্নের রেলগাড়ি

সোমা গঙ্গোপাধ্যায়

কু-উ-উ ঝিক্‌ঝিক্ ঝিক্‌ঝিক্ কু-উ-উ শব্দ করতে করতে রেলগাড়িটা আস্তে আস্তে, হেলতে দুলতে স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে যায়। দুলাল হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সেদিকে। যতক্ষণ পর্যন্ত না ট্রেনটা চোখের আড়ালে চলে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে এভাবে তাকিয়ে থাকবে। এটা তার নিত্যদিনকার অভ্যেস। ট্রেনটা চলে যেতেই প্ল্যাটফর্মের ভিড়টা অনেক পাতলা হয়ে গেল। কেউ কেউ চায়ের দোকানের সামনে ভিড় জমাল, কেউ প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চে হাত-পা ছড়িয়ে, চিত্ হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে পরের ট্রেনের অপেক্ষা করতে লাগল। আবার অনেকে প্ল্যাটফর্মের ধারে ঝুঁকে পড়ে এদিক-ওদিক কোনো ট্রেন আসছে কি না তা দেখতে হাঁ করে চেয়ে থাকল। যত ভিড় থাকে এই সকালবেলায় আর নয়তো অফিস ছুটি হবার পর। তখন এত ভিড় থাকে যে একটা মাছি গলার জায়গা পর্যন্ত থাকে না। একের পর এক ট্রেন আসতে থাকে আর মানুষ বাদুড়ঝোলা হয়ে তাতে চেপে বসে। দুলালের তখন খুব মজা লাগে দেখতে। যদি একবার হাত ফস্‌কে পড়িস রে বাপধন, এক্কেবারে আলুর দম হয়ে যাবি। দুর্ঘটনা যে ঘটে না তা নয়, তবে দুলাল এখনও পর্যন্ত তার চোখের সামনে কোনো বড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে দেখেনি। অসাবধানে বা অন্যমনস্ক হয়ে রেললাইন পেরোতে গিয়ে কত লোক কাটা পড়েছে তার হিসেব নেই। দুলাল শুনেছে ওই বুড়ো স্টেশনমাস্টারের কাছে। দুলাল যতই সাহসী হোক, রাতের বেলায় যখন শেষ ট্রেনটা চলে যায় স্টেশন ছেড়ে, তখন সত্যিই তার গা ছম্‌ছম্ করে ওঠে। মনে হয় একটু দূরে আলো-আঁধার যেখানে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে ভাঙা-চোরা ওয়েটিং রুমের পিছনে, কে যেন দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। গত শীতে চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল যে ওই বটগাছতলার দোকানি, সবাই বলে তার আত্মা নাকি এখনো মুক্তি পায়নি। রাত গভীরে এখনও নাকি ওই আত্মা স্টেশন চত্বরে, রেললাইনের আশে-পাশে ঘোরাঘুরি করে। দুলাল নিজের বুকে থুথু দেয়। মনে মনে আওড়ায় ভূত আমার পুত/পেতনি আমার ঝি/রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে/ভয়টা আমার কী?

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের আশেপাশে প্রচুর লোকজন থাকে যাদের কোনো নির্দিষ্ট ঘরবাড়ি নেই। সারাদিন ওরা বিভিন্ন ধান্দায় ঘোরাঘুরি করে। সন্ধ্যে বেলায় পাখিরা যখন ডানা গুটিয়ে বাসায় ফিরে যায় তখন ওরাও যে যার আস্তানায় ফিরে আসে। কখনও ওদের জায়গা হয় পরিত্যক্ত মালগাড়ির বগিতে। সেখানে বৃষ্টির দিনে বড়ো আরাম। জল পড়ে না গায়ে। দুলালদের বাড়ি ঘর, মাথা গোঁজার আস্তানা সবকিছুই এখানে। দুলালদের মতো আরও হাজার দুলালরা এভাবেই থাকে। এদের মধ্যে কারও বাপ আছে, কারোর বাপ নেই। কারওর মা আছে বোন আছে, কারও তাও নেই। মাসি পিসি দিদা দাদু কেউ নেই। এইসব দুলালদের জন্ম এখানেই, রেললাইনের ধারে ঝুপড়িতে। ট্রেনের কু-উ-উ ঝিক্‌ঝিক্ শব্দ, রেললাইনের সিগন্যাল বাতি আর 'অজস্র' যাত্রীর ভিড়, চিৎকার চেঁচামেচি, ভেন্ডার, ফেরিওয়ালা, চা বিক্রেতা এসব ওদের জন্ম থেকেই পরিচিত। ওরা এভাবেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে এই জীবনযাত্রায়। সবুজ গাছগাছালির বন, নীল পাহাড়, সোনালি ধান-খেত, তিরতির করে বয়ে যাওয়া ছোট্ট নদী-তাই ওদের কাছ থেকে. ওদের জীবন থেকে অনেক দূরে।

মুন্নি, বাবু, রতন, বুড়ি, অপু—এরা কখনো নতুন জামার গন্ধ পায়নি। পৌষ-পার্বণে পিঠেপুলি পায়েসের স্বাদ কেমন, গন্ধ কেমন, তা-ও ওরা বলতে পারবে না। ইস্কুলে যায়নি কোনোদিন। মাঝেমধ্যে বইখাতা স্লেট বগলে নিয়ে, চশমা পরা কিছু লোক ওদের ঝুপড়িতে আসে লেখাপড়া শেখাতে। তাতে ওদের তেমন উৎসাহ নেই। তার চেয়ে স্টেশনে সাঁটা সিনেমার পোস্টার ওদের বেশি আকর্ষণ করে। কী সুন্দর পোশাক পরে থাকে ওরা, মনে হয় যেন স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। দুলালরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সিনেমার নায়ক, নায়িকাদের পোস্টারের দিকে। দুলাল মনে মনে ভাবে, বড়ো হলে টাকা-পয়সা জমিয়ে সে-ও এমন পোশাক পরবে। দুলাল মুন্নিকে কথাটা বলতেই মুন্নি হেসে গড়িয়ে পড়ে। মুন্নি বলে—তুই কি সিনেমার নায়ক নাকি? দুলাল রেগে যায় শুনে। মুন্নিকে ধরতে পিছনে ছোটে। মুন্নি লাফিয়ে পড়ে রেললাইনের ওপরে। তখনি স্টেশনের সিগন্যাল বাতি বদলে যায়। মুন্নি দুই নম্বর লাইন পেরিয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে আসতে চেষ্টা করে, পারে না। দুলাল ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। মুন্নি যদি ট্রেনের তলায় কাটা পড়ে। তাহলে মুন্নিও ভূত হয়ে যাবে।

দুলাল হাত বাড়িয়ে দেয় নীচে, মুন্নির দিকে। মুন্নি শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরে তার হাত। দুলাল টেনে হিঁচড়ে মুন্নিকে রেললাইনের ওপর থেকে প্ল্যাটফর্মের ওপরে নিয়ে আসে আর তখনি হুঁস করে পুরো স্টেশন চত্বর কাঁপিয়ে দিয়ে, এক্সপ্রেস ট্রেনটা বেরিয়ে যায় তাদের পাশ দিয়ে। মুন্নির বুকটা ধড়ফড় করতে থাকে। একটা কান্না গলায় আটকে থাকে দুলালের-মুন্নি যদি আজ ট্রেনের তলায় কাটা পড়ত। তাহলে সবাই তাকেই দোষী ভাবত। নিজের ওপর সাংঘাতিক রাগ হয় দুলালের। কেন সে রেগে গিয়ে মুন্নিকে তাড়া করতে গেল! মুন্নি দুলালের হাত ছাড়িয়ে ছুটে যায় তাদের ঝুপড়ির দিকে, এক বুক আতঙ্ক নিয়ে তার মায়ের কাছে। দুলাল ভাবে কতদিন ওরা রেল লাইনের মাঝের দিকে খেলতে খেলতে অনেক দূরে চলে গেছিল। কখনও লাইনের বুকে কান পেতে শুনেছে বহু দূর থেকে ছুটে আসা ট্রেনের শব্দ। কই কখনও তো এমন ভয় করেনি। ট্রেন প্রচণ্ড গতিতে ছুটে এসে বেরিয়ে গেছে ওদের পাশ দিয়ে। ওরা এক কোণে গুটিসুটি মেরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রেল লাইনের মাঝে পাথরের টুকরোর ওপর বিছানা কাঁথা মেলে রোদে শুকিয়ে নেয় ওদের ঝুপড়ির অনেকেই। কেউ রোদে পিঠ দিয়ে বসে বিড়ি খায়, গল্প করে। রেল লাইন, স্টেশন, প্ল্যাটফর্ম, তার আশেপাশের অঞ্চল নিয়েই দুলালদের পরিচিত পরিবেশ, তাদের চেনা জগৎ। এর বাইরে কী আছে তা ওরা জানে না, চেনে না।

দুলাল তার মায়ের পাশ ঘেঁষে দাঁড়ায়। দুলালের মতো দুলালের মায়েরও মাথায় চুলে তেল পড়ে না। ধুলো-ময়লার রুক্ষ, লালচে চুল, বাতাসে ওড়ে। দুলাল তার মায়ের দিকে তাকায়। ছেঁড়া, ময়লা শাড়ি পরা মায়ের সিঁথি শূন্য। দুলাল জানে তার বাপ আছে একটা এবং তার বাপ একদিন এই স্টেশন থেকেই ট্রেনে উঠে কোথায় কোন্

দূরদেশে চলে গেছিল কাজের সন্ধানে। এ কথাটা দুলাল তার মায়ের কাছ থেকেই শুনেছে এবং ছোটোবেলা থেকে তাই শুনে আসছে। জন্মাবার পর থেকে সে তার বাপের চেহারা দেখেনি। ওর বন্ধুরা বলে—আসলে তোর কোনো বাপই নেই। শুনে তার মন খারাপ হয়েছিল কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেনি। সে জানে এবং মনে মনে বিশ্বাস করে একদিন না একদিন তার অদেখা বাপ ঠিক ফিরে আসবে তার কাছে, মায়ের কাছে। দুলাল তাই প্রতিটি ট্রেনের বাঁশি শুনতে পেয়ে ছুটে আসবে স্টেশনে। হাজারো যাত্রীর ভিড়ে তার অদেখা বাপটাকে খুঁজবে। বাবা লোকটা দেখতে কেমন তা সে জানে না। কোনো ছবিও দেখেনি তার বাবার। তবু দুলাল বিশ্বাস করে তার বাবা ছিল, একদিন ফিরেও আসবে তাদের ঝুপড়িতে অনেক অনেক টাকা উপার্জন করে। তখন আর তার মাকে লোকের বাড়িবাড়ি ভিক্ষে করে খেতে হবে না। তবে ওই একদিন কোন্ একদিন, তা দুলাল জানে না। তার মা-ও তাকে স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেনি। দুলাল তাই কখনও রেললাইন পেরিয়ে এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে দুই, তিন, চারে চলে যায়। কখনও সিঁড়ি বেয়ে ওভারব্রিজের ওপর উঠে দূরের দিকে চেয়ে থাকে উদাস ভাবে। তারপর একসময় সূর্য ডুবে যায়, অন্ধকার নেমে আসে। দুলাল মায়ের হাত আঁকড়ে ধরে বলে—'আজও তো বাপটা এল না তো মা!' মা শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। দুলাল তবু প্রতীক্ষায় থাকে। তার স্বপ্নের রেলাগাড়িটার। সেটাতে তার বাবা আসবে, নিয়ে যাবে মাকে আর তাকে, কলকাতা শহরে—কোনো একদিন, কোনো-না-কোনো একদিন বাবা ফিরে আসবেই।
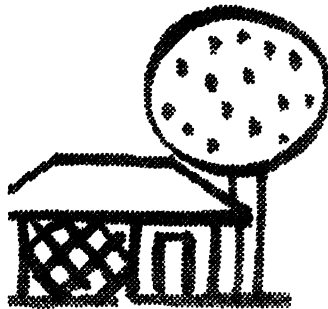
জালনোটের বেড়াজাল

জহর দেবনাথ

ডিজেল ইঞ্জিনের বিরাট ব-অ-প্ শব্দে পিন্টু আচমকা চমকে ওঠে। ওর বুকের ধুকপুকানি বেড়ে যায়। ভারী লেপের পেট থেকে মাথাটা বের করতে গিয়ে মনে পড়ে—সে তার নিজের ঘরে ঘুমিয়ে নেই। ত্রিপুরা থেকে কয়কশো' কিলোমিটার দূরে উত্তর কাছাড়ের একটা পাহাড়ি অঞ্চলের রেলস্টেশনের কাছে ছোট্কার এক বন্ধুর কোয়ার্টারে ঘুমিয়ে আছে।

—এ সময় বাইরে বেরোতে চাইলে ঠান্ডায় একদম জমে যাবি। ছোট্কা হাত বাড়িয়ে পিন্টুকে কাছে টেনে নেয়।

—কিন্তু ছোট্কা—

—ও কিছু নয়। ডাউনে একটা গাড়ি যাচ্ছে। ডিজেল ইঞ্জিন কিনা, তাই অমন গম্ভীর আর জোরালো আওয়াজ।

—এই ঠান্ডায়, এত ভোরে!

—ভোর এখনও হয়নি। রাত তিনটে। এই সময়টাতেই কাছাড় এক্সপ্রেস মাইভং অতিক্রম করে যায়।

—ছোট্কা এখানটায় এত ঠান্ডা কেন?

—দিনেরবেলায় এখানকার ভৌগোলিক অবস্থানটা দেখলেই বুঝতে পারবি। এখন আর কথা না বলে আর একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর্।

কথাটা বলে ছোট্‌কা কিছুক্ষণের মধ্যেই দিব্যি চুপ মেরে গেলেন। কিন্তু পিন্টুর চোখে ঘুম আসে না। সে কিছু ভাববার চেষ্টা করে। আজ সন্ধ্যার আপ বরাক এক্সপ্রেসে এসে ওরা নেমেছে। গাড়ি থেকে নেমে পিন্টু ভীষণ চমকে উঠেছিল। এর আগে এত বেশি শীতপ্রধান অঞ্চলে কোনোদিন আসেনি সে। ছোট্‌কার বন্ধু ডাক্তার পরিতোষ গগৈ স্টেশনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রথমে মনে হয়েছিল আপাদমস্তক কম্বলে মুড়ি দেওয়া জাম্বুবান। এই শীতে কাউকে চট্ করে চেনার কোনো উপায় নেই। পিন্টু ভেবে পাচ্ছে না—এমন বিদ্‌ঘুটে শীতের সময় ছোট্‌কা কেন এখানে বেড়াতে এলেন! নিছক বেড়ানো নাকি অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে কে জানে। অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে নিজের অজান্তেই পিন্টু একসময় ঘুমিয়ে পড়ে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল কে জানে। ঘুম ভাঙতেই পিন্টু লেপের গহ্বর থেকে বাইরে উঁকি মারে। ওরেব্বাস! রোদ উঠে গেছে! ধড়মড় করে উঠে বসে সে। কিন্তু একি! কাচের জানালা দিয়ে মৃদু সূর্যের আলো দেখা গেলেও ঠান্ডার তো এতটুকু কমতি নেই বলে মনে হচ্ছে। তা ছাড়া ছোট্‌কাই বা গেলেন কোথায়? হাফ সোয়েটারের ওপর ফুল সোয়েটার চাপিয়ে বিছানা থেকে নামতেই—দরজা ফাঁক করে মাঝবয়সী একজন উঁকি মারে। গতরাতে একে এখানে দেখেছে বলে মনে হল না।

—খোকাবাবুর ঘুম ভাঙল।

—দেখতেই তো পাচ্ছেন। আপনি কে?

—আমি ডাক্তারবাবুর কাজের লোক। আমাকে আপনি নয়, তুমি বলে ডাকবে।

—তা না হয় হল, কিন্তু তোমাকে কি বলে ডাকব?

—ছোটো বড়ো সব্বাই আমাকে শিবুদা বলেই ডাকে।

—চমৎকার। তা শিবুদা, আমার ছোট্‌কা গেলেন কোথায়?

—উনি বুঝি তোমার ছোট্‌কা হন? তাহলে আমারও ছোট্‌কা। ছোট্‌কা আর ডাক্তারবাবু ইস্টিশনের দিকে গেছেন।

—কী ব্যাপার! আমাকে না ডেকেই ছোট্‌কা বেরিয়ে গেলেন!

—ইস্টিশনে কি একটা ঝামেলা হয়েছে। ছোট্‌কা বলে গেছেন, তুমি জেগে উঠলে তোমাকে জলখাবার দিতে। খোকাবাবু, তুমি বাথরুম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসো, আমি গরম গরম খাবার নিয়ে আসছি।

বাথরুমে ঢুকে পিন্টু কিন্তু জলের বালতিতে হাত দিতে ইতঃস্তত করে। ঠান্ডায় বরফ শীতল জল দিয়ে চোখ-মুখ ধোয়া কি ঠিক হবে? এছাড়া তো কোনো উপায়ও নেই। জগ্ দিয়ে বড়ো বালতি থেকে জল তুলতে গিয়ে পিন্টু অবাক হয়। মনে মনে শিবুদাকে ধন্যবাদ জানায়। শিবুদা সত্যিই কাজের লোক বটে। না হলে এই সাত-সকালে গরম জল! আঃ!

গরম গরম ডিম-পাউরুটির টোস্ট আর ধূমায়িত কফি খেতে খেতে পিন্টু শিবুদার কাছে জানতে চায়, স্টেশনে কী এমন ঝামেলা হয়েছে যে ছোট্‌কা আর ডাক্তারবাবু এই সাত-সকালেই ছুটে গেলেন? শিবুদা মোটামুটি যা বলল—রেলের ডাকব্যাগে এমন একটা কিছু পাওয়া গেছে, যা নিয়ে স্টেশন চত্বরে একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। রেলপুলিশের লোক এসে ভোরবেলাতেই ডাক্তারবাবুকে ডেকে তোলে। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ছোট্‌কাকেও ডেকে নিয়ে গেছেন। পিন্টুর মনে মনে খুব অভিমান হয় ছোট্‌কার ওপর। অভিমান হলেও মনের কৌতূহলটাকে দমিয়ে রাখতে পারে না। ছোটকার ভাইপো হিসেবে পিন্টু যেন সকালের এই সূর্যরশ্মিতে রহস্যের হাসি দেখতে পায়। বাইরের ঠান্ডার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার মতো প্রস্তুতি নিয়ে পিন্টু বেরিয়ে পড়ে।

গতকাল রাতেই আবছা চন্দ্রালোকে পরিষ্কার দেখা না গেলেও বোঝা গিয়েছিল যে ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টারটি পাহাড়ের ঢালে। এখন দেখল, শুধুমাত্র ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টারই নয়, এমন আরো অনেক সুন্দর সুন্দর লাল বাড়িগুলো পাহাড়ের ঢালে ঢালে উঁচু-নীচুতে এক বিচিত্র শোভার সৃষ্টি করেছে। এখান থেকে দাঁড়িয়েই রেল-লাইনের পাশে স্টেশন দেখা যাচ্ছে। স্টেশন-মাস্টারের ঘরের সামনে অনেক লোকজন। কেউ কেউ উত্তেজনায় হাত-পা ছুঁড়ছে। কিন্তু ওদের কোনো কথাই এখান থেকে শোনা যাচ্ছে না। অজগরের মত আঁকা-বাঁকা ঢালুপথ বেয়ে পিন্টু তর্‌তর্‌ করে নেমে আসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই লাইন অতিক্রম করে উঠে আসে প্ল্যাটফর্মে। ভেতরে একটা চাপা উত্তেজনা নিয়ে সে ভিড়ের মধ্যে মিশে যায়।

এর কোমর ঘেঁষে, ওর বগলের পাশে দিয়ে পিন্টু জটলার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। কিন্তু ভেতরে এসেও সুবিধে করতে পারে না। বেশ কয়েকজন রেলপুলিশ একটা কিছু কেন্দ্র করে চক্রাকারে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ডাঃ গগৈ, ছোট্‌কা ও আরো কয়েকজন। ডাক্তারবাবুর দৌলতে পিন্টু আসল বস্তুটা দেখতে পায়। বহু খণ্ডিত একটি মানব দেহ। পিন্টু ভীষণ ভড়কে যায়। এমন বীভৎস দৃশ্য সে আর কোনোদিন দেখেনি। কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। সম্বিৎ ফিরে আসতেই সে খণ্ডিত দেহটির মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে। নিজের অজান্তেই ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে—ছোট্‌কা!

একজন পুলিশ অফিসার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় পিন্টুর দিকে। কিন্তু তার আগেই ছোট্‌কা পিন্টুর কাঁধে মৃদু চাপ দিয়ে কিছু একটা বোঝাবার চেষ্টা করে। পিন্টু চুপ মেরে বোকার মতো ফ্যাকাসে দৃষ্টিতে তাকিয়ে পুলিশ অফিসার গম্ভীর গলায় জানতে চান—'আপনারা কেউ এই মৃতদেহটা চিনতে পারেন?' সকলেই না সূচক মাথা নাড়ে। পিন্টু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় ছোট্‌কার মুখের দিকে। ছোট্‌কা পিন্টুর হাত চেপে ধরেছে।—চল্‌ পিন্টু, এখানে বেশিক্ষণ থাকলে গা গুলিয়ে উঠবে।

—ঠিক বলেছ ছোট্‌কা। আমার কেমন বমি বমি ভাব করছে। ডাক্তার গগৈও পুলিশের অফিসার এবং স্টেশন-মাস্টারের সঙ্গে নীচু স্বরে কিছু কথা শেষ করে, পিন্টু আর ছোট্‌কার সঙ্গে চলে আসেন।

কী ব্যাপার ডাক্তার, তোমাদের এখানটায় হামেশাই এ ধরনের ঘটনা ঘটে নাকি।

—নাহ্‌ বন্ধু: আমার জানামতো মাইভং স্টেশনে এমন ঘটনা এই প্রথম।

—তা ব্যাপারটা কখন কীভাবে স্টেশন মাস্টার আবিষ্কার করলেন সেটা আরেকবার বলো দেখি, আমি নতুন করে আবার মিলিয়ে নিই। তা ছাড়া পিন্টুও ব্যাপারটা বুঝে নেবে।

—বলছি শোন—প্রাত্যহিক নিয়ম মতো শেষ রাতে ঠিক তিনটেয় ডাউন কাছাড় এক্সপ্রেস এসে থামে মাইভং স্টেশনে। এই গাড়িতেই শিলচরগামী বিভিন্ন জায়গার ডাকব্যাগ ও অন্যান্য বুকিং মালগুলি তোলা হয়। স্টেশন মাস্টারের উপস্থিতিতে রেলের কর্মীরা ডাকব্যাগগুলি তুলতে গিয়ে একটা ব্যাগে অস্বাভাবিক কিছু ঠেকতেই মাস্টারমশাই ব্যাগটা পরীক্ষা করতে চান।

—এক মিনিট। কী লক্ষণ থেকে অস্বাভাবিক ঠেকল?

—প্রতিটি ডাকব্যাগে রেল কোম্পানির যে শীলমোহর থাকে ওই ব্যাগটির বাঁধনে কিন্তু তা ছিল না।

—এগিয়ে যাও।

—স্টেশনমাস্টারের কথায় ব্যাগের মুখ খুলে দেখা গেল, ভেতরে আরো একটা পলিথিন ব্যাগে প্যাক করা এই খণ্ডিত দেহটি।

—মাস্টারবাবু ব্যাগ খুলে কী করলেন?

—উনি সঙ্গে সঙ্গেই রেলপুলিশের সাহায্য নেন। আর কিছুক্ষণ পরেই রেল ডাক্তার অর্থাৎ এই গগৈ-এর ডাক পড়ে। এর পরের সব কিছু তো তোমার উপস্থিতিতেই ঘটেছে।

—কিন্তু ডাক্তার, পুলিশ অফিসারের জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে সবাই যে জানাল মৃতদেহটা কেউ চিনতে পারছে না, এটা কী সত্যি।

—স্বাভাবিক। কারণ আমি পাঁচ বছর ধরে এই ছোট্ট শহর মাইভং-এ আছি ; খুব সম্ভবত এর আগে, এই মুখটা কোথাও দেখিনি।

—এই এলাকার সবাই কী তোমার পরিচিত?

—সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলেও অন্তত মুখগুলো চেনা।

—পিন্টু তুই কী কিছু বলবি? ছোট্‌কা এবার পিন্টুর দিকে তাকায়।

পিন্টু অনেকক্ষণ ধরেই উসুখুস করছিল। ওর মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে যে কিছু একটা বলতে চাইছে। ছোট্‌কার অনুমতি পেয়ে এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

—ছোট্‌কা, এই মৃতদেহের খণ্ডিত মুখের সঙ্গে আমাদের আগরতলায় পরিচিত একটা চেহারার যেন যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে।

—একজ্যাক্টলি। তোর সঙ্গে আমিও একমত। আমাদের যদি কোনো ভুল না হয় তাহলে মৃত লোকটা আগরতলার অন্ধকার জগতের অন্যতম নায়ক বুবু।

—তোমরা কাকা ভাইপো কী আমাকে পাগল পেয়েছ নাকি?

—কেন বন্ধু, তুমি আবার পাগল হতে যাবে কেন?

—তা না হলে সেই সুদুর আগরতলার একটা লোকের মৃতদেহ এই ছোট্ট পাহাড়ি শহর মাইভং-এর রেলওয়ের ডাকব্যাগে আসবে কী করে?

—মজা তো এইখানেই। আচ্ছা ডাক্তার একটু ভেবে বলতো, সপ্তাহ খানেকের মধ্যে কোনো নতুন মুখ এই এলাকায় দেখেছ কিনা?

ডাক্তার আচমকা চুপ মেরে যান, স্মৃতির পাতায় পৃষ্ঠা ওল্টাতে থাকেন। নিঃশব্দে পাশাপাশি চলে ওরা। আচমকা থমকে দাঁড়ান ডাঃ গগৈ। তাঁর চোখে মুখে একটা বিস্ময় ভাব ফুটে ওঠে।

—কী ডাক্তার কিছু মনে পড়ছে?

—ইয়েস মাইডিয়ার ফ্রেন্ড। দিন পাঁচেক আগে দুটো নতুন মুখ দেখি যার মধ্যে.....।

—যার মধ্যে একটি হচ্ছে ওই নিহত লোকটি।

—সিওর। কিন্তু.....।

—তার আগে বল, ওদের তুমি কোথায় কী অবস্থায় দেখেছিলে?

—মাইভং বাজারে ছোটো হলেও বেশ সুন্দর ছিমছাম ছবির মত একটি রেস্তোঁরা আছে, যেখানে বেশ সুস্বাদু বিভিন্ন খাবার পাওয়া যায়। বিশেষ করে ওই রেস্তোঁরার কফির বেশ সুখ্যাতি আছে। তবে ওইসব সুস্বাদু খাবার সাধারণ মানুষের জন্যে নয়। কেননা খাবার যেমন সুস্বাদু, পয়সার পরিমাণটাও তেমনি বেশি। একদিন এক সন্ধ্যায় ওই রেস্তোঁরায় কফি খেতে গিয়ে আমার পাশের টেবিলেই বিক্রম সিং-এর সঙ্গে হিংস্র চোহারার নতুন দুটি মুখ দেখতে পাই। ওরা যেহেতু মাতাল হয়ে বেশ উচ্চ স্বরে কথা বলছিল, তাই ওদের দিকে আমার চোখ যায়।

—তোমার ওই বিক্রম সিং লোকটা কে?

—ওরে বাপরে! ও ব্যাটা অত্যন্ত মারাত্মক আর ভয়ঙ্কর। শয়তানের অবতার বললেও কম বলা হবে।

—তাহলে এখানে পথে আর কোনো কথা নয়। বরং তোমার ঘরে বসেই আলোচনা করা যাবে।

বেড়াতে আসার মেজাজটাই নষ্ট হয়ে গেছে। ছোট্ট সুন্দর এই পাহাড়ি শহরে এসে এমন একটা বিশ্রী ঘটনায় জড়িয়ে পড়তে হবে—সত্যিই ভাবা যায় না! ছোট্কা যেখানে যায় সেখানেই ঝামেলা। পিন্টুর মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়। নতুন জায়গায় বেড়াতে এসে যদি ঘরের কোণে বন্দির মতো বসে থাকতে হয়, তাহলে কারই বা আর ভালো লাগে! ছোটকা আর ডাক্তারবাবু সকাল দশটায় বেরিয়ে গেছেন। কখন ফিরবেন ঠিক নেই।

এখন বিকেল তিনটে। পাহাড়ি অঞ্চলে শীতের বিকেল মানে অনেক। পিন্টু রীতিমতো জাম্বুবান বনে কোয়ার্টারের বারান্দায় বসে আছে। ওর মেজাজটা বিগড়ে আছে। ছোট্কা কেন যে বলে গেলেন একা না বেরোতে! ধ্যাৎ, এর কোনো মানে হয় না। শিবুদাকে কোনো কিছু না বলেই সে রাস্তায় নেমে আসে।

মাইভং-এর অন্ধকার জগতের একচ্ছত্র সম্রাট বিক্রম সিং সম্পর্কে ডাক্তারকাকু যা বললেন, তা পিন্টুকে শুধু অবাকই করেনি, অবিশ্বাস্য বলেও মনে হয়েছে। জনশ্রুতি আছে আজ থেকে প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর আগে লামডিং-এর এক বিখ্যাত ঠিকেদারের অধীনে পাথরের খোয়ারিতে কাজ করতে এসেছিল কিশোর কর্মী বিক্রম সিং। পরবর্তী সময়ে সে এই মাইভং অঞ্চলেই থেকে যায় এবং বছর পনেরোর মধ্যেই সে ঠিকেদারের অধীনে শ্রমিকের কাজ ছেড়ে দিয়ে নিজেই একজন স্বাবলম্বী ঠিকেদার হয়ে ওঠে। ওর বাস্তব বুদ্ধি আর অসম্ভব সাহসই বিক্রমকে একজন দক্ষ কূটনীতিবিদ হিসেবে গড়ে তোলে। দিবালোকে মাইভং থেকে হাফলং পর্যন্ত বেশির ভাগ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের বড়ো বড়ো ঠিকেদারি কাজ-কজ্জা করার নানান কৌশল যেমন সে শিখে নেয়, তেমনি বেআইনি পথে অন্ধকার জগতেও বিক্রম সিং একচ্ছত্র নায়ক হয়ে ওঠে। কাঁচা পয়সার লোভ দেখিয়ে বেশ কিছু বখাটে যুবকদের নিয়ে ওর নিজস্ব একটা সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলে। বিভিন্ন কায়দায় যখন তখন এদের কাজে লাগানো হয়।

সরকারি অফিসে কিংবা হাসপাতালে জীবনদায়ী ওষুধ সাপ্লাই থেকে শুরু করে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র এবং হেরোইন কিংবা ব্রাউন সুগারের মত মারাত্মক ড্রাগ পাচারের ব্যাবসাও রয়েছে। পুলিশ থেকে শুরু করে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের বেশ কিছু কর্মী বিক্রম সিং-এর কালো টাকার বাঁধনে আবদ্ধ। কেউ একটু এদিক ওদিক করলেই খুনে বাহিনীর হাতের বন্দুকের একটি বিষাক্ত ছোবল তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবে চোখের পলকে।

বিক্রম সিং সম্পর্কে যত ভাবছে ততই পিন্টুর নার্ভগুলো উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। পিন্টু ভাবছে লোকটা এত কম বয়সে যদি অপরাধ জগতের একজন নক্ষত্র হয়ে উঠতে পারে, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে এর মধ্যে বহুমুখী প্রতিভা রয়েছে। এই প্রতিভাগুলি যদি মানবকল্যাণে লাগানো যেত, তাহলে কত ভালোই না হত।

এই বিকেলেই যদিও ঠান্ডা বেশ জাঁকিয়ে বসতে চাইছে, তবু হাঁটতে খারাপ লাগছে না। ডাক্তারকাকুর

কোয়ার্টারে বসেই নীচের ছোট্ট শহরটা মোটামুটি দেখা হয়ে গেছে। পিন্টু ভাবল, সড়ক পথ ধরে ওপরের দিকে ওঠা যাক। ডাক্তারকাকুর কাছেই শুনেছে ওপরের দিকেই নাকি বিক্রম সিং-এর চমৎকার প্রাসাদোপম বাংলো বাড়ি। কলকাতা থেকে বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক স্থপতি আনিয়ে নাকি এই বাংলো বাড়ির নক্সা তৈরি করা হয়েছিল। যা একমাত্র বিক্রম সিং-এর পক্ষেই সম্ভব। যদিও ছোট্‌কা বারবার নিষেধ করে গেছেন পিন্টু যাতে একা একা কোথাও না বেরোয়। ছোট্‌কার এই অহেতুক ভয় দেখানোর কোনো কারণ সে খুঁজে পায়না। এই নতুন জায়গায় কে আর পিন্টুকে চিনতে যাবে।

পাহাড়ের চড়াই উৎরাই ভেঙে বিরাট একটা অজগরের মত শিলচরগামী যে সড়ক পথটা গেছে সেই পথেই পিন্টু আপন মনে ওপরে উঠতে থাকে। অবাক দৃষ্টিতে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। নিজের অজান্তেই সে একসময় পাহাড়ের অনেকটা ওপরে উঠে আসে। মাথার ওপরে ততক্ষণে চাঁদমামাকে দেখা যাচ্ছে। পিন্টু হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে পাঁচটা-কুড়ি। না, এবার ফেরা যাক। হঠাৎ উত্তরদিকে দৃষ্টি পড়তেই পিন্টু অবাক হয়। ছোটো-খাট একটা মালভূমির মত জায়গায় বিরাট এক অট্টালিকার মতো বাড়ি। তাহলে এটাই কি.....! পিন্টুর মাথায় বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে যায়। ওই বাড়িটার প্রতি একটা চুম্বকের মত আকর্ষণ অনুভব করে। এগিয়ে যায় সামনে। লোহার বন্ধ গেট দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে বিস্মিত হয়। পাঁচিল ঘেরা বিশাল এলাকা জুড়ে বিচিত্র সব ফুলের মেলা। ভয়ঙ্কর প্রকৃতির দুটো হিংস্র কুকুর পিন্টুর দিকে তেড়ে আসে। রক্ষা, গেট বন্ধ। পিন্টু আঁতকে উঠেছিল। সে তাড়াতাড়ি ফেরার পথ ধরে। কিন্তু তার আগেই ঝড়ের গতিতে একটা মোটরবাইক এসে দাঁড়ায় গেটের সামনে।

চোখ তুলে তাকায় পিন্টু। চালকের চেহারাটা জরিপ করে বুঝতে পারে উনিই হচ্ছেন ডাক্তারকাকু বর্ণিত বিক্রম সিং। কিন্তু ওর পেছনে বসা লোকটি কে? চমকে ওঠে সে। পলকের জন্যে হলেও লোকটাকে চিনতে পিন্টুর ভুল হয় না। ফেরার পথ ধরে দ্রুত চলতে শুরু করে সে। পেছন থেকে ভেসে আসে ওই লোকটার গলা—বিক্রম, উস্ লেড়কাকো পাকড়ো।

পিন্টু প্রাণপণে ছুটতে চায় কিন্তু পারে না। আচমকা একটা হিংস্র বাঘের থাবা যেন পেছন থেকে পিন্টুর ঘাড়ে এসে পড়ে। আর ওই এক থাবাতেই পিন্টুর স্নায়ু শিথিল হয়ে আসে।

একটা মাত্র দরজা। দ্বিতীয় আর কোনো দরজা বা জানালা নেই। এমনকি ঘরের ভেতর সূর্যালোক ঢোকার মতো একটা ঘুলঘুলিও নেই। একমাত্র দরজা বলতে ওপরের দিকে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে। তার মানে এটা একটা আন্ডারগ্রাউন্ডের গোপন ঘর। ঘরের দেয়াল গাঢ় সবুজ রঙে রাঙানো, মেঝে রঙিন পাথরে মোজাইক করা। বৈদ্যুতিক লাইনের সংযোগ থাকলেও ভেতরে এখন বৈদ্যুতিক আলো নেই। ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় বেশ বড়ো একটা মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতিটাও জ্বলতে জ্বলতে প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে।

মোমবাতির মিষ্টি আলোতেই দেখা যায় ঘরের এক কোণে হাত পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় পিন্টু পড়ে আছে। ওরা পা দুটিও বাঁধা। অনেকক্ষণ পরে একটু একটু করে পিন্টুর চেতনা ফিরে আসছে। পাশ ফিরতে গিয়ে গোঙানির শব্দ বেরিয়ে আসে। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকায়। প্রথমটায় কিছু মনে করতে পারে না। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ভীষণ ভড়কে যায়। অবশ্য খুব দ্রুতই সব কিছু মনে পড়তে থাকে। এই অবস্থায় সে কি করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। ভীষণ অসহায় লাগছে নিজেকে। কিন্তু তা বলে পড়ে পড়ে মার খাবার মত ছেলে সে নয়। হাত-পা নাড়তে কষ্ট হলেও কিছু একটা করতে হবে। মোমবাতির আলোও প্রায় শেষ হয়ে আসছে। এভাবে মুরগির মত পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না। ঠান্ডা মাথায় একটা কিছু করতে হবে।

মেঝেতে গড়িয়ে গড়িয়ে পিন্টু এবার মোমবাতির কাছে চলে আসে। বেশ কায়দা করে বাঁধা পা দুটো মোমবাতির শিখার ওপর তুলে ধরে। আঃ, জ্বলে যাচ্ছে। কিন্তু তবু দাঁতে দাঁত চেপে কষ্ট সহ্য করতে হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্লাস্টিকের দড়িটা পুড়তে শুরু করে এবং পা দুটো বন্ধনমুক্ত হয়।

এবার আরো কঠিন কাজ। পা দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে বসে পেছন ফিরে অনুমান করে হাতদুটো আগুনের ওপর ধরে। এবার কিন্তু পিন্টুর চোখে জল এসে যায়। যদিও মুখে কোনো শব্দ নেই। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে। ওকে এখান থেকে যেমন করেই হোক পালাতেই হবে।—এই জেদটাই পিন্টুর সহ্যশক্তি অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। মুক্ত হাত দুটো চোখের সামনে এনে দেখে বেশ কয়েক জায়গায় ফোসকা পড়ে গেছে। জ্বালা করছে ভীষণ। কী আর করা যাবে! হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে রাত আটটা বাজে। না আর দেরি করা যাবে না। এবার ওকে পালাতেই হবে। ছোট্‌কা নিশ্চয়ই এতক্ষণে পাগলের মতো পিন্টুকে খুঁজছে। আচ্ছা পিন্টু যদি এখান থেকে না বেরোতে পারে, আর ছোট্‌কা যদি কোনোদিনই ওকে খুঁজে না পায়, তাহলে কী হবে! না মোটেই তা হতে পারে না। পিন্টু মোটেও ভীতু ছেলে নয়। সে হতাশ হতে জানে না। বিপদে ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে সে জানে।

পিন্টু এবার উঠে দাঁড়ায়। মোমবাতির আলো শেষ হয়ে আসছে। একবার চেষ্টা করে দেখা যাক। সিঁড়ির কাছাকাছি এসে সাবধানী হয়। না, সিঁড়ির মাথায় কোনো পাহারাদার নেই। পায়ে পায়ে পাঁচটা সিঁড়ি পেরিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়। দরজা এমনভাবে আটকানো যে বোঝাই যায় না এটা দরজা নাকি দেয়াল। অনেক কসরৎ করেও উপায় খুঁজে পাওয়া গেল না। কি আর করা, পিন্টু আবার ফিরে আসে। ভেবে দেখল একমাত্র ঠান্ডা মাথায় অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। মোমবাতির আলো যখন শেষ হয়ে আসছে তখন কেউ না কেউ ভেতরে আসবেই। আর তখনই.....।

মোমবাতির স্বল্প আলোতেই পিন্টু ঘরের ভেতর পর্যবেক্ষণের কাজ শুরু করে। ঘরের এক কোণায় রঙিন পাথরের চমৎকার মোজাইকের মেঝের ওপর বেশ কয়কটা অত্যাধুনিক মেশিন। কীসের মেশিন এগুলো! আন্ডারগ্রাউন্ডের গোপনীয় কক্ষে এইসব মেশিনে নিশ্চয়ই বেআইনি কিছু একটা তৈরি হয়। অতএব এগুলো ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে হয়।

পিন্টু সতর্কভাবে একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নেয়। শরীরের প্রতিটি ইন্দ্রিয় সচেতন হয়ে ওঠে। কিন্তু না এই পাতাল পুরীতে দ্বিতীয় কোনো সজীব বস্তু আছে বলে মনে হল না। নিশ্চিত হয়ে, পিন্টু এবার তৎপর হয়ে ওঠে। ওরেব্বাস! এ যে ছোটোখাট, অত্যাধুনিক এক ছাপাখানা! একেবারে রঙিন অফসেট মেশিন। ছোট্‌কার পত্রিকা অফিসের দৌলতে ছাপাখানা সম্পর্কে পিন্টুর মোটামুটি অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু কি ছাপানো হয় এই ছাপাখানায়? পিন্টু ওর অনুসন্ধানী চোখে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। হাতে সময় খুব কম। বলা যায় না, কখন কে এসে পড়বে।

—আরে এ যে দেখছি জাল নোট তৈরির কারখানা!—আবিষ্কারের উত্তেজনায় পিন্টু আপন মনেই চিৎকার করে ওঠে। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে কাজে মন দেয়। খুঁজে পায় ভারতীয় পঞ্চাশ ও একশ টাকা তৈরির দুটি ফিল্ম। যেগুলো থেকে রঙিন অফসেট মেশিনে যত খুশি জাল নোট তৈরি করা যাবে। আরো কিছু আছে কিনা দেখতে যাবার আগেই, একটা আওয়াজ শুনে পিন্টু চমকে উঠে সেই সিঁড়ির দিকে তাকায়। ভারি পায়ের শব্দ তুলে কেউ একজন ওপর থেকে নামছে। পিন্টু চট্‌ করে একটা মেশিনের আড়ালে আত্মগোপন করে।

টুপটাপ করে আওয়াজ। এতক্ষণ পাতাল ঘরে মৃদু আলো জ্বলছিল। কিন্তু এবার বেশ কয়েকটা জোরালো আলো জ্বলে ওঠে। পাতাল ঘরের প্রতিটি বর্গ ইঞ্চি আলোর বন্যায় ভরে ওঠে। পিন্টু প্রতি মুহূর্তে বিপদের মুখোমুখি হতে নিজেকে তৈরি রাখে। মাথা তুলে তাকাতেও সাহস হচ্ছে না তার। হাঁটু গেড়ে মেঝেতে কান পেতে শোনার চেষ্টা করে। মনে হচ্ছে একজন মাত্র মানুষই খুব সতর্ক পায়ে পায়চারী করছে। পায়ের শব্দ যেন ক্রমশ এদিকেই এগিয়ে আসছে।

—এই যে বিচ্ছুয়া, চট করে উঠে দাঁড়া। নইলে আমার ভোজালির এক কোপে ধড় থেকে তোর মাথাটা আলগা করে ফেলব।

অসহায় পিন্টু চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে ওর সামনেই দীর্ঘ ফলার চকচকে ভোজালি হাতে শক্ত সমর্থ শরীরের এক কাছাড়ি যুবক। যুবক না বলে মাঝবয়সীই বলা যায়। ছোটো ছোটো চোখ দুটিতে হিংস্রতা আর নিষ্ঠুরতার ছাপ স্পষ্ট। মনে হচ্ছে মানুষ খুন করাটা ওর কাছে কোনো ব্যাপারই নয়।

পিন্টু দুইহাত মাথার ওপর তুলে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু এত সহজেই প্রাণ দিয়ে দেবার পাত্র নয় পিন্টু। পলকে একদলা থুতুছুঁড়ে মারে লোকটার চোখে। হতভম্ব আততায়ী এমন একটা ঘটনার জন্যে তৈরি ছিল না। হাত তুলে চোখ পরিষ্কার করতে গেলেই পিন্টু আচমকা লোকটার তলপেটে জোরালো একটা ক্যারাটের আঘাত হানে। আর ওই এক আঘাতেই শক্ত সমর্থ লোকটা ধপাস করে শব্দ তুলে একটা কাটা কলাগাছের মত মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে।

আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা যায় না। পকেটে হাত দিয়ে দেখে জালনোটের ফিল্মগুলো যথাস্থানেই রয়েছে। এবার ওপরে উঠে এখান থেকে পালাতে হবে। পিন্টু এখন বুঝতে পারে আগরতলায় কুখ্যাত ক্রিমিন্যালরা কেন এই সুদুর নির্জন পাহাড়ি শহর মাইভং-এ এসে ভিড় করছে। বিক্রম সিং-এর বাইকের পেছনে আগরতলার অন্ধকার জগতের ভয়ংকর নায়ক লালুকে দেখে পিন্টু চমকে উঠে পালাতে যাচ্ছিল। কিন্তু পারল না। লালুই তাহলে জাল নোট তৈরির আসল নায়ক! সেবারও জাল ওষুধ তৈরির ব্যাবসা করতে গিয়ে ছোট্কার হাতে ধরা পড়েছিল। প্রায় বছরখানেক আগে ত্রিপুরা পুলিশের প্যাঁদানি খেয়ে জাল নোট তৈরির পান্ডারা শেষ পর্যন্ত এখানে এসে, নিশ্চিন্ত মনে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে রাষ্ট্র বিরোধী কাজ করে যাচ্ছে!

সরীসৃপের মত নিঃশব্দে পাতাল পুরী থেকে বেরিয়ে আসে পিন্টু। সতর্ক চোখে চরাদিকে তাকায়। নাঃ! কেউ কোথাও আছে বলে মনে হল না। সমস্ত বাগান বাড়িটায় যেন কবরখানার নিঃস্তব্ধতা। উত্তর দিকের প্রাচীর লক্ষ করে সতর্ক পায়ে এগিয়ে চলে। প্রায় এসে গেছে, এমন সময় আচমকা বুক কাঁপানো ভয়ংকর শব্দে একটা জানোয়ার ডেকে ওঠে। পিন্টু বুঝতে পারে সেই ভয়ংকর হিংস্র কুকুরগুলো তাকে দেখে ফেলেছে। পিন্টুও চিতাবাঘের গতি নিয়ে প্রাচীর ঘেঁষা একটা চাঁপা গাছ বেয়ে উঠে যায় তরতর করে। ততক্ষণে কুকুর দুটোও এসে গেছে ঝড়ের বেগে। এদের অনুসরণ করেই একটা টর্চের আলোর ফোকাসও সঙ্গে সঙ্গেই চাঁপা গাছে এসে পড়ে। পিন্টু দেখল সর্বনাশ! শেষ মুহূর্তে এসে ধরা পড়ে যাব! কিন্তু না। পিন্টুকে ধরা এত সহজ নয়। সে ছোট্কার শিষ্য। খুব কাছেই ক্লিক করে একটা যান্ত্রিক আওয়াজ হতেই পিন্টু গাছ থেকে লাফায়। সঙ্গে সঙ্গে বাজ পড়ার মতো একটা আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে ওঠে। কিন্তু তার আগেই পিন্টু শূন্যে ভল্ট খেয়ে প্রাচীর টপকে নীচে লাফিয়ে পড়েছে। কোথাও এতটুকু লাগেনি। ছুটতে গিয়ে সে থমকে দাঁড়ায়।

—হল্ট! বুক কাঁপানো চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে জোরালো টর্চের আলো এসে পিন্টুর দু-চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। নিরুপায় পিন্টু দু-হাত মাথার ওপরে তুলে দাঁড়িয়ে পড়ে।

—সাবাশ পিন্টু! এই না হলে তুমি ছোট্কার ভাইপো!

—কে—কে আপনি?

—আরে আমি। আমি ডাক্তার গগৈ—তোমার ছোট্কার বন্ধু।

—কিন্তু আপনি এখানে কেন? আর আমার ছোট্কাই বা কোথায়?

—ঘাবড়াও মত্। তোমার ছোট্কা বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে এই বাড়ির সামনের দিকে গেছেন সব কিছু তল্লাসি করবে বলে। আর আমি কিছু পুলিশ নিয়ে এই দিকটায় ছিলাম যাতে কেউ পালাতে না পারে। চল, চল—তোমাকে না পেয়ে ছোট্কা ভীষণ ক্ষেপে আছেন। চল থানায় গিয়ে তোমার কাছ থেকে সব কথা শুনব।

রাত তখন নটা। বাইরে ভেতরে প্রচন্ড হিমশীতল ঠান্ডা। মাইভং স্টেশনের রেলওয়ে পুলিশ স্টেশনে গোল হয়ে বসে আছেন ছোট্কা, পিন্টু, ডাঃ গগৈ, স্টেশনমাস্টার ও থানার অফিসার। প্রত্যেকের সামনে এক প্লেট করে সুস্বাদু নোনতা বিস্কুট, সেই সঙ্গে ধূমায়িত কফি। আর থানার লক-আপে দাঁড়িয়ে আছে—বিক্রম সিং, লালু আর টবু আর ওদের সহকারি বজু। বিক্রম সিং-এর বাড়ি সার্চ করে এই মহাপুরুষদের পাওয়া গেছে।

প্রথমেই জানতে চাওয়া হল পিন্টুর কাছে, ঠিক কীভাবে কী ঘটেছিল, বিস্তারিত সব জানতে সবাই উদগ্রীব। ছোট্কা সস্নেহে পিন্টুর মাথায় হাত রাখেন। পিন্টু ধীরে ধীরে একে একে সবকিছু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বলে যায়। ওর কথা শেষ হলে বড়োবাবু আনন্দে উল্লসিত হয়ে পিন্টুর দু-হাত ধরে হ্যান্ডশেক করে আন্তরিক অভিনন্দন জানান আর স্টেশনমাস্টার সঙ্গে সঙ্গেই ওপরতলার কাছে পিন্টুর নামে পুরস্কার ঘোষণার জন্যে অনুরোধপত্র লিখে পাঠান। ডাক্তারবাবুতো পারলে পিন্টুকে মাথায় তুলে নাচতে শুরু করেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল, সুদূর আগরতলা থেকে এই মহাপুরুষেরা এই পাহাড়ি শহরে কীভাবে কেন এল আর কেনই বা ওরা ওদেরই একজন সঙ্গীকে অমন নৃশংসভাবে খুন করল?

এবার ছোট্কা দ্বিতীয় আর এক কাপ ধূমায়িত কফিতে চুমুক দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে বলতে শুরু করেন—

—ওদের কথা বিস্তারিত জানতে হলে আমাদের কিছুটা পেছনে যেতে হবে। আজ থেকে বছর তিনেক আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঞ্জেকশনের জালিয়াতির ব্যাপারে পুলিশের সহায়তায় ওদের আমরা গ্রেপ্তার করেছিলাম। আদালতের বিচারে ওদের তিনজনেরই মেয়াদি জেল হয়। কিন্তু যে ভাবেই হোক, ওই তিন দাগী আসামি জেল থেকে পালিয়ে যায়। পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজেছে কিন্তু কোনো হদিস করতে পারেনি। তবে ওদের জেল পালানোর কয়েকদিনের মধ্যেই একটা খবর ত্রিপুরার সর্বত্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। পুলিশ থেকে শুরু করে মন্ত্রীমহল পর্যন্ত নড়ে-চড়ে বসেন—ত্রিপুরার হাটে-বাজারে, এমনকি ব্যাঙ্কে পর্যন্ত জাল টাকার ছড়াছড়ি। বিশেষ করে পঞ্চাশ আর একশো টাকার জাল নোটে বাজার ছেয়ে ফেলেছে। গোয়েন্দা পুলিশ তৎপর হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে আমাদের খবরের কাগজের স্পেশাল সাংবাদিক হিসেবে আমিও কাজে নেমে পড়ি। গোয়েন্দা ডিপার্টমেন্ট চারিদিকে জাল বিস্তার করে। যখন জাল গোটাতে যাবে ঠিক তখনই, পাখিরা হাওয়া। উত্তর ত্রিপুরা থেকে পাখি বেরিয়ে পড়েছে।

পুলিশের খবর অপরাধীরা কৈলাশহর মহকুমার সীমান্ত পেরিয়ে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশে পালিয়েছে। প্রথমটায় আমিও বিভ্রান্তির মধ্যে ছিলাম। কিন্তু একটা সূত্র আমায় জানিয়েছিল—অপরাধীরা সীমান্ত পেরোতে পারেনি। সীমান্তে সীমান্তরক্ষী বাহিনীও এই ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ছিল।

বেশ কিছুদিন পর শিলচর শহরের আমার এক সাংবাদিক বন্ধু জরুরি তলব পাঠায়। ওখানে নাকি রহস্যজনক

কিছু ঘটনা ঘটেছে। এসে দেখলাম—শিলচরেও সেই জালনোটের রমরমা ব্যাবসা। পুলিশ অপরাধীর টিকির নাগালও পায়নি। রাষ্ট্রায়ত্ত এক ব্যাঙ্কের লকারে কোনো এক রহস্যময় পথে প্রচুর জাল নোট ঢুকে পড়েছে। বুঝলাম ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের মধ্যেই কেউ না কেউ জালনোট কারবারিদের এজেন্ট। বেশ কয়েকদিন শিলচর শহরে থেকে ওই এজেন্টকে খুঁজে পেলাম। ব্যাঙ্কেরই এক ক্যাশিয়ার। বাড়ি ওর এখানকার এই মাইভং শহরে। আমি যে ওর পেছনে লেগে আছি ওকে বুঝতে দিলাম না। ওই ক্যাশিয়ারের বাড়িতে চাকরের করতে কাজ করতেই জানতে পারলাম জাল নোটগুলো মাইভং শহর থেকেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোতে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

আজ থেকে দুই বছর আগে লালু, টবু আর বজু যখন ত্রিপুরা পুলিশের তাড়া খেয়ে শিলচরের অন্ধকার গলিতে আত্মগোপন করেছিল, তখনই মাইভং-এর অন্ধকার জগতের একচ্ছত্র সম্রাট বিক্রম সিং-এর সঙ্গে পরিচয় হয়। কথায় আছে না? 'রতনে রতন চেনে'।

—অমন দামি রত্ন কটাকে বিক্রম সিং-এর মত এক মাফিয়া ডন সাদরে এনে নিজের রাজপ্রাসাদে স্থান দেবে—এটাই তো স্বাভাবিক। ওরা ছোট্ট শহর মাইভং-এ এসে নিরাপদেই কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু আমি ওদের পিছু ছাড়িনি। আমাদের আজকের এই সফল অভিযানের জন্য আপনাদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ছোট্কা কথা শেষ করে চেয়ারে গা এলিয়ে দেন। কিন্তু উঠে দাঁড়ান ডাঃ গগৈ। উনি এসে পিন্টুর পিঠ চাপড়ে দেন। —তোমরা যাই বল না কেন বন্ধু, তোমার এই ভাইপোটি সত্যিই জিনিয়াস্। অর্ধেক কৃতিত্বই ওর একা পাওয়া উচিত। পিনাকিবাবু যেরকম পাখির মত শূন্যে উড়ে বিক্রম সিং-এর বিশ্বস্ত প্রহরীদের হাত থেকে বেরিয়ে এসেছে তার কোনো তুলনা হয় না।

পিন্টুর প্রশংসায় ছোট্কার বুক ভরে ওঠে। উনি পিন্টুকে বুকে টেনে নেন।

—সত্যিই, আমাদের এক ছোট্ট পাহাড়ি শহর মাইভং যে অমন জালনোটের বেড়াজালে জড়িয়ে পড়বে তা কোনোদিন ভাবতেও পারিনি। স্টেশন মাস্টার যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

—কিন্তু কুমারেশবাবু, ওদের এক সঙ্গীকে কেন ওরা অমন পৈশাচিকভাবে খুন করল সেটাই তো মাথায় ঢুকছে না। থানার বড়োবাবুকে চিন্তিত দেখায়।

—আসলে কি জানেন বড়োবাবু, সেই বুবু নামক লোকটা ছিল দুঃসাহসী। সে একাই জালনোট তৈরির ব্লকের ফিল্মটা নিয়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে চাইছিল। অর্থাৎ সে একাই রাজা হতে চেয়েছিল। কিন্তু তাতো হলই না, মাঝখান থেকে নিজের প্রাণটাই দিল।

রাত তখন এগারোটা। আকাশে উজ্জ্বল চাঁদ। ডাঃ গগৈ, ছোট্কা আর পিন্টু ডাক্তারের কোয়ার্টারের দিকে এগিয়ে যায়। পিন্টুর মনে তখন একটাই চিন্তা, কতক্ষণে গিয়ে গরম গরম বনমোরগের ঝোল খাবে।

বুদ্ধিমান গঙ্গারাম

নন্দকুমার দেববর্মা

গঙ্গারাম বাজার করে গাঁয়ের দিকে ফিরছিল। বিকেল বেলা, তাও একেবারে শেষ বিকেল। পাহাড়ি গ্রাম। বাজার থেকে অনেক দূর। খুব সকালে একটু খেয়ে বাজারে আসতে আসতেই দুপুর। আবার তাড়াতাড়ি বাজার করে, সপ্তাহের দরকারি লবণ, সিদল—এসব কিনে বিকেল হবার আগেই বাজার থেকে বাড়ির দিকে রওনা দিতে হয়। গঙ্গারামও তাই করছিল। আদিবাসীরা পিঠে বয়ে নেয় অনেকটা বালতির মতো দেখতে বেতের তৈরি বাস্কেট, তাতেই গঙ্গারাম অনেক জিনিস ভরে নিয়েছিল। ওটাকে 'লাঙ্গা' বা 'নখাই' বলে। তো সেদিন বাড়ির দরকারের জন্যেই একটা নারকেল কিনেছিল গঙ্গারাম।

তাড়াতাড়ি, প্রায় দৌড়ে হাঁটলেও গ্রামে পৌছতে রাত অনেক হবে। তাই গঙ্গারাম পা চালিয়ে হাঁটছিল।

বাজার ছাড়িয়ে খানিকটা গেলেই বন। দু-পায়ে পথ আঁকাবাঁকা, উঁচুনীচু। এক জায়গায় ছোট্ট একটা নদী। জল নেই বললেই চলে। নদীতে পুল বা সাঁকো নেই, হেঁটে পেরনোও কোনো ব্যাপার নয়। গঙ্গারাম আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে নদী পেরুবে এমন সময় একেবারে হাত পাঁচেক দূরেই দেখে একটা বাঘ জল খাচ্ছে। কথায় বলে "সাপের লেখা, বাঘের দেখা"। বাঘ দেখতে পেলেই কোনো রক্ষা নেই। বাঘটাও জল খাওয়া বন্ধ করে একটা লাফ দিয়ে পড়লো গঙ্গারামের উপর। গঙ্গারাম নিমেষে 'নখাই'-এ হাত দিয়ে নারকেলটা এনে একবারে বাঘের মুখে পুরে দিল। জোরে কামড় বসাতে গিয়ে দাঁত বসে গেল নারকেলে। বোকা বাঘ এবার পড়ল বিপদে। কিছুতেই নারকেলটা মুখ থেকে বের করতে পারল না। জলে কাদায় গড়াগড়ি খেতে লাগল। গঙ্গারাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখল কিছুক্ষণ। তারপর বাড়ি গেল। তবে নারকেল নিয়ে যাওয়া হল না!

অনুতাপ

পারুল দাশ
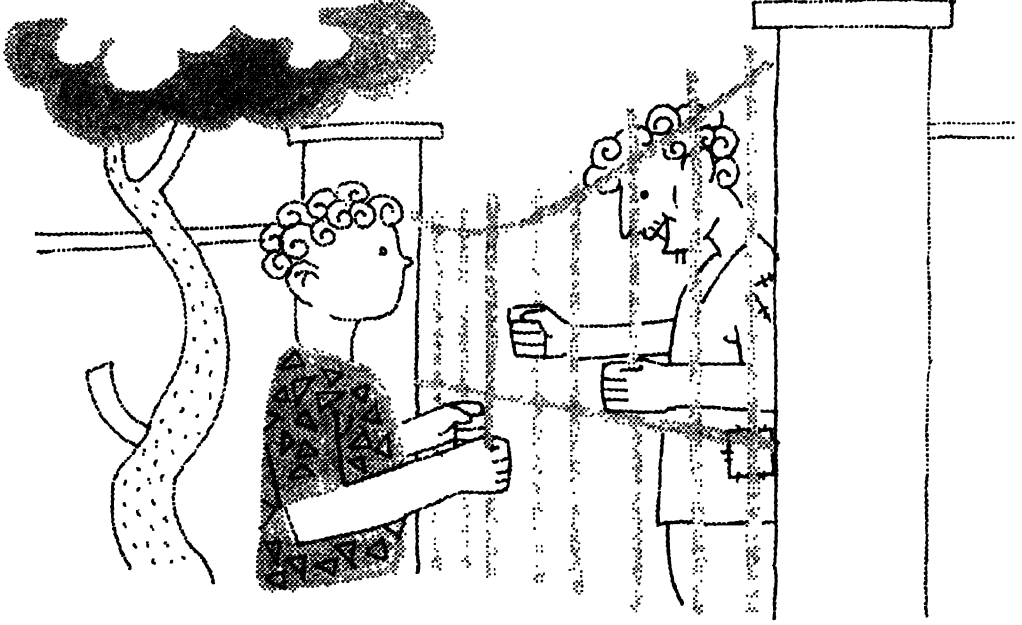
প্রতি বছরের মতো এবারও জমিদার বাড়িতে দুর্গাপুজো। জমিদার বাড়িতে আজ মহা ধুমধাম। আজ, এই অষ্টমী তিথিতে, জমিদার প্রশান্ত চৌধুরীর একমাত্র মেয়ে সুদীপ্তার অন্নপ্রাশন। বাড়িতে নানারকম গানবাজনা চলছে। এদিকে পুজোমণ্ডপে ছেলেমেয়েদের ভিড়, তাদের আনন্দ কোলাহলে মুখরিত মণ্ডপ-প্রাঙ্গণ।

পুজো বাড়িতে এমনিতেই লোকের ভিড় ; তার উপর আজ জমিদারের মেয়ের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিত অতিথিদের আগমনে বাড়ির দরজায় নানারকম গাড়িরও সমাবেশ। অতিথিদের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত রয়েছেন স্বয়ং জমিদার প্রশান্ত চৌধুরী। তাঁর প্রতিটি অতিথিই যে বড়োলোক গেটে দাঁড়ানো অগণিত দামি গাড়িগুলিই তার সাক্ষী বহন করছে।

ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা নতুন জামা-জুতো পরে আনন্দে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে। কেউ বা বাড়ির ভিতরে,—কেউ বা বাড়ির বাইরে।

এত আনন্দের মাঝেও ছ'সাত বছরের একটি ছেলে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে, আর তার মাকে বলছে, ভজুদার সঙ্গে প্রতিমা দেখতে শহরে যাব মা, ভজুদা কোথায়? আমি আর কারও সঙ্গে যাব না।

মা ধমক দিয়ে ছেলেকে বললেন, কী বললি, আর কারও সঙ্গে যাবি না? এইটুকুন ছেলের কী জেদ! তারপর নব নিযুক্ত চাকর বলাইকে দেখিয়ে বললেন, এখন থেকে তুই ওর সঙ্গেই বেড়াতে যাবি, প্রতিমাও দেখবি। ভজাকে তাড়িয়ে দিয়েছি ; ভজা চোর ; ও আর আমাদের বাড়ি আসতে পারবে না।

কিন্তু না, ছেলে কিছুতেই থামতে চায় না। সে তার মাকে কেবলই বলছে, তুমি কেন ভজুদাকে তাড়িয়ে দিলে, ভজুদা আমাকে কত ভালোবাসত! আমি ওর সঙ্গে যাব না।—বলাইকে দেখিয়ে বললে।

ছেলের কথায় তিনি তেমন কান দিলেন না। জনৈক ডাক্তার-পত্নী আসতেই তিনি চলে গেলেন তাঁর আপ্যায়নে।

দিব্যেন্দু, ওরফে দীপু, জমিদার প্রশান্ত চৌধুরীর ছেলে,—এত আনন্দ কোলাহলের মাঝেও তার মুখে কোনো হাসি নেই—সে আপন মনে একা একাই এদিক-ওদিক ঘুরছে। হঠাৎ কী খেয়াল হল,—এক দৌড়ে সে বাড়ির গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগোতে লাগল। বেশ কিছুদুর গিয়ে একটা চা-স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে যেন কাকে খোঁজার দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল

কাকে খুঁজছ খোকা?—একজন লোক দীপুকে জিজ্ঞেস করল।

ভজুদা কোথায়?—দীপু জানতে চাইল।

দীপুর মনে পড়েছে—সেদিন বলাইর সঙ্গে বেড়াতে এসে এদিককার কোন্ দোকানে যেন ওর ভজুদাকে সে চা তৈরি করতে দেখেছিল। আর ভজুদা তাকে দেখেই ছুটে এসেছিল, তাকে আদর করে লজেন্স দিয়েছিল। এবং এই লজেন্স নিয়েছিল বলে বাড়িতে গিয়ে মা'র বকুনি খেতে হয়েছিল।

ও,—ভজহরির কথা বলছ? দাঁড়াও, তাকে ডেকে দিচ্ছি—পাশের ঘরেই আছে।—এই বলে লোকটি ভেতরে চলে গেল।

এদিকে দিব্যেন্দু ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চারদিক তাকাচ্ছে! ভয় পাচ্ছে,—তাকে খুঁজতে এর মধ্যে কেউ এসে পড়ে যদি,—আর তাকে দেখতে পেয়ে নিয়ে যায় যদি? এমনি সময় বলাইকে তার দিকে দৌড়ে আসতে দেখে—দীপু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে উলটো দিকেই দৌড় দিল। দৌড়ের মধ্যেও সে স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছে, পেছন থেকে বলাই চিৎকার করে বলছে, গাড়ি আসছে দীপু, দাঁড়াও—দাঁড়াও,—এ্যা-ই—এ্যা-ই!

তারপরই সব শেষ, চোখ দুটো তার অন্ধকার হয়ে এল! চিৎকার দেবার শক্তিটুকুও যেন সে হারিয়ে ফেলল! পেছন থেকে বিরাট দৈত্যের মতো একটা গাড়ি দীপুর একটা পায়ের উপর দিয়ে চলে গেল!

এদিকে ভজহরি স্টল থেকে বেরিয়েই দেখে দীপু রক্তাক্ত দেহে রাস্তার উপর লুটিয়ে আছে,—আর বলাই গলা ছেড়ে চিৎকার করছে, আমার কী হবে গো —আমি বাবুকে কী জবাব দেব গো...!

দীপুর চারদিকে ততক্ষণে লোকের ভিড় জমে গেছে। ভজহরি সেই ভিড় ঠেলে দীপুকে পাঁজা-কোলে করে একটা রিক্সা ডেকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে গেল। এবং বলাইকে বলে গেল,—তাড়াতাড়ি বাড়িতে খবর দিতে।

খবর পেয়ে দীপুর মা-বাবা এবং বাড়ির আরও লোকজন হাসপাতালে ছুটে গেলেন। হাসপাতালে গিয়ে ওঁরা দেখেন—অজ্ঞান অবস্থায় দীপু বিছানায় শুয়ে, ওর বাঁ-পাটা ভেঙে গিয়েছে। এই অবস্থায় ডাক্তার বললেন, ওকে রক্ত দিতে হবে।

দীপুর বাবা, মা, কাকা—সঙ্গে যারা যারা এসেছিলেন সবার রক্তই পরীক্ষা করা হল, কিন্তু দীপুর রক্তের সঙ্গে কারো রক্তই মিলল না! দীপুর মা চিন্তায় ভেঙ্গে পড়লেন। এখন কী উপায় হবে!

কারও রক্তের সঙ্গে দীপুর রক্ত মিলল না দেখে,—ভজহরি গিয়ে রক্ত পরীক্ষা করাল।—আশ্চর্য! দীপুর রক্তের সঙ্গে হুবহু ওর রক্ত মিলে গেল। ভজহরি তখন নিজের রক্ত থেকে রক্ত দেবার জন্যে চলে গেল।

দীপুর মা'র মনে পড়ল—সেই দিনের ঘটনা।

প্রায় বছরখানেক আগে তিনি ভজহরিকে বাজারে পাঠিয়েছিলেন। বাজার থেকে এসে ভজহরি ঠিক ঠিক হিসাব মেলাতে পারে নি। তাই ভজহরিকে তিনি খুব গালাগাল করেছিলেন। তাঁর এখনও স্পষ্ট মনে পড়ছে, তিনি যে ভজহরিকে সেজন্যেই 'চোর' বলেছিলেন এবং ছোটে ছোটো ছেলেরাও যে চোরের সঙ্গে থাকলে নষ্ট হয়ে যায়, তাই ওর মতো চোরকে আর এ বাড়িতে রাখা হবে না, তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

আজ তাঁর এও মনে পড়ছে, তখন ভজহরি জোড়হাত করে কেঁদে কেঁদে বলেছিল, না, আমি চুরি করি নি, আমি চোর নই, মা ; বোধ হয় টাকা ক'টা বাজার থেকে আসার সময় কোথাও পড়ে গেছে! আমার কথা বিশ্বাস করুন, মা! আমাকে এ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবেন না ; আমার যে আর কেউই নেই, মা!

ভজহরির এসব কথায় সেদিন তিনি কান দেন নি। ওকে তার পরদিন সত্যি সত্যি তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

আজ তাঁর আরও মনে পড়ছে, একদিন তিনি লক্ষ করেন, বিকেল বেলা চুপি চুপি গেটে দাঁড়িয়ে আছে ভজহরি, আর তারই পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে দীপু! দীপর সঙ্গে কথা বলতে দেখে তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ভজহরিকে ডাকিয়ে নিয়ে খুব করে কষে গালাগাল দিয়েছিলেন এবং ভজহরির দেওয়া লজেন্স দুটো-ভজহরির সামনেই—দীপুর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, আর কড়া ভাষায় বলেছিলেন, আর যেন কোনোদিন ভজহরিকে এ বাড়ির ত্রিসীমানায় যিনি না দেখেন!

ভজহরি সেদিন কিছু না বলে—নত মুখে—মাথা হেঁট করে—অশ্রুসিক্ত চোখে চলে গিয়েছিলো! এরপর অবশ্য আর কোনদিন তিনি ভজহরিকে এ বাড়িতে দেখেন নি।

কিছুক্ষণ পর একজনের পায়ের শব্দে তাঁর চিন্তায় ছেদ পড়ল। দেখেন, একজন নার্স এসে একটি রক্তের বোতল দীপুর শরীরে ফিট্ করে দিয়ে গেলেন। নার্সের ফিট্ করা রক্তের বোতল থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে রক্ত বয়ে যেতে লাগল দীপুর শরীরে।

তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, আজ এ কার রক্তে তাঁর ছেলে জীবন ফিরে পাচ্ছে!—এ রক্তদাতা যে তাঁরই তাড়িয়ে দেওয়া সেই 'চোর ভজহরি'!

অনুতাপ, অনুশোচনায় আজ তাঁর দুচোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু তাঁরই দু-গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল।
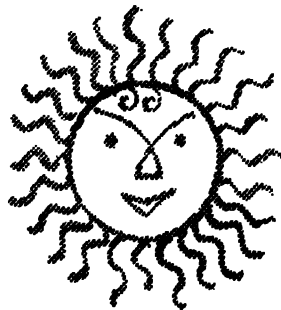
রাজপুত্রদের বুদ্ধি পরীক্ষা

পান্নালাল রায়

তোমাদের কেউ কেউ হয় তো কাহিনিটা জান। রাজপুত্রদের বুদ্ধি পরীক্ষার কাহিনি।

সে অনেক অনেককাল আগেকার কথা। ত্রিপুরা রাজ্যের রাজা তখন ডাঙ্গর ফা। রাজার আঠারো জন পুত্র। রাজপুত্রদের সবাই রাজা হতে চায়। পিতার মৃত্যুর পর তারা সবাই সিংহাসনের দাবিদার। কিন্তু এ তো অসম্ভব! সিংহাসনে তো মাত্র একজনই বসতে পারবেন! এদিকে রাজার দিন কাটে দুশ্চিন্তায়। তিনি বুড়ো হয়েছেন। চোখ বুজলে যে ত্রিপুরার কী! রাজপুত্রদের সবাই সিংহাসনের জন্য নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয়ে পড়বে। ত্রিপুরাও এগিয়ে যাবে ধ্বংসের পথে। রাজা যত ভাবেন ততই বাড়তে থাকে তাঁর উদ্‌বেগ।

মন্ত্রী একদিন পরামর্শ দিলেন রাজাকে। রাজা যেন আর কাল বিলম্ব না করে তাঁর উত্তরাধিকারী ঠিক করেন। তারপর পদস্থ রাজকর্মচারী আর প্রজাদের মধ্যে তা প্রচার করে দেন। কিন্তু তিনি কীভাবে তাঁর উত্তরাধিকারী ঠিক করবেন হবে? জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র কী তাঁর উত্তরাধিকারী হবে? কিন্তু সে তো এক অপদার্থ! তাহলে দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠ? সে তো আবার ভীষণ বদমেজাজী! রাজা কী তাঁর পুত্রদের মধ্যে যে সবচেয়ে বীর তাকেই উত্তরাধিকারী করবেন? কিন্তু শুধু বীরত্ব দিয়ে তো রাজ্য রক্ষা করা যাবে না! তাহলে? এই ভাবে রাজার মনে সারাক্ষণ নানা চিন্তা। শেষ পর্যন্ত পারিষদবর্গের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে একদিন রাজা ঠিক করলেন, রাজপুত্রদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান তাকেই তাঁর উত্তরাধিকারী ঠিক করা হবে।

এবার কোন্ রাজপুত্র সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান তা নির্বাচনের জন্য বুদ্ধি পরীক্ষার ব্যবস্থা হল। একদিন

দুপুরে রাজা তাঁর পুত্রদের সঙ্গে নিয়ে খেতে বসলেন। সোনার থালায় পরিবেশিত হয়েছে ভাত আর রকমারি সুস্বাদু ব্যঞ্জন। খাবারের গন্ধে ম ম করছে চারদিক। কিন্তু হঠাৎ এ কী? বেশ কটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে করতে ধেয়ে আসছে রাজপুত্রদের দিকে। রাজপুত্রেরা খাবে কী, কুকুরের ভয়ে তখন সবাই অস্থির। কেউ থালা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, কেউ বা থালা নিয়ে। বুভুক্ষু কুকুরগুলো খাবারের জন্য ঘেউ ঘেউ করছে। রাজারই নির্দেশে কুকুরগুলোকে বেঁধে অনাহারে রাখা হয়েছিল। তারপর রাজপুত্রগণ খেতে বসলে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু এর মধ্যেও রাজা লক্ষ করলেন, তাঁর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র রত্ন ফা দিব্যি খেয়ে চলেছে। সে তার থালা থেকে কিছু খাবার ছুঁড়ে দিয়েছে ধেয়ে আসা বুভুক্ষু কুকুরগুলোর দিকে। আর কুকুরগুলোও সেই খাবার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই সুযোগে রত্ন ফা খেয়ে নিচ্ছে।

রাজা বুঝলেন, তাঁর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র রত্ন ফাই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান। তিনি তখনই ঘোষণা করলেন, রত্ন ফা হবে তাঁর উত্তরাধিকারী। মন্ত্রী সহ পারিষদবর্গ সাধু! সাধু! করলেন রাজার এই ঘোষণায়।

কিন্তু পিতা ডাঙ্গার ফার মৃত্যুর পর রত্ন ফা সিংহাসনে বসতে পারলেন না। তাঁর অন্য ভাইগণই ষড়যন্ত্র করে তাকে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করল। কুমার রত্ন নানা দেশ ঘুরে এসে হাজির হলেন গৌড়ের নবাবের দরবারে। তিনি সব কথা খুলে বললেন নবাবকে। ভাইদের কবল থেকে পিতৃ রাজ্য উদ্ধারে চাইলেন নবাবের সাহায্য। রত্ন ফার কথাবার্তা আর ব্যবহারে নবাব সন্তুষ্ট হলেন। তিনি এক বিরাট সৈন্য বাহিনী দিয়ে সাহায্য করলেন তাঁকে। তারপর তো ভয়ংকর যুদ্ধ। যুদ্ধে জয়ী হলেন রত্ন ফা। পিতৃরাজ্য উদ্ধার করে সিংহাসনে বসলেন তিনি। সাহায্যের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রত্ন ফা বেশ কিছু হাতি ও একটি দুর্লভ মণি উপহার দিয়েছিলেন নবাবকে।

মণি উপহার পেয়ে নবাব রত্ন ফাকে উপাধি দিলেন মাণিক্য। রত্ন ফা হলেন রত্ন মাণিক্য। ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ বলেছেন, সেই থেকেই ত্রিপুরার রাজারা মাণিক্য উপাধি ধারণ করে আসছেন। রত্ন ফা অর্থাৎ রত্ন মাণিক্য হলেন 'রাজমালা' অনুসারে ত্রিপুরার ১৪৫ তম নৃপতি।

রূপকথা-লোককথা
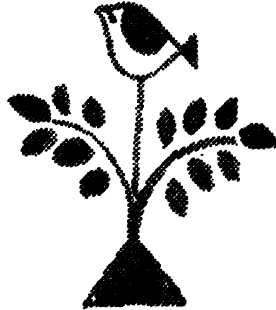
সোনার হার

শ্যামলাল দেববর্মা
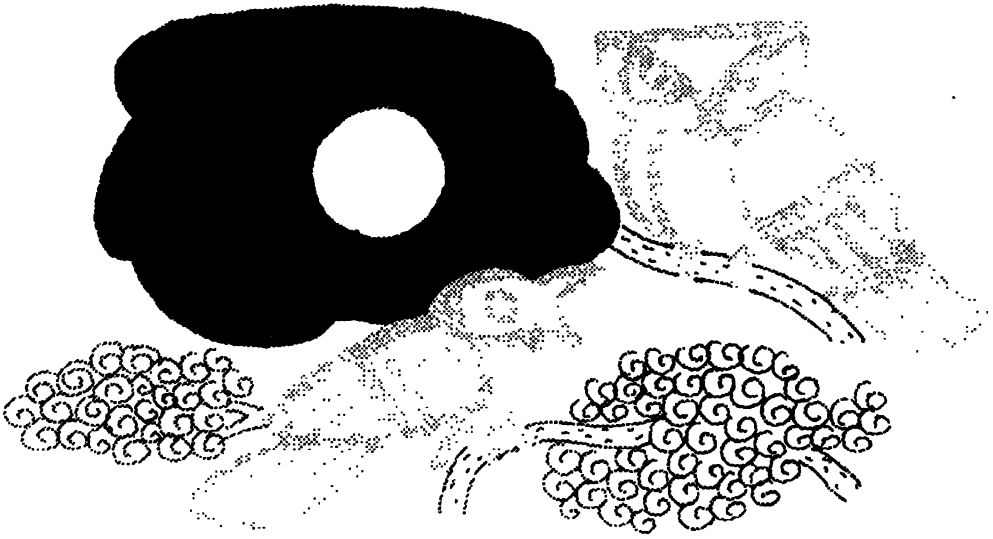
গভীর বন। সে বনের একপ্রান্তে বাস করত এক ময়না ও এক প্যাঁচা। দুজনের মধ্যে গভীর ভাব। এক সাথে খাওয়া দাওয়া করত, গল্প করত, সুখ-দুঃখের কথাবার্তা বিনিময় হত—এমনি কত কিছু। মুহূর্তের জন্য একজন আরেকজনকে না দেখলে উভয়েই যেন পাগল বনে যেত। এভাবেই দিন যায়, রাত কাটে। কত বর্ষা, কত বসন্তের যে ওরা সাক্ষী—এর হিসেব দুজনেরই নেই।

কিন্তু, হঠাৎ একদিন, আচমকা ঘূর্ণিঝড়ে সবকিছু উলটে যাওয়ার মতো ওদের মিলনের ছন্দও কেটে গেল। উভয়ে উভয়ের মুখ দেখতে চায় না, একে অন্যের সাথে কথা বলে না, এমনকি পরস্পরের ছায়াও কেউ মাড়াতে চায় না। কিন্তু কেন এমন হল! একে অপরকে না দেখলে যেখানে উভয়েই প্রায় পাগল বনে যায় সেখানে আজ এ অবস্থা কেন? বিষয়টা সত্যিই মর্মভেদী! অস্বস্তিকর বটে। তবু উভয়েই ফন্দি এঁটে চলে কী কায়দায় একে অপরকে হারানো যায়, নিজের বাগে ছিনিয়ে আনা যায় পুরস্কার। আর, পুরস্কারটা যেমন তেমন নয়-সোনার হার।

প্রতিযোগিতার বিষয়টা কী? হ্যাঁ, সেটাও বড়োই মজার। ভোর রাতে যে প্রথম উলুধ্বনি দিতে পারবে সেই পাবে পুরস্কার—সোনার হার। সুতরাং দুজনের ভাব কি আর টিকতে পারে! মিলন একেবারেই বন্ধ। ঘোষণার দিন থেকেই দুজনের মধ্যে নীরব প্রতিযোগিতা চলে সোনার হার জেতার।

প্রতিযোগিতার দিনক্ষণও এমনই বাছাই হয়েছে, যা হবে শরৎ পূর্ণিমার রাতে। আর, দেখতে দেখতে সেদিনও এসে গেল। সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ঝলসানো রুটির মতো শরৎ পূর্ণিমায় চাঁদ আকাশে ভেসে ওঠে। নির্মেঘ আকাশ। পৃথিবী ভরে উঠে জ্যোৎস্নায়। স্বপ্নময় আবেশে প্যাঁচার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় যেন। কোমরে জোর নিয়ে শুরু করে সে উলুধ্বনির রেওয়াজ। ভয়, পাশে ময়না জিতে নেয় সোনার হার। শঙ্কা, আবেগ আর উত্তেজনায় মিশ্রিত উলুধ্বনি চড়ে কখনও পঞ্চমে, কখনও সপ্তমে। শ্বাস নেওয়া কিংবা ঢোক গেলার অবসর টুকুও হারিয়ে ফেলে সে।

রাত বাড়ে। বাড়ে জ্যোৎস্নার বহরও। নিস্তব্ধ প্রায় পৃথিবীর পাহারাদার ঝিঁ ঝিঁ পোকাদের ডাক যেন

ঘুমাপাড়ানি গান। সে গানের সুর বিঁধে প্যাঁচার কানে। ঝিমুনির ভাব এসে পড়ে তাই। না, না, ঘুমুলে চলবে কী করে? ময়না সোনার হার জিতে নেবে যে! হন্তদন্ত হয়ে আবার শুরু করে সে উলু দেয়ার কাজ। এভাবেই কখনো ঝিমিয়ে কখনও হন্তদন্তভাবে উলু দিয়ে প্রায় রাত শেষ করে দিয়েছিল সে। কিন্তু শেষরক্ষা তেমন সোজা তো নয়! বিরামহীন ঝিঁ ঝিদের ঘুমপাড়ানির গান, ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস, সর্বোপরি সারা রাতের অবিরাম শ্রম অক্টোপাশের মতো আঁকড়ে ধরে তার শরীরের সব অংশকে। তাতেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে সে এবং আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে গভীর ঘুমে।

এদিকে সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশে জেগে ওঠে ময়না। দু-চোখ মেলে দেখে জ্যোৎস্নায় ভাসমান পৃথিবী। ক্লান্ত ঝিঁ ঝি পোকারা। স্নিগ্ধ হাওয়ায় ভোরের আভাস। মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে ফুটিয়ে তোলে সে উলুধ্বনির মিষ্টি সুর। সে সুরের ঢেউ আছড়ে পড়ে ঘুমন্তপুরীর দোরে। জেগে ওঠে পাখিরা। ডেকে ওঠে কিচির মিচির। মিইয়ে আসে ঝিঁ ঝিদের ডাক। ধীরে ধীরে জাগে পৃথিবী।

পূবের আকাশে ফুটে ওঠে রঙিন আভা। সে সময়ে হঠাৎ ঘুম ভাঙে প্যাঁচার। হন্তদন্ত হয়ে উলুধ্বনি দিয়ে ওঠে সে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। সোনার হার শোভা পায় ময়নার গলায়।
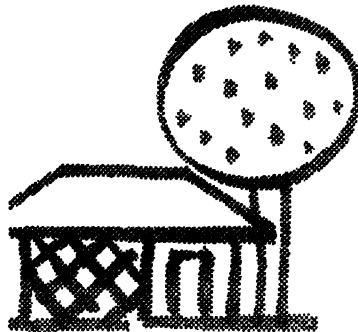
পালক রানি

রমেন্দ্রনারায়ণ সেন

দুই মেয়ে ছিল এক জুমিয়া দম্পতির, অনেক অনেক দিন আগে। দুই বোনের খুব ভাব। একে অপরকে ছাড়া থাকতে পারে না এক মুহূর্ত।

সময় পেলেই দু-বোন বেরিয়ে পড়ত বাড়ি থেকে। যখন তখন কল্‌কল্‌ ঝরনার জলে স্নান করা, ছোটো পাহাড়ি ছড়ায় সাঁতার কাটা, বনে, পাহাড়ে, জুমে ঘুরে বেড়ানো ছিল ওদের রোজনামচা।

দু-বোনের মধ্যে ছোটো বোন ছিল একটু চঞ্চল, বুদ্ধিমতী আর বড়োটি ছিল সহজ, সরল।

সেবার জ্যৈষ্ঠ মাস। ধানের সাথে জুমে প্রচুর ভুট্টা ফলেছে। একদিন দুপুরে বন পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে দু-বোন এসে পৌঁছালো ওদের জুম খেতে। বড়ো বড়ো ভুট্টার ছড়া দেখে ওদের জিভে জল এসে গেল। দু-বোন জুমের দু-ধার থেকে ভুট্টা খেতে শুরু করল।

বড়ো বোন কাঁচা পাকা যাই পেল পেড়ে পেড়ে খেতে লাগল। আর ছোটো বোন বেছে বেছে পাকাগুলো খেতে লাগলো।

ভুট্টা খেতে খেতে ছোটো বোন 'থাইসাম আলামপা' নামক একটি বুনো ফল পেল। —এই বুনো ফলটি সাধারণত ফলে খুব কম। কিন্তু এর স্বাদ ও গন্ধ বুনো ফলগুলোর মধ্যে অন্যতম। ফলটি দেখা মাত্র ছোটো বোন দেখাল বড়ো বোনকে। তা দেখে বড়ো বোন তো খুব খুশি। ছোটো বোনও আনন্দে আত্মহারা। দুজনে মিলে ঠিক করল ওদের বাড়ির পাশের ছড়ার যে ঘাটে ওরা রোজ চান করে সেখানে গিয়ে আয়েস করে খাবে ফলটি।

ওদের বাড়ির সামনের টিলার নীচেই পাহাড়ি ছড়া। শীতে খুব কম জল থাকলেও বর্ষার জলে টইটম্বুর

থাকে সে ছড়া। বুনো ফলটি নিয়ে দুবোন গেল ছড়ার পাড়ে। মোটা গাছের গুঁড়ি তৈরি ঘাটে বসে খুব আয়েস করে দু-ভাগ করে খেল বুনো ফলটি। তারপর ছড়ার জলে পা ডুবিয়ে বসে গল্প করতে লাগল দু-বোন।

গল্প করতে করতে ছোটো বোনের মাথায় একটি খেলার প্ল্যান এল।—ছড়ার জলে ওদের ঘাটের লাগোয়া একটি কাঠের লগ ভাসানো ছিল—কাঠের লগের এক প্রান্ত বাঁশের শক্ত বেত দিয়ে বাঁধা ছিল ঘাটের পাশের একটি গুঁড়ির সাথে।

ছোটো বোন বড়ো বোনকে বলল কাঠের লগটিতে গিয়ে বসতে। বড়ো বোন ঘোড়ার পিঠে বসার ভঙ্গিতে কাঠের লগটিতে গিয়ে বসল। ছোটো বোন পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে মাঝ-ছড়ায় ঠেলে দিল কাঠের লগটি।—দারুন মজা পেল বড়ো বোন।

এবার ছোটো বোন বসল কাঠের লগে আর বড়ো বোন ঠেলল তা পা দিয়ে। —খুব মজা লাগল ছোটো বোনের। এভাবে পালাক্রমে দু-বোন চড়তে লাগল কাঠের লগে।

এদিকে তখন শেষ বিকেল। পশ্চিমের আকাশ আবির লাল হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পরেই সূর্য ঘুমাবে আঁধারের লেপ মুড়ি দিয়ে। ছোটো বোন বড়ো বোনকে বলল, "সন্ধ্যা হয়ে এল বলে। আমাকে একবার চড়িয়ে দে। তারপরই চলে যাব বাড়ি।"

ছোটো বোনের কথা মতো বড়ো বোন ঠেলে কাঠের লগ। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে একটু বেশি জোরে হয়ে গেল ধাক্কা। টাল সামলাতে না পেরে ছড়ার জলে পড়ে গেল ছোটো বোন। সাঁতার দিয়ে পাড়ে আসার আগেই মস্ত একটি বোয়াল মাছ গিলে খেল ছোটো বোনকে।

হঠাৎ এ, ধরনের ঘটনায় ভীষণ ঘাবড়ে গেল বড়ো বোন। প্রচণ্ড স্রোত পাহাড়ি ছড়ার জলে। অনেকক্ষণ ছড়ার পাড়ে অপেক্ষা করে একা বাড়ি ফিরে এল বড়ো বোন।

এমনিতেই ফিরতে দেরি হয়েছে। তার ওপর ছোটো বোনকে সঙ্গে না দেখে রেগে একটু চড়া সুরেই মা বললেন, "গ্রামের সবার জুমে নিড়ানি দিয়ে ফিরছিস বুঝি? ছোটো বিচ্ছুটা কোথায়?—এখনো কাজ করছে নাকি? সাপ, খোপের ভয় নেই! রাত বিরেতেও বনেজঙ্গলে ঘোরাঘুরি। ছোটোকে নিয়ে ঘরে আয় শিগ্‌গির।"

ছোটো বোনের জন্য এমনিতেই মন খারাপ। তার ওপর মায়ের মেজাজ দেখে ভয়ে মিথ্যে কথা বলল বড়ো বোন। বলল, "ও তো আমার আগেই ফিরেছে। বলেছে রাতে দিদার বাড়ি থাকবে।"

দিদার বাড়ির কথা শুনে মা আর কিছু বলেননি। বড়ো বোন ঘরে ফিরে এলে সবাই রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লেন।

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে যথারীতি মা গেলেন ছড়ায়। খারা বোঝাই বাঁশের চোঙ নিয়ে জল আনতে ছড়ার ঘাটে গিয়ে দেখেন পাড় ঘেঁষে জলে ভাসছে গাছের পুরানো ডালের মতো জিনিস। সেটায় পা দিয়ে দুই চোঙ জল ভরতে না ভরতে বিদঘুটে শব্দ করে নড়ে চড়ে উঠল। প্রথমটায় ঘাবড়ে গেলেও পরে তিনি বুঝতে পারলেন অনেক দিনের পুরানো বিশাল মাছ। প্রায় ছুটতে ছুটতে বাড়িতে এসে খবর দিলেন স্বামীকে। মাছ ধরার ফাঁদ এনে নিপুণ হাতে ধরে ফেললেন মাছটি।—মস্ত বোয়াল মাছ। ধারালো টাক্কালের কোপে মাথা থেকে ধড় আলগা করতে যাবেন—এমন সময় মানুষের কণ্ঠে বোয়াল মাছটি বলে উঠল, "মাথায় কোপ দিওনা বাবা তাহলে আমি মরে যাব।"—একদম ছোটো মেয়ের কণ্ঠস্বরের মতো।—মাছের গলায় মানুষের সুর—হতভম্ব হয়ে গেলেন সবাই। এরপর মাছের পেটের নীচের দিক পুরোটা কেটে ফেলা হল। সবাইকে অবাক করে মাছের পেটের কাটা অংশ বাদ দিয়ে বেরিয়ে এল ওদের ছোটো মেয়ে। জড়িয়ে ধরল মাকে। খুলে বলল

গতকালের ঘটনা। মা বাবা প্রচণ্ড রেগে গেলেন বড়ো মেয়ের ওপর। সেও সব স্বীকার করে ছোটো বোনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। মায়ের রাগ কমল কিছুটা বড়ো মেয়ের উপর।—হাজার হোক নিজের মেয়ে তো। তা ছাড়া সে তো আর ইচ্ছে করে ওসব করেনি। তবে বাবার রাগ কমল না। বড়ো বোন বলে কথা।—কোথায় ছোটো বোনকে দেখে-টেখে রাখবে। বয়েস হয়েছে বটে, কিন্তু সেই অনুপাতে কাণ্ডজ্ঞান হয়নি। 'কিছু একটা শাস্তি না দিলে নিজের ভুল নিজে শোধরাতে পারবে না। এই ভেবে সারাদিন খেটে ওদের টং ঘরের পাশে টং ঘরের থেকে সাত গুণ উঁচু ছোটো একটি টং বানালেন তিনি। তারপর লম্বা মই দিয়ে বড়ো মেয়েকে সে ঘরে উঠিয়ে মই সরিয়ে নিলেন। "তোর এই অসাবধান কাজের জন্যে দুই রাত একা একা উঁচু টং-এ কাটাতে হবে। জল ছাড়া আর কিছুই খেতে দেয়া হবে না।" বললেন বাবা। শাস্তির কথায় ক্ষোভে, অভিমানে অনেকক্ষণ কাঁদল বড়ো বোন। রাত হল। এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল উঁচু টং-এ। পাখির কিচিরি মিচির গানে খুব ভোরে ঘুম ভাঙল বড়োবোনের। চোখ মেলে দেখে শত শত 'নুয়াই' পাখি উড়ছে টং-এর চারপাশ ঘিরে। পাখিদের এভাবে ঘুরতে দেখে পাখিদের মতো উড়তে ইচ্ছে হল বড়বোনের। সে 'নুয়াই' পাখির রাজাকে অনুরোধ করল যাতে ওরা সবাই একটি করে পালক দিয়ে দেয়। 'নুয়াই' পাখির রাজা বড়ো বোনের অনুরোধে রাখলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই শত শত পালকে ভরে গেল বড়ো বোনের টং। সারাদিন ধরে পালকের পর পালক জুড়ে দুটো ডানা, নিজের সমস্ত দেহ ঢেকে দেবার মতো পালকের পোশাক তৈরি করল বড়ো বোন। সন্ধে হয়ে এল। সারাদিন একটানা কাজ করেছে। দু-চোখ জড়িয়ে এল বড়ো বোনের। পালকের পোশাক আর ডানা পরেই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

পাখির কলকাকলিতে ঘুম ভাঙল ভোরে। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখে আজও টং-এর চারপাশ ঘিরে উড়ে বেড়াচ্ছে নুয়াই পাখির দল। টং-এর দরজা খুলে দিল বড়োবোন। পাখির পালক, ডানা জড়ানো বড়ো বোনকে দেখে খুব খুশি হলেন নুয়াই পাখির রাজা। বড়োবোনকে বললেন, "চলে এসো আমাদের সাথে। আকাশে উড়ে উড়ে ঘুরে দেখব গোটা দুনিয়াকে। খুব মজা হবে।" মনে মনে তাই ভাবছিল বড়ো বোন। সারারাত স্বপ্নেও দেখেছে পাখি হয়ে উড়ে বেড়ানোর। নুয়াই পাখির রাজার আবেদনে সাড়া দিয়ে টং ঘর থেকে বেরিয়ে এল বড়ো বোন। সব পাখিরা কাছে এসে ভিড় করল। নিজের পালক পরা দেহ আর পাখিদের দেখে নিজেকে পাখিই মনে হল তার। 'নুয়াই' পাখির রাজা পাশে এসে বললেন, "দাঁড়িয়ে আছো কেন? চলো!" এবার টং থেকে ঝাঁপ দিল বড়ো বোন। ডানা ঝাপটাতেই ভেসে, রইল শূন্যে। ভীষণ মজা লাগল।—নুয়াই পাখিরা ওড়ার কায়দা-কানুন শিখিয়ে দিল। পাখিদের সাথে পাড়ি দিল বড়োবোন অজানার উদ্দেশ্যে।

সারাদিন আকাশে উড়ে উড়ে অনেক কিছু দেখল বড়োবোন। খুব ভাব হয়ে গেল নুয়াই রাজার সাথে। সব পাখিরা মিলে ঠিক করল নুয়াই রাজার সাথে বিয়ে হবে বড়োবোনের। একটু লজ্জা পেল বড়োবোন।

ওই দিনই মহা ধুমধামে বিয়ে হয়ে গেল বড়োবোনের নুয়াই রাজার সাথে। বড়োবোনকে পাখিরা ডাকল 'পালক রানি' বলে। শেষ বিকেলে নুয়াই রাজাকে নিয়ে পালক রানি গিয়ে বসল ওদের বাড়ির পাশের একটি গাছের ডালে। ছোটো বোন, মা, বাবাকে ডেকে আনল বড়োবোন। খুলে বলল সব কথা। ছোটোবোনের খুব আনন্দ হল। মা বাবাও খুশি হলেন। নুয়াই পাখির রাজার সাথে মেয়ের বিয়ে হয়েছে—এ তো দারুণ ব্যাপার। পরদিন ভোরে নুয়াই রাজা আর অন্য সব পাখিদের পিঠা বানিয়ে খাওয়ালেন মা বাবা। ছোটো বোনের ভাব হয়ে গেল সব পাখিদের সাথে। এরপর থেকে নুয়াই রাজা আর পালক রানি প্রায়ই দেখা করে যায় বাড়ির লোকের সাথে। নানা দেশের বিচিত্র সব ফল এনে দেয় ছোটো বোনকে। প্রতিদিনই নতুন নতুন জায়গার গল্প শোনায় বড়োবোন ছোটো বোনকে। দারুণ আনন্দে কাটে ওদের দিন।

জমাতিয়াদের বিশ্বাস সেই থেকেই 'নুয়াই' পাখিরা তাদের গ্রামের খুব আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়।

নাঐ পাখির গল্প

নির্মল দাশ

অনেক দিন আগে এক জুম-চাষি ছিল। চাষির ছিল বুড়ো মা-বাবা, স্ত্রী ও একটি ছোট্ট মেয়ে। মেয়ের নাম খুমতি। মেয়েকে রেখে একদিন চাষির স্ত্রী গেল মরে। চাষির তো সংসার চলে না। জুম চাষ বন্ধ হয়ে গেল। শেষে চাষি আবার বিয়ে করতে বাধ্য হল।

বছর বাদে নতুন বউ এর ঘরে ফুটফুটে সুন্দর একটি মেয়ে জন্মাল। মেয়ের নাম রাখল করমতি। দুই বোন—বড়ো খুমতি, ছোটো করমতি। বোনে বোনে খুব ভাব। এভাবে তারা ধীরে ধীরে বড়োও হল। খুমতি বড়ো হলে কি হবে—ছোটো বোনের সঙ্গে সে কাজে কর্মে পেরে উঠত না। আর খুমতির গায়ের রংও ছিল একটু ময়লা। তাই মনে মনে সে করমতিকে হিংসা করত।

একদিন লাঙা নিয়ে দুই বোন গেল জুমে। ফল-তরিতরকারি আনতে হবে। কিন্তু খুমতি গিয়েই ফল তুলে খেতে লাগল। যেগুলো পছন্দ হল না, সেগুলো যেখানে সেখানে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। একটিও ফল বা তরকারি লাঙাতে ভরল না। ওদিকে করমতি বেছে বেছে ফসল তুলল, আর লাঙা ভরে ফেলল।

তখন করমতিকে খুমতি বলল, তার লাঙাতে কিছু তরকারি দেবার জন্য। কিন্তু করমতি এত যত্ন করে

ফসল তুলেছে, তার পর লাঙা ভরেছে। সে কেন তাল থেকে খুমতিকে ভাগ দেবে! খুমতি অনেক করে বলল, করমতি কিন্তু কিছুতেই কথা শুনল না। সে কোনো ফসল দিলনা খুমতিকে। মনে মনে খুমতি রাগ করল। কিন্তু ছোটো বোনকে তা বুঝতে দিল না। দুই বোন নীরবে পথ হাঁটতে লাগল।

পথেই পড়ল এক নদী। নদীর তীরে বিশাল বটগাছ। তার ডালপালা ছড়িয়ে রয়েছে নদীর মাঝ পর্যন্ত। ছায়াও পড়েছে ভালো। দু-বোন এখানে একটু জিরিয়ে নেবে ঠিক করল। বড়ো বোন খুমতি বলল, 'দেখেছিস্ কত লম্বা ডাল। নদীর উপর ঝুঁকে আছে ডালটা। এখানে দোল খেতে কত মজা হবে।' বলামাত্র দু-বোন বন থেকে লতা তুলে আনল। তারপর গাছের ডালে লতা বাঁধল। এবার দোল খাবার পালা। বড়ো বোন দোলনায় চেপে বসল। করমতিকে বলল. "ধীরে ধীরে দোলা দিস্ বোন। না হলে পড়ে যাব।" খুমতি মনের আনন্দে দোল খেতে লাগল।

একসময় করমতি দোল খেতে শুরু করল। খুমতি দোলা দিতে লাগল। আর মনে মনে ভাবতে লাগল, 'আমার লাঙা খালি যাবে! তোর লাঙায় তরকারি ভরতি। একটু তরকারি চেয়েছিলাম। তা তো দিলিনা। এবার দেখাচ্ছি মজা।' হঠাৎ খুমতি দোলনায় জোরে ধাক্কা দিল। করমতি টাল সামলাতে পারল না। পড়ে গেল নদীর জলে।

নদীর জল, করমতির গায়ের রং-এর ছোঁয়ায় হলুদ হয়ে গেল। আর নদীতে ছিল একটা বিশাল বোয়াল মাছ। সেটি কপ্ করে করমতিকে কামড়ে ধরল। খুমতি একটু ঘাবড়ে গেছিল। কিন্তু একটু পরে সে স্বাভাবিক হল। ওই লাঙার তরকারি নিজের লাঙায় ভরল। তারপর বাড়িতে ফিরে গেল। বাড়িতে গিয়ে বলল, বোন ধীরে ধীরে আসছে। তাই বোনের আসতে দেরি হচ্ছে। তারপর লাঙা রেখে সে খেতে বসল।

খুমতির ঠাকুরমা বুড়ি নদীতে চান করতে এল। নদীতে নেমে দেখল, নদীর জল হলুদ হয়ে রয়েছে। একটু অবাক হল সে। এমন তো হবার কথা ছিল না। বুড়ি ভেবেও কোনো কিনারা করতে পারল না। বুড়ি কাপড় কাচতে বসল। ঘাটের তক্তায় কাপড় আছাড় দিল। আর এমনি করমতি চেঁচিয়ে উঠল—"ওঃ ঠাকুমা আমার পায়ে লাগছে।" বুড়ি আবার কাপড় আছাড় দিল। করমতি আবার চেঁচিয়ে উঠল—'ওঃ' ঠাকুমা আমার বুকে লাগছে।' এমনি করে যতবার কাপড় আছাড় দেয়, ততবারই করমতি চেঁচিয়ে উঠে। বুড়ি এবার বুঝতে পারল, একটা অঘটন ঘটেছে। সে চারিদিকে খুঁজতে লাগল। চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'করমতি, তুই কোথায়?' অনেক কষ্টে খুব আস্তে করমতি জবাব দিল, 'আমি বোয়াল মাছের পেটে।' বুড়ি ঠাকুরমা দেখল, ঘাটের নীচে একটা মাছের লেজ দেখা যাচ্ছে। বুড়ি ঘাটের কাঠ সরিয়ে ফেলল। সে দেখল, বোয়াল মাছ করমতিকে খেয়ে ফেলছে। তবে, মাথাটা এখনো খেতে পারেনি।

বুড়ি দৌড়ে একটা ধারালো দা' নিয়ে এল। বুড়োও এল বুড়ির সঙ্গে। দুজনে মিলে মাছটাকে টেনে ওপরে তুলল। তারপর দুজনে মিলে মাছটার পেট চিরে ফেলল। মাছটাও একজন মানুষ পেটে নিয়ে বেশি নড়তে পারছিল না। শেষে বুড়ো-বুড়ি মাছের চোয়ালটাও চিরে ফেলল। করমতি বেরিয়ে এল মাছের পেট থেকে।

একটু পরে করমতি সামান্য সুস্থ হল। খুমতির সব কথা সে খুলে বলল তাদের। বুড়ো-বুড়ি বুঝল, খুমতি করমতিকে মেরে ফেলতেই চেয়েছিল। ছেলেকে সব বলবে। খুমতিকে শাস্তি দিতেই হবে।

খুমতির বাবা জুম থেকে এল। সব শুনল। তারপর মেয়েকে কঠোর সাজা দেবার জন্য তৈরি হল। বন থেকে নিয়ে এল বাঁশ। বাঁশ দিয়ে একটি খাঁচা বানাল মজবুত করে। খুমতিকে ডেকে বলল, 'ভেতরে ঢুকে দেখ্‌ত খুমতি, দাঁড়াতে পারিস কিনা!' খুমতি কিছুই বুঝতে পারেনি। সে খাঁচায় ঢুকতেই বাবা খাঁচার দরজা

টেনে দিল। খুমতি খাঁচায় বন্দি হয়ে গেল। সে ভয় পেল। অনেক চিৎকার-চেঁচামেচি করল। বাবাকে কেঁদে-কেঁদে নিজের ভুল স্বীকার করল। কিন্তু বাবা তার কোনো কথাই শুনল না। বাবা এবার খাঁচাটা একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখল। খুমতি একে একে সবাইকে বলল, খাঁচা খুলে যেন তাকে মুক্ত করে। কিন্তু কেউ তা করতে সাহস পেল না। বাবার ভয়ে কেউ খুমতিকে এক বিন্দু জল দিতেও সাহস করল না। ক্ষুধা তৃষ্ণায় খুমতি কাতর হয়ে পড়ল।

জুম চাষি মাঝে মাঝে জুমে যেত। সেদিন ভোর হতেই বাড়ির সবাই গেল জুম-খেতে। বাড়িতে শুধু রইল করমতি। খুমতি করমতিকে বলল, "বোন্, আমাকে মাফ্ করে দে। আমায় একটু জল দে।' তৃষ্মায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।" করমতি কিন্তু মনে খুব দুঃখ পেয়েছিল। বোনের জন্য সে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদত। কিন্তু বাবাকে ভয় পেত। তাই সে কিছু বলতে সাহস পেত না। সে খুমতিকে জল দিল। সঙ্গে দিল দুটো 'মায়দুল' (ভাতের মোচা)।

খেতে পেয়ে খুমতি কিছুটা শক্তি পেল। মাঝে-মধ্যে করমতি এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে দিদিকে খাবার দিত। বাড়ির কেউ এসব জানত না। দুপুরের রোদে খুমতির খুব কষ্ট হত। সে তাকিয়ে থাকত আকাশের গায়ে উড়ন্ত নাঐ পাখিদের দিকে। সে মনে মনে বলত, "ভগবান আকশের ওই পাখিদের মত আমাকে উড়ে বেড়ানোর শক্তি দাও।" খুমতি একদিন গান গেয়ে গেয়ে করুণ সুরে পাখিদের কাছে পাখা চাইল ; উড়ে বেড়ানোর শক্তি চাইল সে।

খুমতির দুঃখে পাখিদের মন ভিজে গেল। দলবেঁধে নাঐ পাখিরা এল খাঁচার কাছে। তারা সবাই খুমতিকে একটি করে পালক দিল। পরদিন এসে তারা আবার খুমতিকে একটি ঠোঁট, আর নখ দিয়ে গেল। এবার সে বাড়ির সবার কাছেই চাইল একটি সূচ আর সুতো। কিন্তু মা, মাসি, পিসি কেউ তাকে তা দিল না। শেষে ঠাকুরমা লুকিয়ে-চুরিয়ে তাকে একটা ভাঙা সূচ আর খানিকটা সুতো এনে দিল। খুমতি ভাঙা সূচ আর সুতো পেয়ে খুশি হল। এবার পাখির পালক, নখ-ঠোঁট দিয়ে একটা পোশাক তৈরি করল। ঠিক নাঐ পাখির মতো হল পোশাকটা। সবাই সেদিন জুমে চলে গেল। খুমতি পোশাকটা পরীক্ষা করতে চাইল। কিন্তু কি আশ্চর্য! গায়ে লাগানো মাত্র পোশাকটা শরীরে এঁটে গেল। শরীরে এল প্রচণ্ড শক্তি। সে একটা নাঐ পাখি হয়ে গেল।

নখ আর ঠোঁট দিয়ে সে খাঁচা ভেঙে ফেলল। খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে সে বাড়ির ওপরের আকাশে উড়তে লাগল। তার বাবা, মা দৌড়ে এল। সবাই তাকে ফিরে আসতে বলল। কিন্তু খুমতি আসবে কেন? সে বলল, "তোমরা আমায় কত কষ্ট দিয়েছ! আমি কি বোনকে মেরে ফেলতে চেয়েছি! ওর ভাগ্যের জন্য ওকে মাছে খেয়েছিল। তোমরা না বুঝে আমার ওপর নিষ্ঠুর হয়েছিলে। আমি আর আসব না।

বোনকে বলল, "বোন, তোর মঙ্গল হোক। তুই কিন্তু আমায় বুঝতে পেরেছিলি। তুই হলুদ বরণ মেয়ে। তোর ছোঁয়ায় নদীর জল হলুদ হয়েছিল। তাই সে নদীর নাম হবে 'তৌয় করম' বা 'হলুদ বরন নদী'। নাঐ পাখিরা সব এক সঙ্গে মিলিত হল। তারপর খুমতি তাদের সঙ্গে মিশে গেল। নাঐ পাখিরা সবাই ডানা মেলে একসময় দূর নীল আকাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

টুনটুনি আর হুলো বেড়াল

নিরঞ্জন চাকমা

এক যে ছিল হুলো বেড়াল, আর ছিল এক টুনটুনি। মাঝে-মধ্যে দুজনের দেখা হয়। একদিন কী ভেবে হুলো বেড়ালটা যেচে এসে বন্ধু পাতাল টুনটুনির সঙ্গে। টুনটুনির মনে সন্দেহ হয়, হাজার হোক বেড়াল হল কিনা বাঘের মাসি। নখ থাকতে যারা তা লুকিয়ে রাখে, তাদের আবার বিশ্বাস কী? টুনটুনি তাই ওপর ওপর বন্ধুর ভাব দেখালেও হিসেব করে চলে সব সময়। সে কখনো হুলোটার কাছে এসে ঘেঁসে না। থাকে গাছের ডালে ডালে, পাতায় পাতায়। রাতের বেলায় লুকিয়ে থাকে ঝোপের আড়ালে। তবু মাঝে-মধ্যে দুজনের দেখা হলে টুনটুনি নিজের মনের ভাব লুকিয়ে রেখে হুলোটার সঙ্গে বন্ধুর ভাব দেখিয়ে হেসে হেসে কথা বলে। এমনি করে কিছুদিন কেটে যায়।

এদিকে এক সময় টুনটুনির ডিম পাড়ার সময় ঘনিয়ে এল। সে তড়িঘড়ি বাসা বাঁধতে লাগল সুবিধে মতো এক ঝোপের আড়ালে। আর নজর রাখল বেড়ালটা যেন কিছুই জানতে না পারে। কারণ, তাকে বিশ্বাস নেই— কী জানি কখন কী করে বসে।

কিন্তু যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়। হঠাৎ-ই একদিন খড়কুটো নিয়ে ফেরার সময় মাঝপথে হুলোটার সঙ্গে দেখা হল টুনটুনির। দেখেই হুলো বলে ওঠে—'বন্ধু, ঘর বাঁধা হচ্ছে কী?' উপায় না দেখে টুনটুনি তখন বলল—'হ্যাঁ বন্ধু, হচ্ছে বইকি। এই তো সবে শুরুটা করেছি।' আসলে তখন টুনটুনির বাসাটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

কদিন পরে আবার দেখা হল হুলো বেড়ালটার সঙ্গে টুনটুনির। দেখেই হুলো জিজ্ঞেস করল—'বন্ধু, তোমার বাসাটার কাজ কেমন এগোল?' টুনটুনি বুদ্ধি করে জবাব দেয়—'প্রায় শেষ হয়ে এল বলে।' আসলে এদিকে তখন টুনটুনিটা দুটো ডিম পেড়ে তাতে তা দেওয়া শুরু করেছে।

আর কদিন পরে পুনরায় দেখা হল দুজনের। হুলো বলল—'বন্ধু, ডিম পাড়া হল কী?' টুনটুনি বলে 'হ্যাঁ বন্ধু, দুটো মাত্র ডিম পেড়েছি। এবার তা দেয়ার পালা।' এদিকে কিন্তু টুনটুনিটার ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়েছে তখন।

ডিম পাড়ার কথা শুনে হুলো বেড়ালটা মুখ চাটতে লাগল জিহ্বা দিয়ে। সে মনে মনে ভাবল—আর বেশিদিন নেই। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুলেই একদিন সন্ধে বেলায় টুনটুনির বাসায় গিয়ে কচি বাচ্চাগুলো মউজ করে খাওয়া যাবে। কিন্তু তার আগে তো বাসাটার খোঁজ নেওয়া দরকার। তাই সে টুনটুনিটা যেদিকে উড়ে গেছে সেদিকে চুপি চুপি এগিয়ে গেল। কিছু দূর গিয়ে একটু খোঁজাখুঁজির পরই সে একটি নীচু গাছের মগডালে টুনটুনির বাসাটার দেখা পেল। বাসাটার সন্ধান পেয়েই সে খুশি মনে আগের মতোই চুপিসারে নিজের আস্তানায় ফিরে গেল।

এদিকে টুনটুনির বাচ্চা দুটো দেখতে দেখতে বড়ো হতে লাগল। ইতি মধ্যে তাদের পাখনা গজিয়েছে—ইচ্ছেমতো ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ উড়তে শিখেছে। তাদের দেখে টুনটুনিও নিশ্চিন্ত হল। এবার হুলোটা কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না, সে মনে মনে ভাবল—এবার বাচ্চাদের কথা অনায়াসে হুলোটাকে বলা যায়।

এরপর আবার একদিন হুলোটার সঙ্গে টুনটুনির হল দেখা। দেখেই সোৎসাহে হুলো বলল—'বন্ধু, তোমর ডিম দুটো ফুটিয়েছ কী?' এবার টুনটুনি হেসে হেসে বলল—'হ্যাঁ বন্ধু, তোমার আর্শীবাদে এই কদিন আগেই ডিম দুটো মঙ্গলমতে ফুটিয়েছি বাচ্চা দুটো ভালোই আছে। দেখতে একেবারেই নাদুস-নুদুস।' টুনটুনির কথাটি শোনামাত্রই হুলোর মুখ দিয়ে লালা বেরিয়ে এল বলে। কোনো মতে নিজেকে সংযত রেখে সে প্রত্যুত্তরে বলল—'বাচ্চা দুটো মঙ্গলমতেই থাকুক, প্রার্থনা করি।'

হুলোকে বাচ্চাদের কথা বলা মাত্রই টুনটুনি ফিরে গেল নিজের বাসায়। গিয়ে সে বাচ্চা দুটিকে বলল—হুলো বেড়ালটা যে-কোনো সময় এখানে আসতে পারে আক্রমণ করতে, তোমরা সতর্ক থাকবে। এই কথাটি বলার কিছুক্ষণের মধ্যেই টুনটুনি দেখল—হুলোটা সত্যি সত্যি চুপিসারে এগিয়ে আসছে তার বাসাটার দিকে। সে বাচ্চাদের ইঙ্গিত দিল। আর উড়ে গিয়ে বসল উঁচু একটি ডালে। সেখান থেকে সে নজর রাখল বেড়ালটার দিকে। বেড়ালটি গাছের গোড়ায় পৌঁছে কাণ্ড বেয়ে তর্‌তর্‌ করে উঠে গেল গাছটির ডালে। সেখান থেকে খাপ মেরে বসে একটুখানি লেজ নেড়ে ঝপাৎ করে লাফ দিল টুনটুনির বাসার ওপর। এদিকে বাচ্চা দুটি সতর্ক ছিল। তারা চোখের পলকে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল গাছের অন্য একটি উঁচু ডালে। বেচারা বেড়ালটি কেবল ময়লা গন্ধযুক্ত শূন্য খড়কুটোর বাসাটি আঁকড়ে ধরল।

হুলোর এই নাকানি দেখে টুনটুনির খুশি আর দেখে কে! সে যার পর নাই আহ্লাদে-আধখানা হয়ে কেবলই তিড়িং-তিড়িং করে নাচতে লাগল গাছের এডাল থেকে ও-ডালে—এ-ঝোপ থেকে ও-ঝোপে, নাচতে নাচতে সে খুশিতে গেয়ে উঠল :

"বন্ধু আমার শিকার করে,
শূন্য বাসা আঁকড়ে ধরে।
এখন আমি কি করি,
বন্ধুর জন্যে লাজে মরি।"

টুনটুনির এই খুশির আমেজ বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। অত্যধিক খুশিতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো নাচতে গিয়ে হঠাৎ-ই তার লেজের গোড়ায় বিঁধে গেল ঝোপের একটি ছোট্ট কাঁটা। টুনটুনির নাচ বন্ধ হয়ে গেল। যন্ত্রণায় সে কাতরাতে লাগল। সে তখন পড়ি-মরি করে উড়ে গেল নাপিতের কাছে। নাপিতকে সেলাম জানিয়ে বলল :

"নাপিত-ভাই, বলিহারি।
আমার লেজের কাঁটা
যদি খুলতে পারিস
তবে আমি বাঁচতে পারি।"

নাপিত তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল—'টুনটুনি, তুই আস্ত এক পাগল! এত্তোটুকুন তোমার দেহ, তাতে নরুণ খানি লাগিয়ে দিতেই যে মরে যাবি, তা বুঝিস্ না? যাও-যাও এখান থেকে।'

'কী, আমি ছোট্ট বলে এতই হেলাফেলা? দেখাচ্ছি তোমাকে মজা। তোমার যন্ত্রপাতি রাখার প্যাঁটরাটি যখন ইঁদুরকে দিয়ে ছিন্নভিন্ন করাব তখন বুঝবি কতো ধানে কতো চাল।' এই কথা বলে রাগে গজরাতে গজরাতে টুনটুনি উড়ে গেল ইঁদুরটার কাছে। তার কাছে গিয়ে সে ঠুক্ করে একটি সেলাম জানিয়ে বলল :

"ইঁদুর ভাই, বলিহারি!
নাপিতের প্যাঁটরাটা
যদি কাটতে পারিস
তবেই মান রাখতে পারি।"

ইঁদুর নীচু গলায় বললে—'কী যে বলিস্ টুনটুনি। নাপিত তার যন্ত্রপাতির প্যাঁটরাটি ঝুলিয়ে রাখে তার শোবার ঘরে। আমি কেমন করে তা নাগাল পাব বলো? এ কাজ আমাকে দিয়ে হবে না ভাই, তুই যা অন্যের কাছে।' এই বলে ইঁদুরটি সর্ সর্ করে ঢুকে পড়ল তার গর্তে।

এমন ছিরির জবাব শুনে টুনটুনি যেন রাগে ফেটে পড়ে। 'নাগাল পাই না বললেই হল? আমি কী এতোই বোকা, কিচ্ছু বুঝিনা? কেবলই এড়িয়ে চলার ধান্দা! তবে যাই পুসি বেড়ালটির কাছে দেখ্‌বি মজা।' এই বলে সে উড়ে গেল পুসি বেড়ালের কাছে। তাকে যথারীতি সেলাম জানিয়ে বলল :

"বেড়াল-ভাই বলিহারি!
দুষ্টু ইঁদুরটাকে যদি
কামড়াতে পারিস
তবেই মান রাখতে পারি।"

সব শুনে পুসি বেড়াল বললে একটু গম্ভীর ভাব দেখিয়ে 'ভাই টুনটুনি, বলছো তো ভালো কথা। আমারও তো ইঁদুর খেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ইঁদুর থাকে গর্তের ভেতর লুকিয়ে, তাকে আমি পাব কোথায়? তুমি বরং অন্য কাউকে দিয়ে একাজটি করিয়ে নিও।' এই বলে পুসি বেড়ালটি তার লেজ উঁচিয়ে মিয়াঁও মিয়াঁও শব্দ করে চলে গেল তার মনিবের ঘরের ভেতর।

কথাটি শুনে টুনটুনির রাগের মাত্রা আরও গেল বেড়ে। সে তখন গেল কুকুরের কাছে। গিয়ে বলল :

"কুকুর-ভাই, বলিহারি।
বেড়ালকে তুই যদি
কামড়াতে পারিস
তবেই মান রাখতে পারি।"

'বেড়াল থাকে পালিয়ে পালিয়ে তাড়া করলেই চড়্‌চড়্ করে গাছে চড়ে বসে। বলো, কেমন করে তাকে কামড়াই?' জবাব দিল কুকুরটি। শুনে টুনটুনি ভাবল—এও দেখ্‌ছি মহা ধান্দাবাজ! একেও উচিত শিক্ষা অবশ্যই দিতে হবে। তাই সে রাগে গজ্ গজ্ করতে করতে গেল মুগুরটার কাছে। মুগুরটার কাছে গিয়ে সে একই ভঙ্গিতে বলল :

"মুগুর-ভাই, বলিহারি!
কুকুরটাকে যদি
পেটাতে পারিস
তবেই মান রাখতে পারি।"

উত্তরে মুগুরটি বুক ফুলিয়ে বললে—'তা বিলক্ষণ পেটাতে পারি। কিন্তু এক জনের হাত দিয়েই তো পেটাতে হবে। পেটাবে যে লোকটি, সে কই? সুতরাং আমাকে শুধু শুধু বলে লাভ নেই। তুমি বরং পথ দেখো।'

'বাহ্ঃ, এমনই অহংকার মুগুরটার! বলে কিনা পথ দেখো। বাপু হে, তোমাকে পুড়িয়ে ছাই করার ব্যবস্থা করছি দেখো।' এই বলে রাগে কাঁই হয়ে টুনটুনি গেল আগুনের কাছে। তাকে গিয়ে বলল :

"আগুন-ভাই, বলিহারি!
মুগুরটাকে যদি
পোড়াতে পারিস
তবেই মান রাখতে পারি।"

আগুন বলল—'মুগুরকে পোড়ানো তেমন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু মুগুরের কাছে আমাকে কে নিয়ে যাবে, তুমি?' টুনটুনি মনে মনে ভাবল—'এ সবই চালাকির কথা। আসলে দুনিয়াই বুঝি এমন, নিজের কোনো স্বার্থের ফিকির না থাকলে কেউ কারোর উপকারের জন্যে এগিয়ে আসে না।' এসব ভাবতে ভাবতে সে তখন বেজায় রাগে কাঁপতে কাঁপতে গেল জলের কাছে। সে জলকে বলল :

"জল-ভাই, বলিহারি!
আগুনকে যদি,
নেভাতে পারিস
তবেই মান রাখতে পারি।"

জলও সেই একই ভঙ্গিতে উত্তর দিল কল কল শব্দে—'আমাকে আগুনের কাছে নিয়ে গিয়ে তার ওপর ছিটিয়ে দেবে কে?' এবার টুনটুনির ধৈর্যের বাঁধ যেন ভেঙে যায়। সে শেষ চেষ্টা হিসেবে গেল হাতির কাছে। গিয়ে বলল—

"হাতি-ভাই, বলিহারি!
চুমুকে জলকে যদি
শুকোতে পারিস
তবেই মান রাখতে পারি।"

টুনটুনির কথা শুনে হাতিটা কান নেড়ে নেড়ে চোখ মিটি মিটি করে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল—'বলছো কি তুমি, জলের পরিমাণ ও গভীরতা না জেনে আমি জল শুকোতে যাব চুমুক দিয়ে? পেট যদি ফুলে ওঠে ফেটে যায়? না-না, আমি জল-টল চুমুক দিতে পারব না। তুমি বাপু, এখন পথ দেখতে পারো।' কোনো ভণিতা না করে সাফ জবাব দিল হাতিটা।

এবার যেন সত্যিই টুনটুনির চরমভাবে নিরাশ ও দিশেহারা হওয়ার পালা। বনের রাজা হাতিই যদি এমন কথা বলে নিরাশ করে দেয়, এরপর সাহায্যের জন্যে কার কাছেই বা যাওয়া যায়? এদিকে তার কাঁটার যন্ত্রণা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। তার ওপর একে একে সবারই এমন নৈরাশ্যজনক কথাবার্তা। সে তখন এমন পরিস্থিতিতে

কোনো উপায়ান্তর না দেখে শেষ চেষ্টা হিসেবে মন মরা হয়ে চলে গেল তার পুরনো বন্ধু মশাদের কাছে। সে তাদের কাছে গিয়ে বলল ঃ

"মশা-ভাইয়েরা, বলিহারি!
হাতিটাকে যদি
শায়েস্তা করতে পারিস
তবেই মান রাখতে পারি।"

একথা শুনে মশারা সবাই শাঁ-শাঁ শব্দে গর্জে উঠল। তারা সমস্বরে বলল—'সে কী কথা? অবশ্যই পারব। তা ছাড়া তুমি আমাদের বন্ধু। তোমার বিপদে-আপদে আমরা এগিয়ে আসব না? আমরা এক্ষুণি সবাই যাচ্ছি সেই বেয়াড়া হাতিটাকে শায়েস্তা করতে। তার এতো বড়ো সাহস আমাদের বন্ধুকে উপেক্ষা করে! বন্ধু চলো, এক্ষুণি হাতিটার কাছে আমাদের নিয়ে যাও।' এ কথা বলে ঝাঁকে ঝাক মশা শাঁ শাঁ শব্দে উড়ে চলল টুনটুনির পিছে পিছে। হাতিটা কাছেই এক গভীর বনে চরে বেড়াচ্ছিল। হাতিটার নিকট পৌঁছেই মশারা লাখ-লাখ—কোটি-কোটি সংখ্যায় তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তারা হাতিটার নাকে-মুখে, চোখের পাতায়, লেজ ও কানের গোড়ায় কামড়াতে লাগল। মশার কামড়ে হাতিটা অস্থির হয়ে উঠল। সে যন্ত্রনায় কাতর হয়ে মুহুর্মুহু বিকট বৃংহন শব্দে বন-বাদাড় কাঁপিয়ে তুলল। মশার তাড়নায় হাতিটা দিশেহারা হয়ে এদকি-ওদিক পাগলের মতো ছুটো ছুটি করতে লাগল। এমন সময় সে হঠাৎ-ই দেখতে পেল টুনটুনিটাকে দূর থেকে তার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। হাতিটা বুঝতে পারল এই টুনটুনিটার কথায় মশাদের এমন সংঘবধ্ধ অতর্কিত আক্রমণ। সে তখন টুনটুনিকে মিনতি করে বলল—'দোহাই টুনটুনি-ভাই, তোমার মশাদের থামাও, আমি এক্ষুণি জলটাকে চুমুক দিয়ে শুকোতে যাচ্ছি।' এই বলে হাতিটা দৌড়ে চলল জলের দিকে। টুনটুনির কথায় মশারাও নিরস্ত হল।

হাতিটা জলের কাছে পৌঁছতেই জল আর্ত চীৎকার দিয়ে হাতিকে মিনতি করে বলল—'দোহাই তোমার, আমাকে চুমুক দিয়ে খেয়ো না। বরং তুমি আমাকে তোমার শুঁড়ে করে নিয়ে চল আগুনের কাছে, তাকে আমি নিভিয়ে দেব।' জলের এই মহা বিপদের কথা তৎক্ষণাৎ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। খবরটা আগুনের কাছেও গেল। শুনে সেও বলল—'আমাকে কেউ নিয়ে যাও মুগুরটার কাছে। তাকে পুড়িয়ে আমি ছাই করে দেব।' আগুনের কথা শুনল মুগুরটা। সেও ভয়ে বলে উঠল আমাকেও কেউ নিয়ে চলো কুকুরটার কাছে। আমি তাকে বেদম পিটিয়ে শায়েস্তা করব।' মুগুরের কথা গিয়ে পৌছল কুকুরটার কাছে। সেও ঘেউ ঘেউ করে বলে দিল—'এই আমি চললাম বেড়ালকে কামড়াতে।' সে খবর শুনে বেড়াল মিঁয়াও মিঁয়াও করে বলল—'আমিও যাচ্ছি ইঁদুরটাকে ধরতে।' সে কথা শুনে ভয়ার্ত ছোট্ট ইঁদুরটি পড়ি-মরি করে দৌড়ে চলল নাপিতের যন্ত্রপাতি রাখার প্যাঁটরাটি কুটি কুটি করে কামড়ে দিতে। শেষমেষ ইঁদুরটার আগমনের খবরটা গিয়ে পৌছল নাপিতের কাছে। সে ইঁদুরটার পৌছানোর আগেই ঘোষণা করে দিল—'আমি টুনটুনির লেজের কাঁটা খুলতে রাজি।' নাপিতের এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে টুনটুনিটা সেখানে গিয়ে হাজির। নাপিত তড়িঘড়ি তার প্যাঁচটরা থেকে নরুনখানি বের করল। টুনটুনিও সোৎসাহে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল মেঝের ওপর। নাপিত তার নরুনটি টুনটুনির লেজের গোড়ায় কাঁটাটির কাছাকাছি দু-এক গুঁতো দিতেই টুনটুনিটা যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে কাঁপতে কাঁপতে মরে গেল।

বর্ষ

অনঙ্গমোহিনী দেবী

বরষ আপন মনে, চ'লে যায় প্রাণপনে,
কোথা কোন বিস্মৃতির তীরে ;
কত শত হৃদি দলি, ওই যায় দ্রুত চলি,
কারো পানে নাহি চায় ফিরে।
কার ঝরে আঁখিধার দিবানিশি অনিবার,
শোক-বানে সদা ম্রিয়মাণ ;
নিরাশার অন্ধকার, ঢাকে দশ দিশাকার
কারো বা বিষাদে জীর্ণ প্রাণ।
তবু দ্রুত গতি তার থামে না কিছুতে আর
মানে না সে কারো অনুরোধ ;
শত শত আঁখিধারে দুখ দৈন্য হাহাকারে,
নাহি হয় তার গতিরোধ।

আষাঢ়ের মেঘ

গিরিজানাথ চক্রবর্ত্তী

ওগো আষাঢ়ের মেঘ
হাসিয়া হাসিয়া,
কোথা হ'তে এসেছিলে,—
কোথা গেলে ভাসিয়া?
হৃদয়ের কোণে ছিল
যত আশা লুকায়ে,
তুমি যেন দিয়ে গেলে
সব তা'র চুকায়ে!
শরতের সে বিভব,
হারায়ে ফেলেছি সব,
বসন্তে কুড়ান স্মৃতি
গেলে তুমি নাশিয়া,
ওগো আষাঢ়ের মেঘ হাসিয়া হাসিয়া।
আকুল আপনা হারা,
নয়নে বহিছে ধারা,
কোথা গো শীতল করা,
কোথা গেলে ভাসিয়া,
ওগো আষাঢ়ের মেঘ হাসিয়া হাসিয়া।

মাছরাঙা

হরেন ঘটক
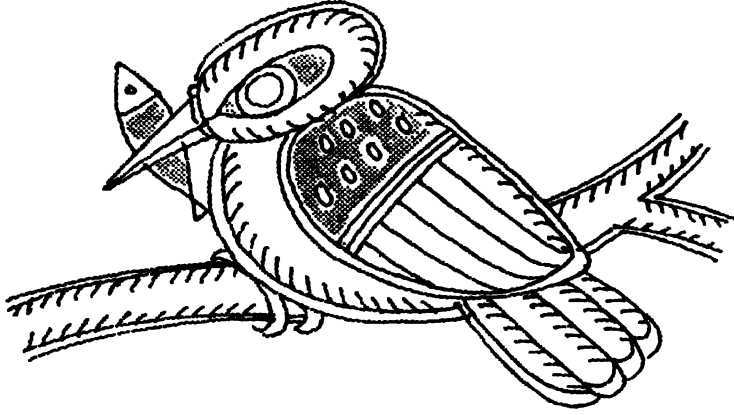
মাছরাঙা পাখি রে।
মাছ খাবি নাকি রে?
খাবি তো রে আয় না,
মিছে কেন বায়না?

আমাদের ঝিলেতে,
মাছ খায় চিলেতে।
তুই কেন খাবিনে?
পরে এলে পাবিনে।

হবে ঢের ঝামেলা!
সোজা নয় তা' মেলা।
খেতে যদি চাস তো—
পাবি বারো মাস তো।

আয় উড়ে শাঁ করে,
পাখা মেলে হাঁ করে।
ঠোঁট ভরে নিয়ে যা,
মোরে কিছু দিয়ে যা।

ভোরের আলোর তিলক পরে

অজয় ভট্টাচার্য

দুঃখে যাদের জীবন গড়া, তাদের আবার দুঃখ কিরে!
হাসবি তোরা বাঁচবি তোরা মরণ যদি আসেই ঘিরে।
অন্ধকারের শিশু তোরা আলোর তৃষায় মিছেই ঘোরা
আপন হৃদয় জ্বালিয়ে দিয়ে জ্বাল্‌বি সবার প্রদীপটিরে।

তোদের প্রাণে বন্দি হয়ে কাঁদে ভুখা-ভগবান
মুখে তবু খেলার বাঁশি যখন বুকে রয় পাষাণ
হেলায় হেসে নিলি মরণ তাইত মরণ পেলো লাজ
ধূলির সাথে মিশে তোরা সোনার মতো হলি আজ।

এবার যেরে প্রভাত আসে রাতের আঁধার গেল টুটে
ভোরের আলোর তিলক পরে বাহির পানে আয়রে ছুটে
দুঃখ তোদের জয়ের মালা দুঃখ হল মুকুট শিরে
বাঁধন হল হাতের রাখি মুক্তি এলো নয়ন-নীরে।

ঘুমোলেই রাজা

চুনী দাশ

আমি যে রে ভাই
কী করে বোঝাই
ঘুমোলেই দেখি পষ্ট,
যেই না তাকাই
দেখিতে না পাই
তাই বড়ো পাই কষ্ট!

ঘুমোলেই রাজা
ধরে দিই সাজা
যখন যাহাকে খুশি;
বন থেকে এনে
কখনো বা কিনে
হাতি গন্ডার পুষি!

হাততালি দিলে
দাসদাসী মিলে
সাজায় খাবার রাশি;
চোখ মেলি যেই
দেখি কিছু নেই
ক্ষিধের সাগরে ভাসি!

চালে নেই খড়
গরিবের ঘর
মেঘ উড়ে চুপিসারে—
ঘরের এ চালে
বারিধারা ঢালে
আমাকে চুবিয়ে মারে!

চোখ বুজি যেই
ফের রাজা সেই
থাকে না দুঃখু মোটে,
কেউ যদি ডাকে
ঘুমোলে আমাকে
তাই তো রাগটা ওঠে!!
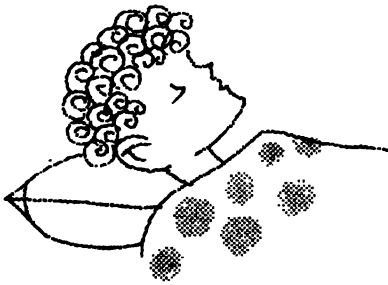
শিশুর মেলায় গানের খেলায়

করবী দেববর্মণ
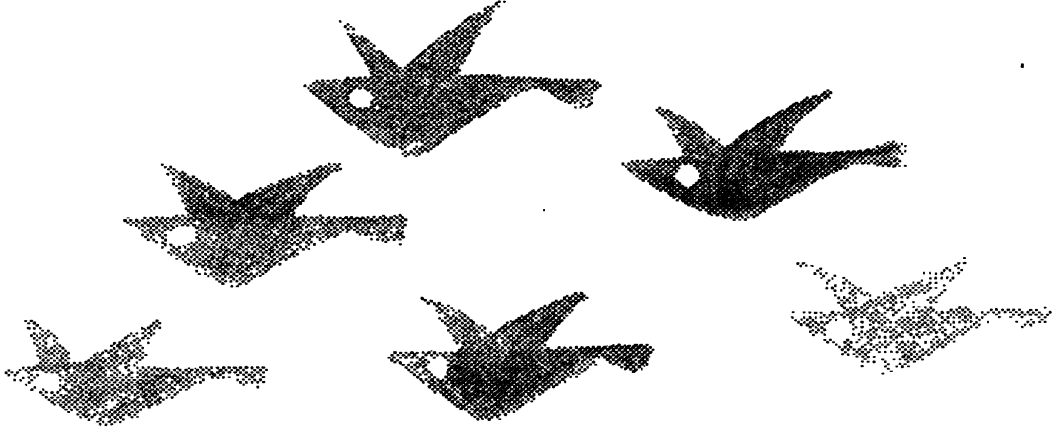
এক ঝাঁক গানের পাখি
উড়লো আকাশে
এক ঝাঁক কচি শিশু
গাইলো বাতাসে
এক রাশ রঙের ঝরণা
সারা ভুবন জুড়ে
হাজার চুমু চাঁদ পাঠালো
জোছনা মাখা সুরে
গানের পরি আহা মরি
ছড়ালো তার পাখা
শিশুর মেলায় গানের খেলায়
ভালোবাসা আঁকা।

আরেকটু দাঁড়ানা

অপরাজিতা রায়
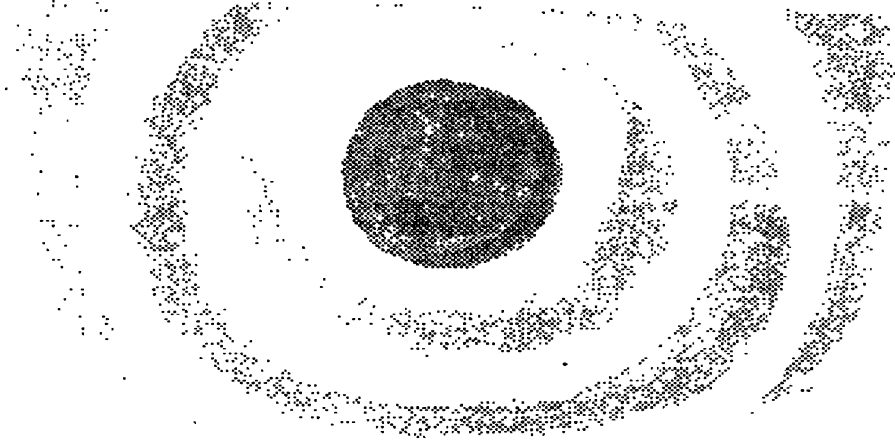
কাঠ ফাটা বোশেখে
গাছটাতে বসে কে?
ছোট্টো কোকিলটা
ভরে দিল দিলটা
ফাগুনের আমেজে।
ছিল কোন্‌খানে সে
চুপি চুপি লুকিয়ে,
সাড়া দিল "কু" দিয়ে।
দখিনের বাতাসে
ডেকে বলে কথা সে,
"আরেকটু দাঁড়ানা,
পাতাগুলো নাড়ানা।
গাটা হোক ঠান্ডা।
গাই আমি গানটা।"
গানে গানে কোকিলের
বসন্ত এল ফের
বোশেখের গরমে
কবিদের কলমে।

পুষি ক্যাট

অনিল সরকার
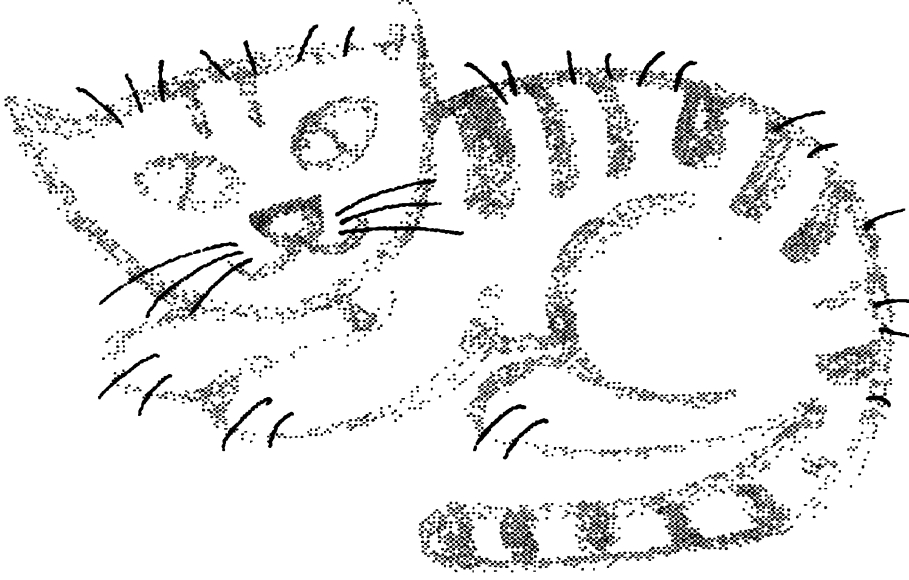
পুষি ক্যাট
পুষি ক্যাট
পুষি ক্যাট বিল্লি।

কলকাতায়
সুপ্রভাত
সন্ধ্যায় তো দিল্লি।

পুষি ক্যাট
পুষি ক্যাট
কেন মারো চিল্লি?

দুধ ভাত
চড়া দাম
কাঁদে বোন ইল্লি!!

রাজা খান
বিরিয়ানি
রানি চিকেন সুপ।

সাহেব খান
মাছের মুড়ো
চুপ চুপ চুপ!!

ইল্লি কাঁদে
বিল্লি কাঁদে
কাঁদে মিউ মিউ।

রেশন ঘরে
ভাষণ শপ
ভাতের জন্য কিউ!!

শরৎ এলেই

বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী

শরৎ এলেই মন ফুরফুর বুকের ভেতর ছন্দ
শরৎ এলেই বাতাস ভরা মিঠেল পুজোর গন্ধ
শরৎ এলেই শিউলি হাসে
দোলা লাগে শুভ্র কাশে
খুশির আমেজ আরাম আয়েস পড়লে স্কুলে বন্ধ
শরৎ এলেই মন ফুরফুর বুকের ভেতর ছন্দ।

শরৎ এলেই নতুন জামা নতুন নতুন বই—
শরৎ এলেই উচ্ছলতা, আনন্দ হইচই—
শরৎ এলেই দীঘায় ছুটি
দার্জিলিং-এ মজা লুটি
ছুটির নেশায় ছোটাছুটি সেকিরে হইচই—
শরৎ এলেই নতুন জামা নতুন নতুন বই।

শরৎ এলেই ঢাক গুড় গুড় আকাশ ভরা নীল
শরৎ এলেই শুভ্র সকাল আহ্লাদে ঝিলমিল
শরৎ এলেই পাড়ায় পাড়ায়
খুশির নেশায় মনকে তাড়ায়
দরজা খোলা ঘরে আমায় দেন না কেউ খিল
শরৎ এলেই বুক থেকে সব উড়তে থাকে চিল।

শরৎ এলেই সবুজ ঘাসে শিউলি ফুলের হাসি
শরৎ এলেই নেংটো শিশুর দুঃখ পাশাপাশি
শরৎ এলেই সদল বলে
ফুল শিশুরা রৌদ্রে জলে
কিংবা মাঠে ভাঙা হাটে ঘুমায় রাশি রাশি
শরৎ এলেই বাজতে থাকে বিসর্জনের বাঁশি।

রূপকথা নয়, চুপকথা

প্রত্যুষ দেব
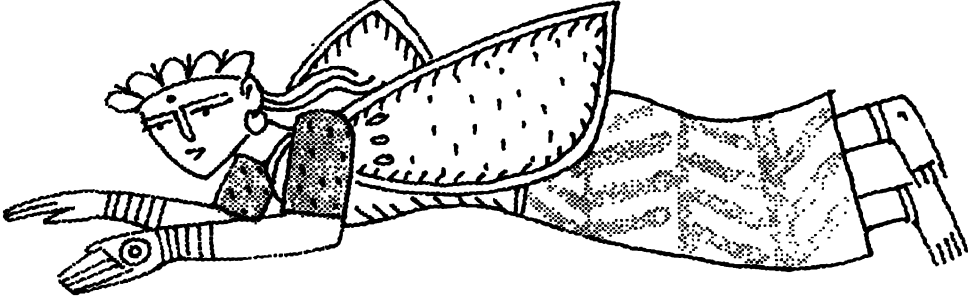
খোকন সোনা চাঁদের কণা চাঁদ নেই গো দেশে
আস্তে হাঁটো সামনে আঁধার হঠাৎ যাবে ফেঁসে
ঠাকুরদাদার রূপকথা নেই, নেই ঠাকুমার ঝুলি
আসমানের ওই মাঝখানে আজ মেঘ কালো রং তুলি
লাল পরি আর নীল পরি নেই, দত্যি দানব সব
মালুম হবে হালুম হুলুম ভীষণ কলরব
সোনার কাঠি রুপোর কাঠি রাজকন্যের ঘুম
দিন ফুরোবে রাত ফুরোবে তবুও নিজ্‌ঝুম

তেমনি সোনা তোর ভাঁড়ারে লক্ষ্মী মায়ের পা
এই ছিল, এই আর পাবি না, আয় রে দেখে যা
পক্ষীরাজের রাজপুত্তুর ফুটপাতে ঘর বাঁধে
শ্বেতমহলের রাজকন্যা উপোস করে কাঁদে
রূপকথা আর নেই রে খোকন, চুপ, কথা নয় আর
আস্তে হাঁটিস, হোঁচট খাবি, সম্মুখে আঁধার।

সামলে চলিস দু-চোখ রেখে এপাশ ওপাশ তাক
জীবন কাঠি মরণ কাঠি, এই আছিস এই ফাঁক
সেসব ছিল সোনালি দিন তোর সোনালি সাধ
আজকে খোকন রূপকথা নেই রূপের ছেঁড়া ফাঁদ।

দূষণ

সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়
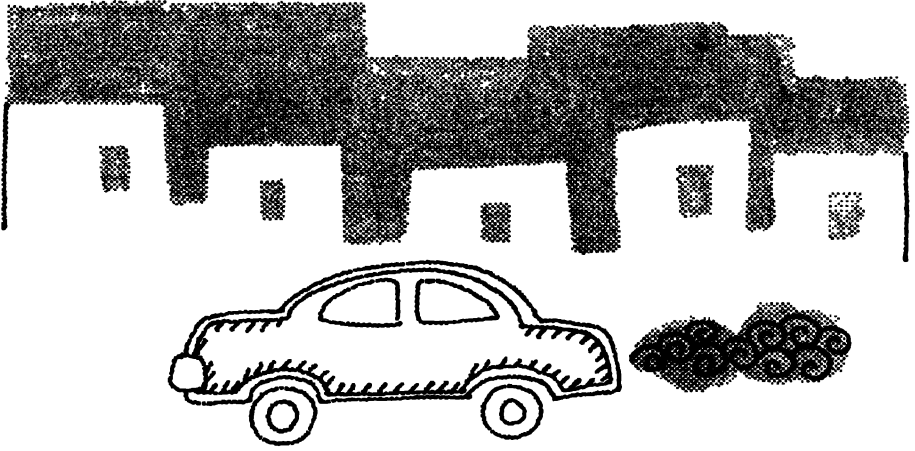
পাহাড়বনের ভেতর থেকে চশমা-বাঁদর আসেন
শহরপথে চলতে-ফিরতে খুকখুকিয়ে কাশেন
এন্নি-বাঁদর এমন দেখে এন্নি ক'রে বলে—
'এখানকার সব আমরা-বাঁদর কাশতে-কাশতে চলে।
ধুলোয়-ধোঁয়ায় ঠাসা থাকে খাশা এমন শহর
এই আমাদের রপ্ত এখন কাশাকাশির বহর!
কিন্তু ভায়া, তুমি তো সেই বনেই ভালো ছিলে
চশমাচোখে এবন ওবন ভালোই বেড়াচ্ছিলে—
হঠাৎ তোমার এ আগমন, বন থেকে শহরে?

চশমা-বাঁদর শুনেই কাঁদে—'বলবো কি আর ভায়া!
কাঠ কেটে সব বনই উধাও, মিলছে না আর ছায়া।
পাল্টে যাচ্ছে বাতাসহাওয়া অরণ্যে পাহাড়ে
বদলে তরু হচ্ছে মরু, আরেকটা সাহারা!
কিন্তু তোমার শহর জুড়ে একটুকুও নেই স্বস্তি
যেদিকে যাই, দেখছি কালো ধোঁয়াধুলোর বস্তি।

ভূতের বাড়ি নেমন্তন

অনিলকুমার নাথ

বাই বাই বাই রে
ভূতের বাড়ি যাই রে
ভূতের বাড়ি নেমন্তন
চোখে ঘুম নাই রে।

বাই বাই বাই রে
ভূতের বাড়ি যাই রে
সেই থেকে বসে আছি
ভূতের দেখা নাই রে।

বাই বাই বাই রে
ভূতের বাড়ি যাই রে
ভূত গেছে নুন আনতে
তাই গুণ গাই রে।

বাই বাই বাই রে
ভূতের বাড়ি যাই রে
বাজারেতে নুন নাই
কাঁদে ভূত হায় রে।

বাই বাই বাই রে
ভূতের বাড়ি যাই রে
জল চাইতে দিলে ভূত
দুটো জলপাই রে।

গাছ্ লাগাবো

অমল চক্রবর্তী

গাছ থেকে পাই অক্সিজেন
গাছ থেকেই খাদ্য,
গাছের কাঠেই বানাই মোরা
হরেক রকম বাদ্য।
গাছ থেকে পাই কাগজপত্র
কাপড়ও গাছ থেকে,
গাছের ছায়ায় সময় কাটাই
মনের ছবি এঁকে।
গাছই নামায় বৃষ্টিবাদল
গাছেই থাকে পাখি,
গাছের দিকেই চেয়ে চেয়ে
জুড়ায় দুটি আঁখি।
গাছ থেকে হয় নানা ওষুধ
গাছেই ধরে ফল,
গাছের ফাঁকেই বাস করে
নানান পশুর দল।
গাছেই পাখির ডাকাডাকি
সকাল দুপুর সন্ধ্যে,
গাছের ফুলেই বাগান ভরে
মিষ্টি মধুর গন্ধে।
গাছের গুনেই রান্না করি
গাছ দিয়ে হয় ঘর,
গাছের কেউ নেই যে আপন
নেই যে কেউ পর।
গাছেই রঙীন ফুলের বাহার
দেখতে আমরা পাই,
সবুজ গাছে দেশ ভরে যাক্
ইচ্ছা ভীষণ তাই।
গাছের কাছেই সহিষ্ণুতা
শিক্ষা পেতে পারি,
দেশের সবাই গাছ লাগাবো
তাইতো সারি সারি।
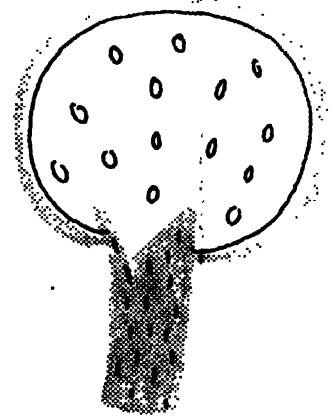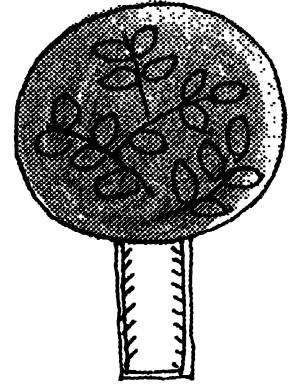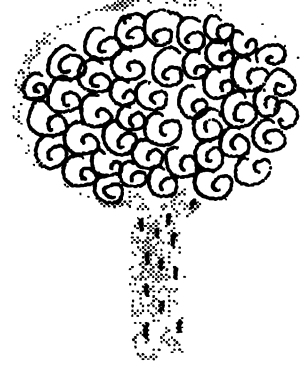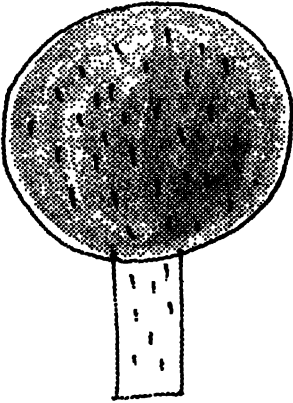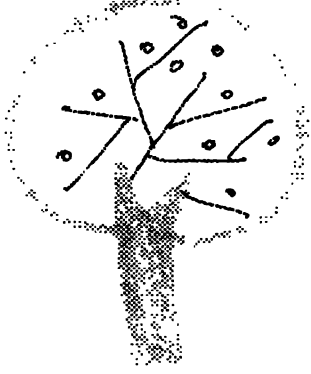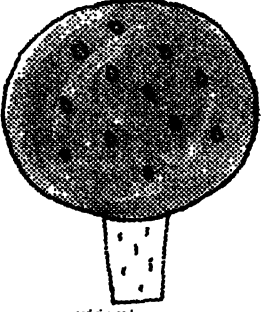
দশকিয়া

কৃষ্ণধন নাথ

বনে ছিল এক হাতি
মেলে তার দুই সাথি।

তিন পাখি গায় গান
চার বোন সাধে তান।

পাঁচ বাঘা আসে তেড়ে
ছয় ভেড়া খায় মেরে।

সাত ভাই চাঁপা ফুল
আট জনে মশগুল।

নয় চাষা করে চাষ
দশে মিলে সুখে বাস।

ঘুড়ি

ফুল্লরা ধর
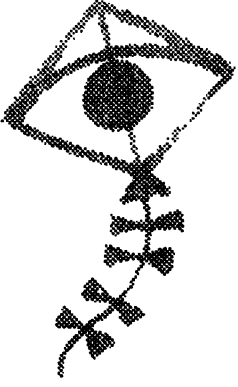
লাটাই হাতে
আপন মনে
উড়াই ঘুড়ি
আকাশ পথে
মজার খেলার
নেইকো জুড়ি।

রং-বেরঙের
নানা জাতের
ঘুড়ির মেলা
খেলতে খেলতে
কখন চলে
যায় যে বেলা।

লাটাই থেকে
সুতো ছিঁড়ে
দূর আকাশে
ছিটকে ঘুড়ি
যায় হারিয়ে
জোর বাতাসে।

লাগায় নেশা
এই খেলাটা
আমার মনে
সুযোগ পেলেই
ঘুড়ি উড়াই
ক্ষণে ক্ষণে।
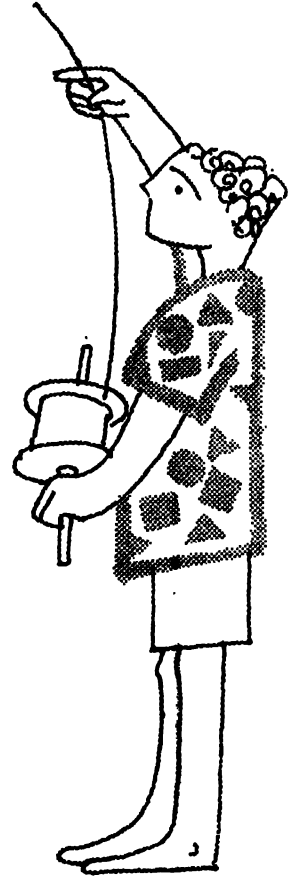
মিছিমিছি

রণেন্দ্রনাথ দেব
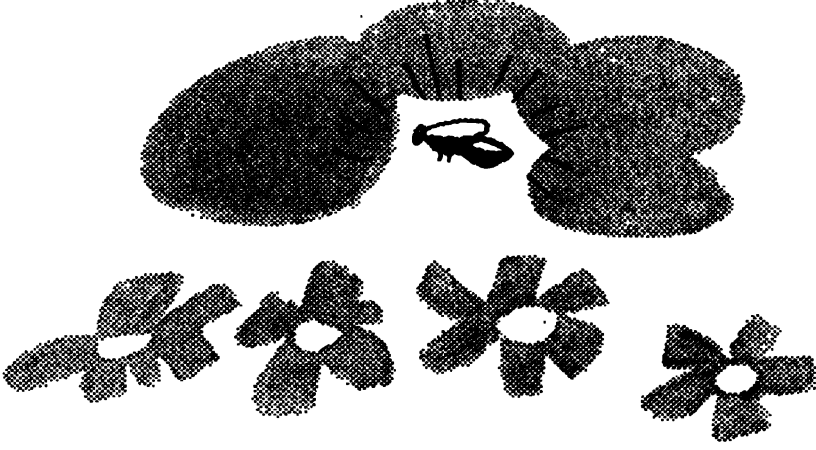
কাল রাতে জোনাকির বাতি জ্বেলে সভাতে
বসেছিল যুঁই ফুল, গোলাপ ও জবাতে ;
নদীজল কলকল করেছিল আদরে,
পাশে মাঠ শুয়েছিল জ্যোস্নার চাদরে,
ঝিঁ ঝিঁ গান গেয়েছিল মন-কাড়া রাগিনী ;
কে দেখেছে? কে শুনেছে? আমরা তো জাগিনী।
ভোর হলে ঘর ছেড়ে গেছি বটে বাইরে,
শিশিরের ছোঁয়া পেতে তবু মন নাইরে!
আমাদের হাতে শুধু নথি আছে মামলার,
কিংবা রয়েছে ভোট গোমস্তা-আমলার;
কিসে কটা টাকা হয় তাই ভাবি প্রভাতে,
মিছিমিছি ডাকে যুঁই, গোলাপ ও জবাতে।।

ফ্যালার ফ্যাসাদ

দক্ষিণারঞ্জন চক্রবর্তী

আমাদের ফ্যালারাম
অতি বড় বীর
গ্রীষ্মের অবকাশে
যাবে কাশ্মীর।
রকেটে চড়িয়া গেল
নহে বেশি দূর,
একা একা বেড়ানোর
আনন্দ প্রচুর।
মোট-ঘাট বেঁধে-ছেদে
করে তাড়াহুড়ো
হাজির হইল আজব—
পাহাড়ের চুড়ো!
কতশত ফুল ফল
অপূর্ব সুন্দর
সবুজের সমারোহ
নীরব নিথর।
রসে ভরা টুস্ টস্
পাকা পাকা ফল
আস্বাদন করিবারে
মানস চঞ্চল।
কিন্তু হঠাৎ এ কি
বিপদ ভীষণ
ফলগুলো তেড়ে আসে
করিতে ভক্ষণ।
আমড়ারা ছুটে আসে
কামড়াতে তাকে
আঙ্গুরের ছড়া তারে
জড়াইয়া থাকে।
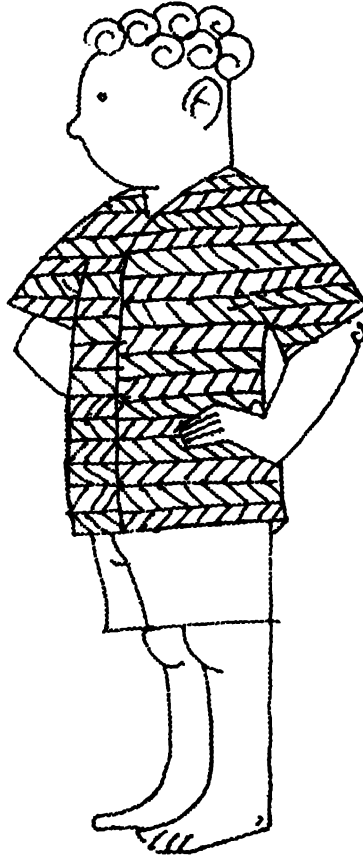
আপেল আনার আর
বেদানা সকল
খাইতে তাহারা করে
কত কোলাহল।
আমরুল জামরুল
মিটি মিটি হাসে
বাদাম কয়েৎবেল
ফেলে তারে ত্রাসে!
ঢিল ছুড়ে ছুড়ে তারে
করিছে বিব্রত
ছোটাছুটি করে ফ্যালা
ভয়ে অবিরত!
পালাবার পথ নেই
চারিদিকে ফল
দেখে ভয়ে মাথা তার
হয়েছে বিকল!
প্রাণ ভয়ে লাফ দিয়ে
জলে ঝরণার
চোখ মেলে মিটি মিটি
দেখে চারিধার।
স্বপনের ঘোরে ফ্যালা
ছিল এতক্ষণ.
খাট থেকে পড়ে গিয়ে
হইল চেতন,
হাতছাড়া হয়ে গেল
এতগুলো ফল
কামড়ের ব্যথা শুধু
হইল সম্বল।।

পুতুল

সুব্রত দেব

পুতুল পুতুল
আমার পুতুল
পুতুল হাসে না।
আমি ছাড়া
কাউকে পুতুল
ভালোবাসে না।

পুতুল পুতুল
সারাটা দিন
আমার সাথে খেলে
পুতুল পুতুল
মুখটি ব্যাজার
আমি স্কুলে গেলে।

পুতুল তখন
সারাটা দিন
মুখটি করে কালো
ফিরে শুধাই
পুতুল রে তুই
অ্যাত্তো কেন ভালো?

পুতুল আমার
আমার সাথে
মাঝেমাঝে আড়ি
পুতুল ফেলে
আমি তখন
সোজা মামাবাড়ি।

খোকনের সাধ

বিজয়কুমার দেববর্মণ

ছোট্ট পাখি বলো তোমার
কোন্ নগরে বাড়ি
ছোট্ট খোকন ডাকছে তোমায়
সঙ্গে দিতে পারি পাড়ি।

কোন্ আকাশে বেড়াও তুমি
কোন্ বাতাসে খেলো
উড়তে গিয়ে ঝাপটা মেরে
রঙীন পাখা মেলো।

খোকন যাবে তোমার বাড়ি
রাজহংসে চড়ে
পথ দেখিয়ে নিয়ে যেও
বন্ধু মনে করে।

তোমার সাথে করবে খেলা
খোকার বড়োসাধ
মেঘের রাজ্যে দেখিয়ে দিও
ঘুমপরিদের ফাঁদ।

দুই রকম

দিলীপ দাশ

পাখির পালক দিচ্ছে পাড়ি
আকাশ নামে ছোট্ট খাঁড়ি
ছয়টি ছাগল কাঁদছে—ম্যাঁ
তাদের কেন উঠছে দাড়ি?

রাঙাদিদি যাচ্ছ কই?
যাচ্ছি আমি পোলার বাড়ি
মুখের ভেতর ঠাসা কি?
আ মোলো যা—পানসুপারি।

পাতালপুরীর রাজকুমারী

রাখাল রায়চৌধুরী

পাতালপুরীর রাজকুমারী
রাজপ্রাসাদে ঘুমায়,
চতুর্দিকে পরির নাচ
ফুলের গন্ধে মাতায়।
রাজকন্যার ঘুম ভাঙ্‌বে
কেউ বলোনা কথা,
ঘুম ভাঙ্‌লে সর্বনাশ।
বাড়বে মাথা ব্যথা।
মশা-মাছি-কীট-পতঙ্গ
সবাই সাবধান,
অসি হাতে কষে কোমর
ঐ যে সর্দার পাঠান।

সময়ের রূপবদল

শ্যামলকান্তি দে

পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে
রাজার কুমার যায়
কতো সাগর পাহাড় জমি
পেছনে হারায়।
ছুটছে ঘোড়া রাত্রি দিনে
পাতাল পুরীর পথে
দৈত্যরাজা মারবে বলে
তরবারি নেয় হাতে।
দৈত্যরাজা হিংস্র বেজায়
অত্যাচারীর রাজা
রাজকন্যা বন্দী করে
বৃথাই যে দেয় সাজা।
দৈত্য মেরে রাজকুমারে
রাজকন্যা সাথে
দেশে ফিরে পক্ষীরাজ
উড়ে আকাশ পথে।
এসব অনেক গল্প গাঁথা
অথৈ জলে মিশে
হারিয়ে গেছে সাগর জলের
অজানা কোন্ দেশে।

এখন মোটরগাড়ি উড়োজাহাজ
রিমোট হাতে নিয়ে
উগ্রবাদী দৈত্য দানো
খুঁজছে হন্যে হয়ে।
দৈত্য হলো উগ্রবাদী
সেপাই রাজকুমার
দিনরাত্তির লড়ছে কতো
লড়বে কতো আর।
তরবারি আর পক্ষীরাজ যে
এই যুগেতে অচল
কম্পিউটারে ওজন করে
চোখের কতো জল।
যুগের সাথে উল্টি-পাল্টি
বদলে গেছে চলা
আকাশ জমি এক করে দেয়
হাতের ছলাকলা।
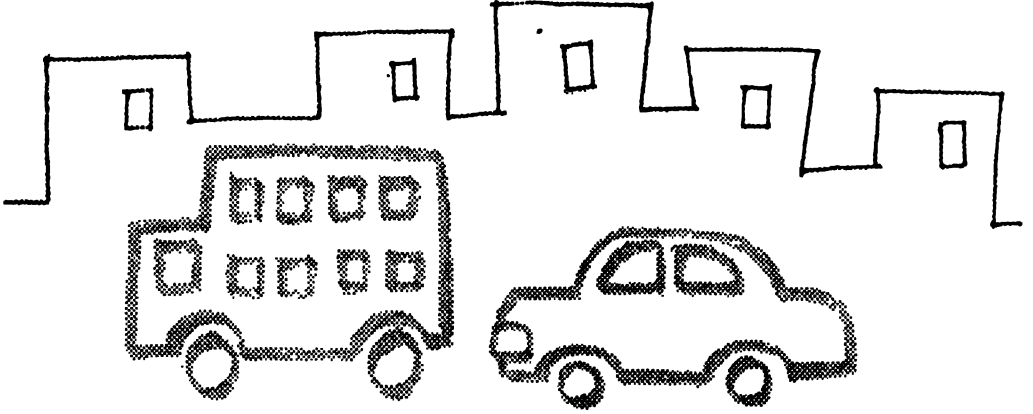
ভালোবাসি

স্বপন সেনগুপ্ত
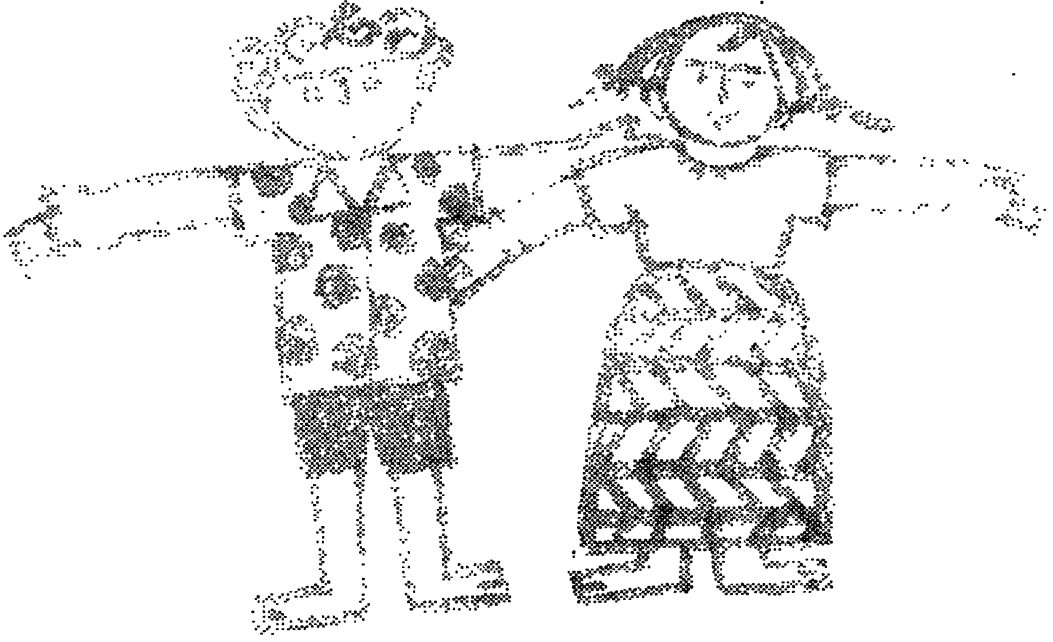
ভালোবাসি রিমঝিম
ভালোবাসি ফুলফুল
কুলকুল হাওয়া,
ভালোবাসি দারুচিনি
ভালোবাসি আমলকি
ওস্তাদের গাওয়া।
ভালোবাসি হাসিখুশি
ভালোবাসি মাসিপিসি
মুড়িভাজা চাওয়া,
ভালোবাসি আমফুল
ভালোবাসি নদীকূল
নদীজলে নাওয়া।।

গঙ্গাফড়িং

দেবীস্মিতা দেব
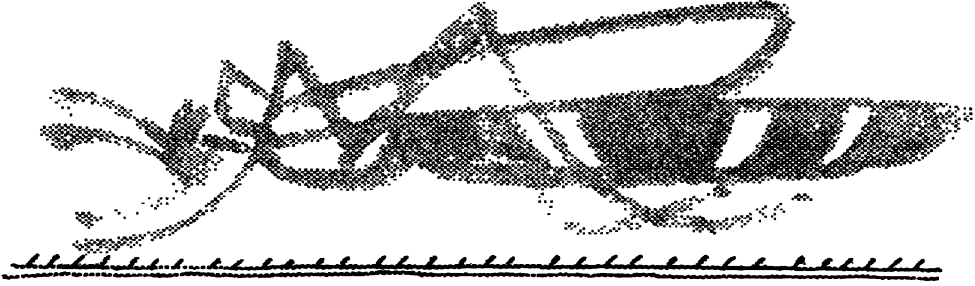
গঙ্গাফড়িং তিড়িং বিড়িং
সিঁড়িং থেকে পড়ে
ভুগছে এবার নিজেই বুঝি
ডিগ্রি চারেক জ্বরে।
সবাই দেখে গেলেন তাকে
মাছিংবাবু ছাড়া
বাবুর নাকি সে ক'টা দিন
ছিলো কাজের তাড়া।
ভাঙা পায়ে গঙ্গা বলে
'মাছির সাথে আড়ি
এবার থেকে আর যাবো না
মেছো-মাছির বাড়ি।'

আজব সব

প্রভাসচন্দ্র ধর
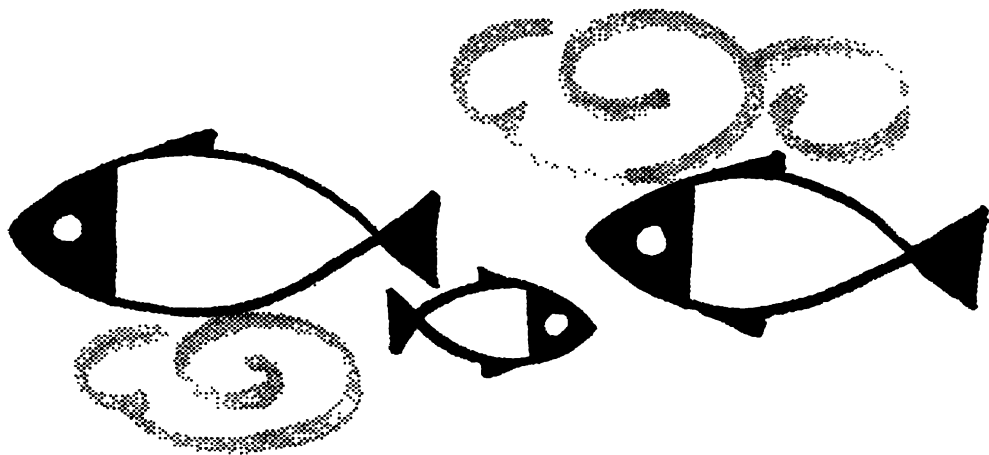
ঐ দেখ মাছগুলো আকাশে সাঁতরায়,
গোরুগুলো কেমন দেখ পুকুরে কাতরায়,
ডালিম গাছে হোথা দেখ কাঁঠাল কত ধরেছে
ঘোড়াগুলো আজ দেখ গাছে গিয়ে চড়েছে,
ফড়িংগুলো আজ কেমন খাচ্ছে রসগোল্লা
মশারির দড়ি ধরে চিবোচ্ছে আবদুল্লা।
ছেলেগুলো কাঁদছে কেবল চকোলেট খেয়ে
কাঁচালঙ্কা পেয়ে খুশি সব ক'টা মেয়ে,
সাঁঝের বেলা রোদ উঠেছে কেমন ফট্‌ফট্‌
চড়াইগুলো সব আছে বসে স্পিকটি নট্‌,
গাজর ফেলে সেজ মামা খাচ্ছে গোল আলু
পাঁঠার পিঠে সরষের তেল মাখছে দেখ ভুলু।
আজব দিনে আজব সব ঘটছে আজ মেলা
খুকুখুকি করছে পূজা ঠাম্মারা করছে খেলা।

মায়ের সুখ

জ্যোতির্ময় দাশ

আঁকাআঁকি করতে পারি,
গল্প ছড়া পড়তে পারি,
মায়ের ভাষা বুঝতে পারি,
খিলখিলিয়ে হাসতে পারি
তাতেই দারুণ সুখ।
ছোটাছুটি করতে পারি,
নৌকো বৈঠা বাইতে পারি,
সবুজ রং মাখতে পারি,
রঙে ছবি আঁকতে পারি,
আমার গাঁ-য়ের বুক।
দুষ্টুমিতে লড়তে পারি
মাটির পুতুল গড়তে পারি
মায়ের কথা শুনতে পারি,
আনন্দে মন ভরতে পারি
দেখে মায়ের সুখ।

সুয্যিমামার ছুটি

অশোক দেববর্মা
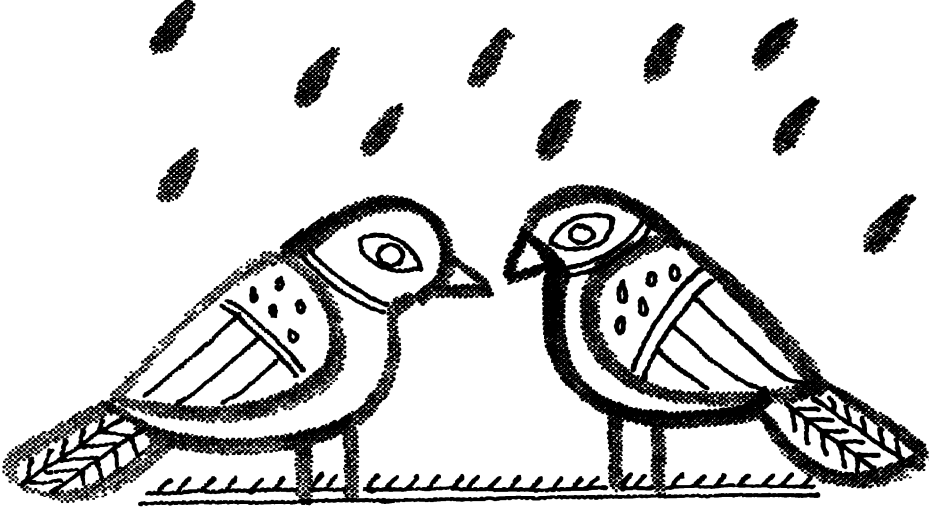
সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ে
সারা আকাশ ফুটো
জলের তোড়ে যাচ্ছে ভেসে
জমানো খড়কুটো।

দুইটি শালিখ ভিজছে বসে
গাছের ওপর ওই
জেলেরা সব দিঘির পাড়ে
ধরতে গেলো রুই

ভাইটি দেখে বাইরে বসে
মেঘের গায়ে চমকানি
ঠান্ডা হাওয়া লাগবে বলে
মা এসে দেয় ধমকানি।

বাবা বলেন বাদলা দিনে
জমবে ভালো কচুরি
মা হেসে কয় ওসব ছাড়ো
করছি আমি খিচুড়ি।

দুইজনাই ব্যস্ত আজি
নিজের নিজের কাজে
এমন দিনে থাকবো আমি
পুতুলগুলির সাজে।

আজকে কি মা আমার মতোই
সুয্যিমামার ছুটি
মেঘের সাথে সারাটা দিন
করবে লুটোপুটি।

হঠাৎ সে এক ভয়ংকর দিন

দিনেশ দেবনাথ

নীল সায়রের মধ্যিখানে সবুজ সবুজ দ্বীপ
সকাল-সাঁঝে সূয্যি মামা পরায় সিঁদুর টিপ
পোর্টব্লেয়ারে সাঁঝ বেলায়
ফাগুন হাওয়া পথ হারায়
সাগর পাড়ে সারে সারে বিজলি বাতির দীপ।

ডিগলিপুরের পথ গেছে ঐ সুভাষ গ্রামের পানে
নব্য বাংলার মেঠো গন্ধ হাওয়ায় বয়ে আনে
দু-ধারের তার চষামাঠ
ওই দেখা যায় পুকুর ঘাট
ভাটিয়ালির প্রাণকাড়া সুর বাজে এসে কানে।

কদমতলা ছাড়িয়ে যাই জারোয়াদের দেশে
গহীন বনে ঘুরছে তারা নিরাবরণ বেশে ;
চায়না অর্থ চায় না বিত্ত
সদাই খুশি সরল চিত্ত
কালো মুখের সাদা হাসি নীল সায়রে মেশে।

ওই যে আবার ডাকছে আমায় সুদূর নিকোবর
সাগর পাড়ে সারি সারি 'নিকোবরী'র ঘর ;
আরও দূরে ক্যাম্পবেল্ বে
মেগাপড-এ ওই ডাকে
নারিকেলের বনের ফাঁকে 'গালাথিয়া-র' চর।
বেশতো ছিল আন্দামানের মানুষগুলি সবে
তামিল বাঙাল-কেরালিয়ান আনন্দ উৎসবে
প্রাণে প্রাণে মেশামেশি
ছিলো নাকো রেষারেষি
সবুজ সে দ্বীপ মুখর ছিল প্রাণের কলরবে।

এমনি সময় 'সুনামি' এক দৈত্য তেড়ে আসে
করাল দ্রংষ্ট্রা ভীষণ ভয়াল বিকট অট্টহাসে
ভাসিয়ে দিল আপনজন
ভাঙল সুখের গৃহকোণ
সবুজ দ্বীপের বাতাস ভারী বুকের দীর্ঘশ্বাসে।

* মেগাপড—বিরল প্রজাতির অস্ট্রেলিয়ান পাখি। বর্তমানে শুধু গ্রেট নিকোবরেই পাওয়া যায়।
** গালাথিয়া—গ্রেট নিকোবর দ্বীপে প্রবাহিত আন্দামান-নিকোবরের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী।
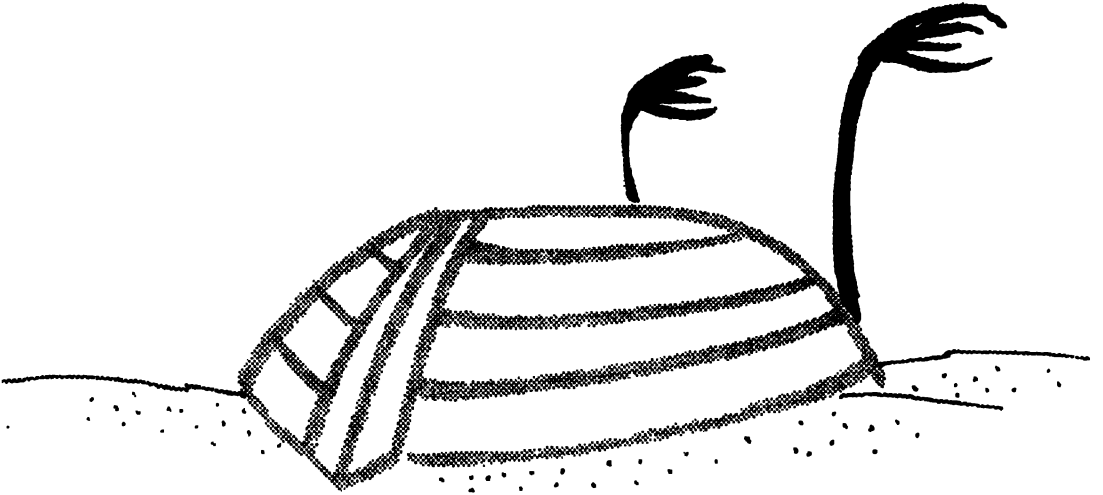
স্বপ্নপুরী

অগ্নিকুমার আচার্য
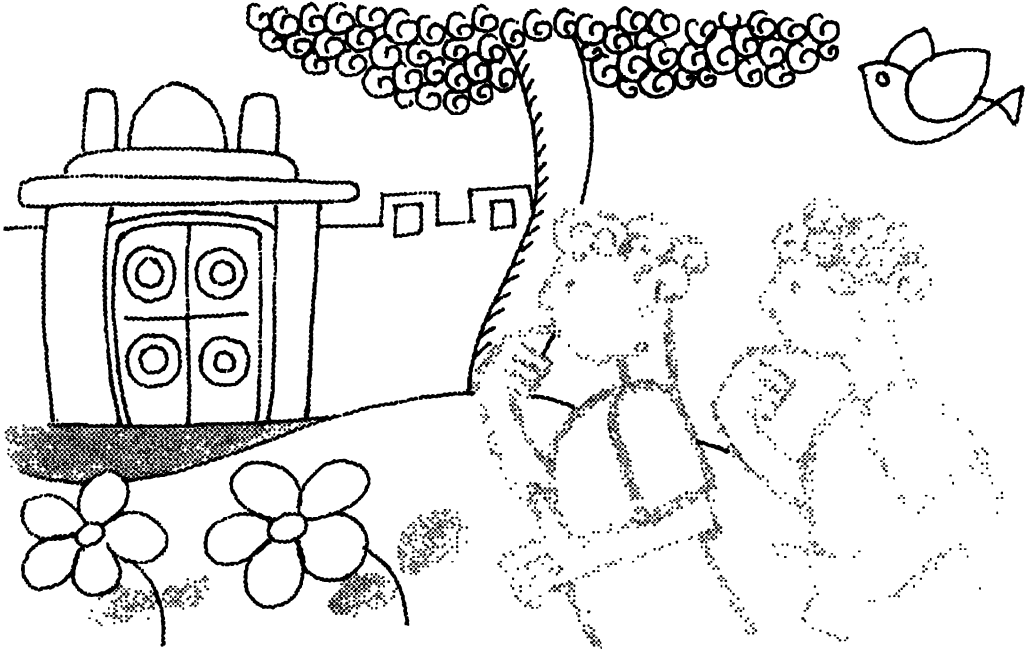
(চরিত্র)

সন্তু ও মণ্টু ○ দুই বন্ধু : বয়েস ৮-৯ বছর ○ সন্ন্যাসী ○ দৈত্য ○ ভূত ○ অলৌকিক মেয়ে পরিরানি ○ গোলাপবালা ○ সন্ধ্যামালতী ○ অন্যান্য ৩।৪ ফুলপরি ○ মন্ত্রী ○ সেনাপতি প্রহরী ○ সৈন্যদল ○ সন্তুর মা ○

[১ম দৃশ্য]

[সন্তুদের বাড়ির সম্মুখস্থ ছোট্ট বাগান। বাগানের মধ্যে কিছুটা ফাঁকা জায়গা। ভোরের সোনালি রোদ বাগানে এসে পড়েছে। একটি মোড়া পাতানো ; মোড়ার ওপর একটি ছড়া-ছবির বই। সন্তু দু-হাত ডানার মতো নেড়েচেড়ে কেবল ঘুরছে। এমন সময় সহপাঠী, পাশের বাড়ির ছেলে, মণ্টুর প্রবেশ।]

মণ্টু : এই সন্তু কি করছিস রে, এই সন্তু—[সন্তু কোনো জবাব না দিয়ে ঘুরতে থাকে] বারে! এই সন্তু, এই রকম ভোঁ ভোঁ করে ডানা দুটো মেলে ঘুরছিস কেন? বলনা? এই সন্তু—

সন্তু : [ঘুরতে ঘুরতে] চুপ্ কথা বলিস নে, আমি ফুলপরিদের দেশে যাচ্ছি।

মণ্টু : ফুলপরিদের দেশে যাচ্ছিস না হাতি। কিছুতেই যেতে পারবিনে তুই। দেখে নিস্।

সন্তু : [ঘুরতে ঘুরতে] আলবত যেতে পারব। বইয়ে লেখা আছে।

মণ্টু : বই-এ লেখা আছে? কই বই দেখি?

[সন্তু থামল। হাঁপাতে হাঁপাতে বই হাতে এল]

সন্তু : বিশ্বেস করলি নে তো? এই দ্যাখ কী লেখা আছে। [জোরে সুর করে পড়তে থাকে]

যাব আমি ফুলপরিদের দেশে
হাত দু'খানি ডানা মেলে
পাখির মতো হেলে দুলে
হাওয়ায় ভেসে ভেসে
পৌছব আমি ফুলপরিদের দেশে।
—কী আমি মিছে বলেছি?

মণ্টু : তাই তো রে! আমায় নিবি সন্তু তোর সাথে? চল না দুজনে মিলে যাই! তোর একা ভালো লাগবে ফুলপরিদের দেশে? দুজনে গেলে ওদের দেশে গিয়ে বেশ মজা করে গল্প করবো। জানিস সন্তু, আমারও কতদিনের ইচ্ছে ফুলপরিদের দেশে যাব। কতদিন গাছের মগ-ডালে বসে বসে কাটিয়েছি, যদি দেখা মেলে ফুলপরির। এই সন্তু, নিবি আমায়, নে-না ভাই! তোকে আমি রোজ ইস্কুলে চীনেবাদাম কিনে দেব। নিবি?

সন্তু : তাহলে আর দেরি করিস নে, নে শুরু কর।

[দুজনে আবৃত্তি করে ডানা মেলে ঘুরতে থাকে। কিছুক্ষণ ঘুরে মণ্টু বলে]

মণ্টু : এই সন্তু, থাম্, থাম না—কই একটুও তো উপরে উঠছি নে। বইয়ে ঠিক লেখা আছে তো? [সন্তু বিরক্ত ভাবে]

সন্তু : দেখলি নে বই? থামিস নে। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখবি সাঁ-ই করে আকাশে উঠে গেছি।

মণ্টু : না রে, শোন-থাম্। আর একটা উপায় আছে। [সন্তু থামে]

সন্তু : কি উপায় বল [বিরক্ত]

মণ্টু : জানিস একদিন মা না বলেছিলেন, চোখ বুঁজে ধ্যান করলে নাকি সাধু সন্ন্যাসীরা এসে দেখা দেন। আর ওদের কাছে যা চাওয়া যায় তাই মুঠো ভর্তি করে দেন। চল্ আমরা চোখ বুঁজে একমনে সাধু সন্ন্যাসীর ধ্যান করি। আমাদের ধ্যানে খুশি হয়ে এক-আধ জন সাধু সন্ন্যেসী এলে দুজনে দুপায়ে জোর চেপে ধরব। আর বলবো, ফুলপরিদের দেশে যাবার ব্যবস্থা করে দাও, নইলে কিছুতেই ছাড়ছিনে পা।

সন্তু : ঠিক বলেছিস রে মণ্টু, সাধু সন্ন্যাসীরা সব করতে পারে। চল আমরা ধ্যানে লেগে যাই। [দুজনে পাশাপাশি বসে চোখ বুঁজে ধ্যান, করতে থাকে। মৃদু, আবহ সঙ্গীত ক্রমে তীব্র ও দ্রুত লয়ে চলতে থাকবে। এমন সময় মাথায় জটা, মুখে শ্বেতশুভ্র গোঁফদাঁড়ি, রক্ত বস্ত্র পরিহিত এক সন্ন্যাসীর প্রবেশ, এক হাতে দীর্ঘ ত্রিশূল। সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ালো সন্তু মণ্টুর সম্মুখে গম্ভীর কণ্ঠে বলল।

সন্ন্যাসী : ক্রীং হ্রীং ফট্
বলো চট্ পট্।।
কিংতব কামনা।
পূরাবে সব বাসনা।।

বর লহ মাগিয়া।
চোখ দুটি খুলিয়া।।
ক্রীং হ্রীং ফট্ ফট্।
ধর লহ ঝট্ পট্।।

মন্টু : এ্যাঁ। [চোখ খুলে, দুহাতে চোখ মুছে] কী দেখছি রে! সন্ন্যাসী বাবা! এই সন্তু পায়ে পড়্— পায়ে পড়। [এক পা জড়িয়ে ধরল]

সন্তু : এ্যাঁ। সন্ন্যাসী বাবা! [অন্য পা ধরল]

সন্তু, মন্টু : সন্ন্যাসী বাবা, ফুলপরিদের দেশে যাবো, উপায় করে দাও বাবা,—

সন্ন্যাসী : [সুর করে]

ক্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা।
খুশি আমি খুব আহা।।
ছাড় ছাড় পা দু-খানি।
যাহা চাও দিব আনি।।

দুজনে : না সন্ন্যাসী বাবা পা ছাড়ছিনে। ফুলপরিদের দেশে যাবো। একটা উপায় করে দিতেই হবে।

সন্ন্যাসী : [সুর করে] ক্রীং হ্রীং ফট্ ফটি
ধরো এই অংগুটি
[আংটি দিলেন]

মন্টু : এ্যাঁ। আংটি! [বসে] কৈ, দাও বাবা, আমাকে দাও?

সন্তু : না বাবা, আমাকে দাও। [উভয়েই আংটি চাইতে থাকে]

সন্ন্যাসী : [সুর করে]

ক্রীং হ্রীং ফট্ ফট্
চলো যাবো চট্ পট্।।
কর যদি ঝগড়া
লাগে তবে বাগ্ড়া।।
এক জনে লও হাতে
আর জন চল সাথে।।
দুই জনে যাবে ভেসে
মহাসুখে পরি-দেশে।।

মন্টু : এক জনে আংটি হাতে নিলে দুজনেই যেতে পারব। তাহলে আর ভাবনা কী। তুই নে সন্তু, তোর কাছেই আংটি রেখে দে।

সন্তু : না না, তুই নিস্ না কেন? আমি যাব তোর সাথে।

মন্টু : না তুই নে—

সন্তু : না তুই নে—

মন্টু : না রে, আমি আবার হারিয়ে ফেলব। তোর কাছেই রেখে দে।

সন্তু : তাহলে সন্ন্যাসী বাবা তোমার যাকে ইচ্ছে তার হাতেই আংটি দাও।

সন্ন্যাসী : [সুর করে] ক্রীং হ্রীং ফট্ ফট্
আংটি ধর চট্ পট্
[সন্তুকে দিলেন]

সন্তু : বাঃ কী সুন্দর আংটি!
মণ্টু : কই দেখি—
সন্তু : এই দ্যাখ, কী ঝলমল করছে! এই আংটি দিয়ে কী করব সন্ন্যাসী বাবা?
সন্ন্যাসী : [সুর করে]

ক্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা।
যাহা চাও পাবে তাহা।।
আদেশ কর আংটিকে।
দিবে এনে পলকে।
টক্ ঝাল মিঠে কড়া রকমারি খাদ্য।
আংটিকে বল দেখি এনে দেব সদ্য।।
সোনা দানা চুনি পান্না রাজকীয় বস্ত্র।
বল্লম ও তলোয়ার যত আছে অস্ত্র।।
চলে যাও উত্তরে।
কৈলাস শিখরে।।
তারপর সোজা পথ।
পুরিবে মনোরথ।।
ক্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা।
যাহা চাও পাবে তাহা।।

[এইকথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আবহসংগীতের ঝংকার, আলোর চমক এবং সন্ন্যাসীর অন্তর্ধান।]

সন্তু : এ্যাঁ সন্ন্যাসী বাবা চলে গেল? তাহলে পরীর দেশে যাবো কী করে?
মণ্টু : এই আংটিকে বললেই তো সব ব্যবস্থা করে দেবে, চল্ আগে একটু পরখ করে নি। আচ্ছা কী আদেশ করা যায় বল না?
সন্তু : এই আংটি দুই প্লেট ভালো ভালো রসগোল্লা, সন্দেশ, নিয়ে এসো দেখি—
[হঠাৎ আলোর ঝলক, একটি শাড়ি পরা ফুটফুটে মেয়ে দুহাতে দু প্লেটে সন্দেশ ও রসগোল্লা নিয়ে এল। মণ্টু ও সন্তুর চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল, কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল মেয়েটির দিকে।]
মণ্টু : একি স্বপ্ন দেখছিরে সন্তু! দেখ্ কি বড়ো বড়ো রসগোল্লা, কত সন্দেশ। চল্ সন্তু আর দেরি না করে লেগে যাই।
[এগিয়ে গিয়ে একটি প্লেট হাতে নিয়ে খেতে লাগল]
সন্তু : এই তো কী আশ্চর্য! ও হঠাৎ এলো কোত্থেকে ? তুমি কে ভাই? তোমার নাম কী?

তুমি কোথায় থাকো, কে তোমায় পাঠিয়েছে? এত মিষ্টি সন্দেশ কোথায় পেলে ভাই?

মণ্টু : দূর বোকা, আগে পেটে ঠেসে নে, তারপর কথা বলিস। শেষে না অমন খাওয়াটা হাতছাড়া হয়ে যায়? [খেতে থাকে]

সন্তু : কী ভাই? তুমি কথা বলছ না যে।

মণ্টু : বোধ হয় বোবা না হয় কালা, তা খাবার পেয়েছিস্ খেয়ে নে। খোঁজাখুঁজির দরকার কী বাবা?

সন্তু : ও, তুমি কথা বলবে না ভাই? তবে একটা রসগোল্লা খাও—
[প্লেটটি হাতে নিতেই আলোর ঝলক ও রোমাঞ্চকর আবহসংগীত হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে যাবে]

সন্তু : দেখলি মণ্টু মেয়েটি একটা কথাও না বলে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল! কী অবাক কাণ্ড।

মণ্টু : আরে আগে খেয়ে নে। দ্যাখ্ খেয়ে, অমন রসগোল্লা ও সন্দেশ জীবনেও খাসনি!

সন্তু : না ভাই মনটা বড্ড খারাপ লাগছে, মেয়েটি একটি সন্দেশও না খেয়ে চলে গেল—

মণ্টু : ও তুই দেখছি ফুলপরিদের কথা বেমালুম ভুলে আছিস্।

সন্তু : তাই তোরে, চল এক্ষুনি যাত্রা শুরু করি।

মণ্টু : খেয়ে নে পেট পুরে। অনেক পথ চলতে হবে যে—

সন্তু : এই খেয়ে নিচ্ছি— [খেতে থাকে]

মণ্টু : আর আমাদের পায় কে? এবার ফুলপরিদের দেশে গিয়ে কত নাচ গান হাসি। ফুর্তি, খাওয়া দাওয়া করব। আর আমাদের পায় কে।

সন্তু, মণ্টু : [গান ধরে]

আর আমাদের পায় কে?
যাবো মোরা পরীর দেশে
চোখের পলকে—
সাজবো মোরা রাজার সাজে
হাসির ঝলকে।
ফুলপরি গো ফুলপরি
কোথায় তুমি থাকো
তোমার দেশের দুয়ার খোলা
লুকিয়ে থেকো না-কো
ওগো লুকিয়ে থেকো না-কো।।

[২য় দৃশ্য]

[সুন্দর বনভূমি। রং-বেরঙের ফুলে ফলে গাছ ভরা। রঙিন আলোর ঝলক। এক স্বপ্নপুরী যেন। মাঝে মাঝে মিষ্টি সুর বাতাসে ভেসে আসছে। সন্তু, মণ্টুর প্রবেশ। উভয়ের রাজপুত্রের পোশাক]

মণ্টু : চল্ ফিরে যাই সন্তু। আর পরির দেশে গিয়ে কাজ নেই। আর হাঁটতে পারছিনে। [বসে

পড়ে] দূর ছাই, এমন জানলে তোর সঙ্গে আসতুমই না।

সন্তু : তুই না আসলে আমি একাই আসতুম। কতদিন ভেবেছি, ইস্, আমার যদি দুটো ডানা থাকত, তবে পাখির মতো উড়ে যেতুম নীল আকাশের গায়ে। ভেসে ভেসে চলে যেতুম পরির দেশে। জানিস্, কী সুন্দর দেশ এই ফুলপরিদের!

মণ্টু : সুন্দর তো বুঝলুম, কিন্তু পা দুটো যে আর এগোতে চায় না। ঠাকুর বলে গেলেন চলে যাও সোজা উত্তরে, কৈলাস পর্বত পেরোও, ব্যাস পৌঁছে যাবে ফুলপরিদের দেশে। হাঁটছি আর হাঁটছি, কোথায় ফুলপরিদের দেশ, কে জানে বাবা! এদিকে পেটও চোঁ চোঁ করছে।

[মণ্টু চারদিকে ঘুরে দেখছে।]

সন্তু : তাহলে আংটিকে বলি খাবার এনে দিক।

মণ্টু : আংটির খাবার তো রোজই খাছি। [হঠাৎ একটা ফলগাছ দেখতে পায়]
—দ্যাখ্ দ্যাখ্ সন্তু, গাছে লাল টুকটুকে কত ফল, চল পেড়ে নিয়ে খাই। ভারী মজা হবে।

সন্তু : কার ফলগাছ জানি নে, কাউকে না বলে যে চুরি করা হবে।

মণ্টু : ও-তুই দেখছি পাণ্ডবদের বড়ো ভাই যুধিষ্ঠির হয়ে গেছিস। আচ্ছা তুই দাঁড়া, আমি ফল পেড়ে নিয়ে এলাম বলে—
[মণ্টু দৌড়ে গিয়ে গাছে হাত দিতেই বিকট হাসির শব্দ। দূর থেকে ভেসে আসে—হাঃ হাঃ হাঃ হীঃ হীঃ হীঃ। উভয়ে চমকে উঠে। মণ্টু ভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে আসে।

সন্তু : মণ্টু ! ফল পাড়তে যাসনে। কী বিকট শব্দ! আমার বড্ড ভয় করছে রে! শরীরটা কাঁটা দিয়ে উঠছে! শেষে কোন্ বিপদে না পড়ি আবার?

মণ্টু : [এদিক ওদিক চেয়ে কিছু না দেখতে পেয়ে] তুই বড্ড ভীতু সন্তু। তোর হাতে সন্ন্যেসীর আংটি রয়েছে তবু এত ভয়? আমি যাই, এক্ষুনি অনেক ফল পেড়ে নিয়ে আসছি।
[মণ্টু দৌড়ে গিয়ে ফল পাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিকট হাসি। শোঁ শোঁ বাতাসে বনভূমি কাঁপতে থাকে। হাসি ক্রমশ এগোতে থাকে এবং মঞ্চে প্রবেশ করে এক দৈত্য। সারা শরীর লোমে ঢাকা। মূলোর মতো দুটি বড়ে বড়ো দাঁত, মাথায় দুটো শিং। দৈত্যকে দেখে সন্তু ও মণ্টু ভয়ে চিৎকার করে।]

মণ্টু : পালা সন্তু পালা! ওরে বাপরে, খেয়ে ফেল্লরে! গেলুম রে—

সন্তু : ও মাগো! আমি কিছু করিনি! আমি ফল পাড়িনি! আমার কোনো দোষ নেই!
[সন্তু, মণ্টু পালাতে চাইলে দৈত্য অট্টহাসিতে পথ আগলে থাকে]

দৈত্য : কচি কচি নরম মাংস মজা করে খাব। হাঃ হাঃ হাঃ —

মণ্টু : [দু-হাতে ধরতে যেতেই সন্তু মণ্টু ছুটোছুটি শুরু করে। মণ্টু কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে]

মণ্টু : আর কোনোদিন এখানে আসবো না গো দৈত্য মশাই। দোহাই তোমার, আমাদের ছেড়ে দাও।

সন্তু : আমাদের খেয়ো না গো দৈত্য মশাই? আমরা আর কক্ষনো তোমার বাগানে আসবো না।

দৈত্য : হাঃ হাঃ হাঃ, তোরা কোত্থেকে এসেছিস? তোদের নাম কী?

সন্তু : আমরা পৃথিবীর মানুষ দৈত্য মশাই। আমি ফল পাড়িনি গো। তোমার গাছের ফল পেড়েছে এই মণ্টুটা। তোমার পায়ে পড়ি দৈত্য মশাই আমাকে ছেড়ে দাও।

দৈত্য : আরে তোরা পৃথিবীর মানুষ! মরতে এসেছিস্ এই পরিদের রাজ্যে? আমি এই রাজ্যের প্রহরী।

পৃথিবীর মানুষের এখানে আসা নিষেধ। আমার হাতে তোদের আজ রক্ষে নেই। [মণ্টুকে] ওটা ফল পেড়েছে, আগে ওটাকে খাব। হাঃ হাঃ হাঃ [মণ্টুর দিকে এগোয়, মণ্টু চিৎকার করে ওঠে]

সন্তু : ভাবিসনে মণ্টু! [আংটিকে] এই আংটি, খুব ধারালো দুটো তলোয়ার নিয়ে এসো—
[সঙ্গে সঙ্গে একটি মেয়ে দুটো তলোয়ার নিয়ে প্রবেশ করল। সন্তু ও মণ্টু তলোয়ার হাতে নিতেই মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেল]

মণ্টু : [বীরের মতো] আয় বেটা দৈত্য, এক কোপে সাবাড় করি তোকে।

দৈত্য : হাঃ হাঃ হাঃ, এই তলোয়ার দিয়ে আমাকে মারবি? তবে আয়, দুটোকে ধরে গিলে ফেলি।
[যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। সন্তু, মণ্টু তলোয়ার ঘুরিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। হঠাৎ দৈত্য তাদের হাত থেকে এক ঝটকায় তলোয়ার দুটো কেড়ে নিল।]

মণ্টু : [কাঁদো স্বরে] সন্তু, আর যে রক্ষে নেই! আর যুদ্ধ করব না গো দৈত্য মশাই, দোহাই তোমার, আমাদের মাপ করো।

সন্তু : ভাবিসনে মণ্টু! মাথায় একটা দারুণ বুদ্ধি এসেছে [আংটিকে] এই আংটি একটা ভূত নিয়ে এসো—
[দৈত্য অট্টহাসি দিয়ে যেমনি সন্তু মণ্টুকে ধরতে যাবে ; তখনি গোঙাতে গোঙাতে ভূত এসে হাজির। ভূত দৈত্যকে পেছন থেকে ঘাড় মটকে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দৈত্য মাটিতে পড়ে গেল। সন্তু, মণ্টু ভয়ে গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিল। দৈত্য মারা গেলে সন্তু, মণ্টু বেরিয়ে আসে।]

মণ্টু : [পা দিয়ে ঠেলে] কীরে বেটা দৈত্য, এখন কী? এখন দেখি মাটিতে পড়ে আছিস্।
[ভূত এসে সন্তুর-মণ্টুর সামনে দাঁড়াল।]

সন্তু : [ভীত] আমরা খুব খুশি হয়েছি ভূত। তোমার শক্তি দেখে খুব খুশি হয়েছি। এখন যাও, আবার যখন ডাকব তক্ষুনি চলে এসো কিন্তু—[ভূত অদৃশ্য হয়ে গেল]

মণ্টু : উঃ, কি বাঁচাটাই না বাঁচলাম বাবা। এই ভূত বাবাজি না এলে তো আজ দৈত্যের পেটেই যেতে হতো। চল্ সন্তু, আর পরির রাজ্যে ঢুকে কাজ নেই। ভালোয় ভালোয় ফিরে চল্—
[নেপথ্য ঝুম ঝুম নূপুরের শব্দ শোনা গেল]

সন্তু : ওই আবার না জানি কী আসছে। গাছটার আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে থাকি। [গাছের আড়ালে লুকোল। সাত পরির নৃত্য করতে করতে প্রবেশ]

[পরীদের নৃত্য]

গোলাপবালা : চল্ সবাই ঘরে ফিরে যাই। সেই কখন বেরিয়েছি, দেরি হলে রানি বকুনি দেবেন আবার।

সন্ধ্যামালতী : হ্যাঁ তাই চল্ গোলাপদি। এবার ঘরে ফিরি সবাই।

সকলে : তাই ভালো, তাই ভালো চলো সবাই ঘরে চলো।
[অগ্রসর হতেই মৃত দৈত্যকে দেখে সবাই চমকে উঠল।]

গোলাপ : ও মা গো! এই দ্যাখ্ তোরা, আমাদের বাগানের পাহারাদার না? হ্যাঁ, দৈত্যটা মরে পড়ে আছে যেন? [সকলে তাকাল]

সন্ধ্যামালতী : তাই তো গোলাপদি, দৈত্যটা মরেই তো পড়ে আছে? কে অমন কাজ করল? আমাদের

কতই না আদর করত। কে মারলে ওকে?

গোলাপ : কে মারলে? কার এত সাহস? চল সন্ধ্যামালতী, চল্ সবাই রানিকে খবর দিতেই হবে।

সকলে : দেরি নয়, দেরি নয়, রানিকে খবর দিতেই হবে।

সন্ধ্যা : ইস্ আমার ভীষণ কষ্ট লাগছে রে। [দৈত্যের কাছে বসে]

গোলাপ : চল্ সবাই চল,—
[সকলের প্রস্থান। সন্ধ্যামালতী একটু দেরি করে যাবে। এমন সময় সন্তু ছুটে গিয়ে সন্ধ্যার আঁচল ধরল।]

সন্ধ্যা : [চমকে উঠে] কে? কে তোমরা? ছাড়, আঁচল ছাড় বলছি?

সন্তু : ছাড়ব না ফুলপরি। ছাড়ব বলেই এত কষ্ট করে এসেছি বুঝি? ইস্ তুমি কী সুন্দর ফুলপরি? কি সুন্দর ফুলপরি? কী সুন্দর তোমার পোশাক।

মণ্টু : কী সুন্দর তুমি নাচ। তোমাদের রাজ্যে আমাদের নিয়ে যাও না ফুলপরি?

সন্তু : তুমি যা চাও তাই তোমায় দেব আমি। জানো ফুলপরি, এই আংটিকে বললে সবকিছু এনে দেয়।

মণ্টু : [ডেকে নিয়ে] এই সন্তু, বোকা কোথাকার, আংটির কথা বলিস্ নে?

সন্ধ্যা : কী বলছ তোমরা। কোত্থেকে এসেছো?

সন্তু : আমার পৃথিবীর মানুষ। ওই যে নীচে গোল পৃথিবী ওখান থেকে দিন রাত হেঁটে হেঁটে এসেছি। কত কষ্ট করে এসেছি ফুলপরি। আমাদের তুমি তোমাদের দেশে নিয়ে যাবে বল ফুলপরি।

মণ্টু : আমাকেও নিয়ে যাবে বল ফুলপরি?

সন্ধ্যা : এ্যাঁ, তোমরা পৃথিবী থেকে এসেছো? সর্বনাশ রানি জানতে পারলে তোমাদের এক্ষুণি মেরে ফেলবেন। তোমরা এক্ষুনি চলে যাও, আর দেরি কর না।

মণ্টু : চল্ সন্তু, ফিরে চলে যাই—

সন্তু : না, আমি কিছুতেই যাব না। তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে যদি না নাও, তোমাকে আমি ছাড়বই না। [পথ আগলে দাঁড়ায়] যাও দেখি, কেমন করে যাবে!

সন্ধ্যা : আঃ, কী বিপদেই না পড়লুম তোমাদের নিয়ে ; না বাপু তোমরা ঘরে ফিরে যাও।

সন্তু : না ফুলপরি, তুমি আমাদের ফেলে যেও না।

সন্ধ্যা : আচ্ছা শোন—তোমরা যখন না গিয়ে ছাড়বেই না—তখন এসো আমার সঙ্গে। তবে একটা কথা, খুব চুপি চুপি এসো। যাতে কেউ টের না পায়। আমি তোদের লুকিয়ে রাখব আমাদের বাগানের ঝোপের আড়ালে। রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়বে, তখন আমি তোমাদের আমাদের রাজ্যটা ঘুরে ঘুরে দেখাব।

সন্তু : হ্যাঁ হ্যাঁ—তাই চল— (প্রস্থান)

[৩য় দৃশ্য]

[পরিদের বাগান। বাগানে নানা রঙিন ফল ফুলের গাছ। সোনালি রুপোলি গাছের পাতা। একটা স্বপ্নপুরী যেন। গভীর রাত। মণ্টু, সন্তু ও সন্ধ্যামালতীর প্রবেশ]

সন্ধ্যা : খুব সাবধান! পা টিপে টিপে চুপি চুপি আমার সাথে এসো। টুঁ শব্দটি করো না যেন! রানি জানতে পারলে তোমাদেরও প্রাণ যাবে, আমারও প্রাণ যাবে।

মন্টু : দ্যাখ্ সন্তু, কী সুন্দর ফুল! একটা পেড়ে নিই?

সন্ধ্যা : আঃ বল্লাম যে কথাটি বলো না! তাহলে আমি যাচ্ছিনে তোমাদের সঙ্গে।

মন্টু : বাঃ রে! তুমি রাগ করো কেন ফুলপরি। এমন বাগান আমি জীবনেও দেখিনি!

সন্ধ্যা : তোমরা তো জান না আমার দিদিটা না ভারী হিংসুটে। যদি জানতে পারে পৃথিবীর মানুষকে আমি ঠাঁই দিয়েছি, তবে তখুনি রানির কাছে গিয়ে বলে দেবে। তোমরা তাড়াতাড়ি ঘুরে দেখে নাও, বাগানটা। আমি কিন্তু বেশি দেরি করতে পারব না।

সন্তু : তাহলে তুমি চলে যাও ফুলপরি, আমাদের জন্য তুমি মিছামিছি কষ্ট করো না।

সন্ধ্যা : না-না এসো তাড়াতাড়ি, সব তোমাদের দেখিয়ে দিই।

মন্টু : [চিৎকার করে] দেখ্ছিস সন্তু কী সুন্দর গাছ! রুপোলি পাতা, সোনালি ফুল।

সন্তু : তুই থাম তো মন্টু! তোর এই গলা ফাটানো কথার জন্যে যদি আবার ধরা পড়ে যাই?

সন্ধ্যা : এই শোন, এবার এদিকে দেখে যাও ; এমন দিঘি পৃথিবীর কোথাও নেই। [নেপথ্যে গোলাপবালার কণ্ঠ—সন্ধ্যামালতী-সন্ধ্যামালতী] সর্বনাশ। দিদি আসছে। এখন কী করি? তোমাদের কোথায় লুকোই? শিগ্‌গির কোথাও লুকিয়ে পড়?

মন্টু : চল্ সন্তু, ওই গাছটার আড়ালে গিয়ে লুকোই।
[গোলাপবালার প্রবেশ। সন্ধ্যামালতী অন্যমনস্কভাবে বসে রইল।]

গোলাপবালা : সন্ধ্যামালতী। এত রাত্তিরে একা বাগানে বসে কী করছিস?
[এদিক ওদিক তাকিয়ে] কারা যেন ছুটে পালিয়ে গেল! এই সন্ধ্যা?

সন্ধ্যা : ও দিদি, তুই এসেছিস, ভালোই হল—দ্যাখ, দ্যাখ, কী সুন্দর চাঁদ, কি মিষ্টি হাওয়া। চল্, আমরা নেচে নেচে গান গাই।

গোলাপ : থাম্ দেখি। সত্যি করে বল তো কারা ছুটে পালিয়ে গেল?
(সন্ধ্যা আমতা আমতা করতে থাকে)

সন্ধ্যা : সত্যি বলব? না-না কেউ না, কেউ না, কেউ না, কই, কেউ না-তো?
[হঠাৎ মন্টু একটা হাঁচি দিয়ে ওঠে। গোলাপও চমকে ওঠে।

গোলাপ : কে, কে ওখানে
[ছুটে সন্তু ও মন্টুর কাছে গেল]

কে? কে তোমরা? এদিকে এসো, কথা বলছ না যে? কে তোমরা? কোত্থেকে এসেছে। এখানে কী করছ ওঠো বলছি, ওঠো। [হাতে ধরে মন্টু সন্তুকে দাঁড় করাল] ওমা, এ যে দেখছি পৃথিবীর মানুষ! তোমরা কী করে এখানে এলে? বুঝেছি, সবই সন্ধ্যামালতীর কাণ্ড।

সন্ধ্যা : [সভয়ে] না-না দিদি, আমি ওদের আনিনি। ওরা নিজেরাই এসেছে।

গোলাপ : মিথ্যে কথা বলছিস! দাঁড়া, আমি এক্ষুনি রানির কাছে সব বলে দেবো। তোর এত বড়ো সাহস! আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। [ছুটে প্রস্থান]

সন্ধ্যা : দিদি যাসনে, তোর পায়ে পড়ি, দিদি—এখন কী হবে?

সন্তু : তুমি কোনো চিন্তা করো না ফুলপরি, এই যে আংটি। এই আংটিকে বললে এক্ষনি ভূতের রাজা ছুটে আসবে। [এদিক ওদিক চেয়ে অস্থির হয়ে]

সন্ধ্যা : না, না ও তোমাদের কিছু করতে হবে না, তোমরা এক্ষুনি ছুটে পালিয়ে যাও। শিগগির পালাও—
[সৈন্যদের কোলাহল শোনা গেল]
ওই যে সৈন্যরা ছুটে আসছে। এখন কী করি?

মন্টু : সন্তু, ভূতকে ডাক না তাড়াতাড়ি?

সন্ধ্যা : তোমরা কিছু করো না। আমি রানির কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব।
[সৈন্যসহ গোলাপবালার প্রবেশ]

গোলাপ : বাঁধো বাঁধো পৃথিবীর এই দুই মানুষকে। আর সন্ধ্যামালতীকেও বাঁধো—

সন্তু : না-না, আমাদের বাঁধো, কিন্তু ওকে বেঁধো না গো! ওর কোনো দোষ নেই—

সন্ধ্যা : ঠিক আছে দিদি। আমাকেও বেঁধে নাও।

গোলাপ : সবাই তোকে আদর করে—ভালোবাসে। তাই তুই যা খুশি করিস্! এবার মজা দেখবি।
[সৈন্যরা তিনজনকে বাঁধল]
চলো, নিয়ে চলো— [সকলের প্রস্থান]

[৪র্থ দৃশ্য]

[পরিদের রানির সভা। রানি বসে আছেন সিংহাসনে। এক পাশে মন্ত্রী, অন্য দিকে সেনাপতি। সম্মুখে সভাসদ।

সভ্যগণ : জয়—পরি মহারানির জয় [তিন বার ধ্বনিত হবে]

রানি : মন্ত্রী, রাজ্যের সব খবর ভালো তো?

মন্ত্রী : না মহারানি, আমাদের রাজ্যে এক ভয়ানক শত্রুর আবির্ভাব ঘটেছে। আমাদের প্রহরী অজম্ভুত দৈত্যকে কে বা কারা হত্যা করেছে। বড়ো দুঃসংবাদ মহারানি!

রানি : [চমকে উঠলেন] অজম্ভুত দৈত্য নিহত! একি বলছেন মন্ত্রী? এও কি সম্ভব? কার এত বড়ো শক্তি! এই স্বপ্নের পুরীতে কে এল? সেনাপতি—

সেনাপতি : আদেশ করুন মহারানি—

রানি : অজম্ভুত দৈত্য নিহত। এ খবর পেয়েছ?

সেনাপতি : পেয়েছি মহারানি।

রানি : কী আশ্চর্য। এ খবর পেয়েও চুপ করে বসে আছ? হত্যাকারী কি এখনও ধরা পড়েনি? [সেনাপতির মাথা নীচু] আমি হত্যাকারীর সন্ধান চাই। মন্ত্রী, রাজ্যে ঘোষণা করে দিন, হত্যাকারীর খোঁজ যে এনে দিতে পারবে, তাকে এক হাজার মণিরত্ন উপহার দেওয়া হবে।
[সন্তু, মন্টু ও সন্ধ্যামালতীকে নিয়ে গোলাপ বালা ও সৈন্যদের প্রবেশ]

রানি : একি! এরা কারা! সন্ধ্যামালতীকে কে বেঁধেছে? কার এত বড়ো সাহস?

গোলাপ : আদেশ করুন মহারানি, আমি সঠিক খবর বলছি।

রানি : হ্যাঁ তুমি নির্ভয়ে বলতে পারো, তোমাকে আমি অনুমতি দিলাম।

গোলাপ : মহারানি, অজম্ভুত দৈত্যের হত্যাকারী হল পৃথিবীর এই মানুষ দুটো। অজম্ভুত দৈত্যের মৃত্যুর পর এদের দুজনকে বাগানে লুকানো অবস্থায় পাওয়া গেছে। এদের সঙ্গে সন্ধ্যামালতীও ছিল। আমি সৈন্য নিয়ে ওদের বেঁধে এনেছি।

রানি : শোন পৃথিবীর মানুষ, তোমরাই কি অজম্ভুত দৈত্যকে হত্যা করেছ? আমি জানতে চাই, এই কথা কি সত্য?

[সন্তু মণ্টু চুপ] চুপ্ করে আছো কেন? উত্তর দাও।

সন্তু, মণ্টু : [মাথা নীচু করে] হ্যাঁ মহারানি, আমরাই দৈত্যকে হত্যা করেছি।

মন্ত্রী : মহারানি, পৃথিবীর মানুষের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। ওরা না পারে এমন কোনো কর্ম নেই। ওদের ছোট্ট মাথা নানা বুদ্ধিতে ভরা, কোন্ ভেলকি লাগিয়ে দৈত্যকে হত্যা করেছে কে বলবে?

রানি : খুব চিন্তার কথা। এত বড়ো মহাশক্তিশালী দৈত্যকে তোমরা হত্যা করেছ! আগে তোমাদের বিচার হউক।

মন্ত্রী : যথার্থ বলেছেন মহারানি, আগে বিচার হোক।

রানি : শোন পৃথিবীর মানুষ, তোমাদের প্রথম অপরাধ হল, তোমরা মানুষ হয়ে পরির রাজ্যে ঢুকেছ। দ্বিতীয় অপরাধ হল—তোমরা দৈত্যকে হত্যা করেছ ; তোমাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। কী শাস্তি হবে মন্ত্রী?

মন্ত্রী : আমিও তো ভাবছি মহারানি কী শাস্তি হবে?

রানি : তোমাদের আমি নির্বাসন দণ্ড দিলাম।

মন্ত্রী : নির্বাসন দণ্ড! খুব উচিত শাস্তি হয়েছে মহারানি।

রানি : না-না শাস্তিটা ঠিক হল না—

মন্ত্রী : হ্যাঁ মহারানি, শাস্তিটা ঠিক হয়নি। ওদের আজীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিন।

রানি : না মন্ত্রী, না। শাস্তিটা হয়নি, তোমাদের আমি প্রাণদণ্ড দিলাম। [সন্তু, মণ্টু চমকে ওঠে]

মন্ত্রী : খুব ভালো শাস্তি দিয়েছেন মহারানি। প্রাণদণ্ডই সবচেয়ে বড়ো শাস্তি। ওহে পৃথিবীর মানুষ, তোমাদের ভাগ্যটা খুবই ভাল, সব চাইতে বড়ো শাস্তিটাই তোমরা পেয়ে গেলে।

রানি : আর সন্ধ্যামালতী, তুমি আমাদের দেশের আইন না মেনে পৃথিবীর মানুষকে এখানে নিয়ে এসেছো। তাই তোমাকে শাস্তি দিলাম—পাঁচ বছরের কারাদণ্ড। কী বল মন্ত্রী?

মন্ত্রী : আপনার বিচার চমৎকার মহারানি। অতি চমৎকার।

রানি : সেনাপতি, ওই দুটো পৃথিবীর মানুষকে উঁচু পাহাড় থেকে ধপাস করে নীচে ফেলে দাও।

সেনাপতি : যথা আজ্ঞা মহারানি।

মণ্টু : না না মহারানি, আমরা আর পরির রাজ্যে আসব না। আমাদের মাফ করে দিন।

রানি : না। শিগগির নিয়ে যাও সেনাপতি।

সন্তু : কিন্তু মহারানি, আমার একটা প্রার্থনা আছে।

রানি : বল কি প্রার্থনা?

সন্তু : মহারানি, আমাদের শাস্তি দিন, কিন্তু সন্ধ্যামালতীর কোনো দোষ নেই ; ওকে ছেড়ে দিন। আমরা দোষী, তাই আমাদের শাস্তি দিন।

রানি : আমিও কারও কথাই শুনব না, আমি যে শাস্তি দিয়েছি এটাই ঠিক। [সেনাপতিকে] সেনাপতি, পাহাড়ের চুড়ো থেকে ওদের ফেলে এসে আমাকে জানাবে। [প্রহরীকে] প্রহরী, তুমি সন্ধ্যামালতীকে নিয়ে কারাগারে রাখো।

সেনাপতি : চল হে পৃথিবীর মানুষ, [সন্তু, মণ্টুর হাত ধরে] চল চল—। [প্রহরী সন্ধ্যামালতীকে নিয়ে চলল]

সন্ধ্যামালতী : আর দেখা হবে না পৃথিবীর মানুষ।

সন্তু মণ্টু : আর দেখা হবে না সন্ধ্যামালতী। [বলতে বলতে দুই বিপরীত দিকে সন্তু মণ্টু ও সন্ধ্যামালতীর প্রহরীসহ প্রস্থান]

রানি : এসো গোলাপবালা, তোমার পুরস্কার তুমি নেবে— [সকলের প্রস্থান]।

[৫ম দৃশ্য]

[পরির দেশের বাগান]

[মণ্টু ও সন্তুর গান গাইতে গাইতে প্রবেশ]।

গান

সন্তু : ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্
মণ্টু : তাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্।
সন্তু : পাহাড় থেকে ফেলবে ছুঁড়ে করতে মোদের গুম্—
মণ্টু : আমরা যেমন ছিলাম তেমনি আছি মনে খুশির ধুম।
সন্তু : সন্ন্যেসীর ওই আংটির জোরে—
মণ্টু : উলটে সেনাপতি মরে—
সন্তু : দিচ্ছে চির ঘুম্—
সন্তু, মণ্টু : আমরা যেমন ছিলাম তেমনি আছি আজকে খুশির ধুম্।
তাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্
ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্।

সন্তু : [হঠাৎ একটু ভেবে নিয়ে] কিন্তু, নারে মণ্টু, সন্ধ্যামালতীর জন্যে মনটা ভারী খারাপ লাগছে।

মণ্টু : ঠিক বলেছিস সন্তু, সন্ধ্যামালতী যে বসে বসে কারাগারে কাঁদছে। চল্, সন্ধ্যামালতীকে কারাগার থেকে নিয়ে আসি।

সন্তু : তাই চল্, কিন্তু কারাগারের চাবি কোথায় পাব? তা ছাড়া কারাগারে খালি হাতে গেলে প্রহরীরা কেটে টুকরো করে ফেলবে।

মণ্টু : তাই তো! তাহলে আংটিকে ডাক দিয়ে বলে দে দুটো তলোয়ার, কারাগারের তালার চাবি আর কিছু দড়ি নিয়ে আসতে।

সন্তু : [আংটিকে] এই আংটি, দুটো তলোয়ার ও পরিরাজ্যের কারাগারের চাবি নিয়ে এসো তো? [সঙ্গে সঙ্গে একটি মেয়ে একটা পাত্রে করে একটা চাবি ও দুটো তলোয়ার নিয়ে হাজির। ওরা হাতে তুলে নিতেই অদৃশ্য।]
শোন মণ্টু, তুই তো কেবল হইচই করিস, কারাগারে পা-টিপে টিপে যেতে হবে, তারপর চুপ্ চাপ কাজ সারতে হবে বুঝলি?

মণ্টু : কিন্তু কারাগারের পথ চিনব কী করে?

সন্তু : আরে সেজন্যে তোকে ভাবতে হবে না। চল্ চুপি চুপি রাজবাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ি একবার। তারপর খুঁজে বের করে নেব কারাগার।

মণ্টু : ঠিক আছে চল্। [প্রস্থান]।

[৬ষ্ঠ দৃশ্য]

[মঞ্চের এক পাশে কারাগার। কারাগারের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সন্ধ্যামালতী মাটিতে শুয়ে আছে। প্রহরী বল্লম হাতে পায়চারি করছে। যখন প্রহরী দেখল সন্ধ্যামালতী ঘুমুচ্ছে, তখন সেও বল্লমটি এক পাশে রেখে

ঘুমুতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রহরী নাক ডাকতে শুরু করে। চুপি চুপি পা টিপে টিপে সন্তু-মণ্টুর প্রবেশ। মণ্টুর ইঙ্গিতে সন্তুকে বুঝিয়ে দিল যে, সে কাপড় দিয়ে প্রহরীর মুখ বাঁধবে এবং সন্তু যেন তখন চাবি দিয়ে কারাগারের তালা খুলে নেয়। খুব সাবধানে তারা কাজ শেষ করল। মণ্টু প্রহরীকে বাঁধল, তারপর দুজনে প্রহরীকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর কারাগারে ঢুকল।]

সন্তু : সন্ধ্যামালতী, সন্ধ্যামালতী, আমরা এসেছি। ওঠ সন্ধ্যামালতী—

সন্ধ্যা : কে? কে তোমরা?

সন্তু : আস্তে কথা বল। ভয় নেই, আমরা পৃথিবীর মানুষ।

সন্ধ্যা : তোমরা কী করে এলে! তোমরা মরোনি!

সন্তু : আর আমাদের মারে এমন সাধ্যি কার? এখন দেরি করো না। তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি, তাড়াতাড়ি এসো।

[এমন সময় একজন প্রহরী তাদের দেখে পালিয়ে গেল] 'সর্বনাশ হয়েছে, এই প্রহরীটা গিয়ে এক্ষুনি রানিকে বলে দেবে, তার আগে আমরা পালিয়ে যাই। চল চল সন্ধ্যামালতী, আর একটুও দেরি করো না।

সন্ধ্যা : কিন্তু, আমি পৃথিবীতে যাব কী করে, আমি তো পরি—

সন্তু : কিছু হবে না। তোমাকে আমাদের ঘরে লুকিয়ে রাখব। কেউ দেখবে না। চলো চলো।

মণ্টু : আর দেরি করো না! কেউ এসে পড়লে রক্ষে নেই। তাড়াতাড়ি—
[হঠাৎ পাগলা ঘণ্টির আওয়াজ দূর থেকে শোনা যায়]।

সন্ধ্যা : এক্ষুণি রানির সৈন্যরা সব এসে পড়বে। কি করব আমি?

মণ্টু : কী আর করবে? তাড়াতাড়ি পালাই চল—[তিনজনে অগ্রসর হতেই সৈন্যদের নিয়ে রানির প্রবেশ]

রানি : সৈন্যগণ এক্ষনি এদের মেরে ফেল। এদের এত বড়ো সাহস যে—

মণ্টু : সন্তু, যমভূত কে আসতে বল্। এসো পরির রানি, মজা দেখবে এসো।

সন্তু : [আংটিকে] আংটি যমভূতকে পাঠাও—
[তীব্র আওয়াজ করে ভূত এলো। এক একটা করে সৈন্য মারতে লাগল। সৈন্যরা ভয়ে পালাতে লাগল। ভূত রানিকে ধরতে গেল। রানি ভয়ে চিৎকার করে উঠল। সন্ধ্যামালতী দুহাতে চোখ মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।]

রানি : বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও, সন্ধ্যামালতী বল না ওদের, ভূতকে থামাতে। ও-মাগো, খেয়ে ফেললে গো!

সন্ধ্যা : পৃথিবীর মানুষ, তোমরা আমাদের রানিকে মেরো না।

রানি : আমাকে মেরো না। তোমরা যা চাও তাই তোমাদের দেব।

সন্তু : সত্যি বলছ? [রানি সম্মতি জানাল] আংটি ভূতকে চলে যেতে বলো।
[ভূত অদৃশ্য হল]

রানি : [হাঁফাতে হাঁফাতে উঠে দাঁড়াল] পৃথিবীর মানুষ, তোমরা যা চাও তাই দেব, তবুও ওই ভূতকে আর ডেকো না।

মণ্টু : আমরা যা চাই, তাই দেবেন মহারানি?

রানি : হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই দেব।

উভয়ে : আজ থেকে আমরা পরির দেশের অর্ধেক রাজত্ব চাই।

রানি : হ্যাঁ, তাই হবে। এই কে আছিস্, ডাক সবাইকে, মন্ত্রী, সেনাপতি পাত্রমিত্র সবাইকে ডাক।
[সকলে হাজির। ফুলপরিরাও এলো]
মন্ত্রী, রাজ্যে ঘোষণা করে দিন যে, আজ থেকে এই পৃথিবীর দুই মানুষকে আমি আমাদের দেশের অর্ধেক রাজত্ব দিলাম—

মন্ত্রী : যথা আজ্ঞা মহারানি।

রানি : চল মন্ত্রী, আমরা যাই।

মণ্টু : দাঁড়ান রানি মা, দাঁড়ান, আমাদের কিছু কথা আছে।

রানি : কী কথা?

সন্তু : সন্ধ্যামালতী, তোমার জন্যেই আমরা অর্ধেক রাজত্ব পেলাম। তুমি যা চাও তাই তোমাকে দেব। কি চাও বলো?

সন্ধ্যা : তাহলে তোমরা আমাদের রানিকে রাজত্ব ফিরিয়ে দাও। তোমরা এমনিতেই আমাদের দেশে থাকো। আমরা নাচগান, ফুর্তি করে দিন কাটাব।

মণ্টু : এমন রাজ্যটা হাতে পেয়ে ছেড়ে দিবি?

সন্তু : আমরা পরির রাজ্য দিয়ে কী করবো বল? আর আমরা না বলেছি সন্ধ্যামালতী যা চাইবে তাই দেব?

মণ্টু : হ্যাঁ তাই তো—

মণ্টু, সন্তু : তোমাদের রাজ্য তোমাদের ফিরিয়ে দিলাম সন্ধ্যামালতী। এসো এবার আমরা একটু নাচ গান করি।
[সন্ধ্যাসহ সকলে নাচতে থাকে]

ধিন্ ধিনা ধিন্ ধিন্
আজকে বড়ো মজার দিন
নাচব মোরা তাধিন ধিন্।

[সন্ধ্যাকে মধ্যে রেখে সবাই নাচতে থাকে। নাচতে নাচতে এক ফাঁকে সন্তু অদৃশ্য হয়ে যাবে, অন্যেরা নাচতে থাকবে।]

[৭ম দৃশ্য]

[সন্তুদের বাড়ি। সন্তু, ও তার মা বিছানায় শোয়া। হঠাৎ সন্তু সুর করে গেয়ে উঠে—'তাধিন্ ধিন্'।]

মা : সন্তু, ও সন্তু, কী বকছিস্ ঘুমের মধ্যে? এই সন্তু! সন্তু?

সন্তু : [ঘুম ভেঙে গেল। চোখ কচলায়] এ্যাঁ ফুলপরি কই? সন্ধ্যামালতী কই?

মা : [বসে] ও স্বপ্ন দেখছিলি বুঝি? নে শুয়ে পড়, শুয়ে পড়।

সন্তু : কিন্তু ফুলপরি কোথায় গেল?

মা : নে শুয়ে পড় তো দেখি? ঘুমের মধ্যে কী আবোল তাবোল বকছিস্? [জোর করে সন্তুকে শুইয়ে দেয়।]

যবনিকা

আর এক তোতার কাহিনি

হীরেন সিন্‌হা

চরিত্রলিপি : প্রকৃতি ; কাক ; রাজা ; মন্ত্রী ; উখ্যব ; প্রহরী ভোলা। এছাড়া ৬ জন অভিনেতা। কখনও পোয়াদার দল, কখনো গাইয়ে দল, কখনো গুরুমশাইদের ভূমিকায়।

মঞ্চ : বাস্তবোচিত বা প্রতীকী মঞ্চ হতে পারে। মুক্তমঞ্চে আলো ছাড়াও কয়েকটা বাক্সের ব্যবহার করে অভিনয় চলতে পারে।

পোশাক : চরিত্রানুগ। সময় ঃ ৪০ মিনিট।

নাটকটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "তোতা কাহিনী" রচনার (১৯১৮) ছায়া অবলম্বনে রচিত।

প্রেরণা : ডঃ সুদীন চট্টোপাধ্যায়

[মঞ্চে ছোটো ছোটো গাছের Cutout। ফুল ফুটে আছে। মঞ্চে প্রকৃতি প্রবেশ করে নেচে নেচে। প্রচলিত নৃত্য ধারায় যন্ত্র অনুষঙ্গে। রং-বেরঙের আলো পড়ে সারা মঞ্চে।] [প্রকৃতি গান গায়।]

প্রকৃতি :

আয় আয় তোরা, আয়রে আমার অঙ্গনে
নাচবি গাইবি হাসবি খেলবি আমার সনে।
—সাদা মেঘের ভেলায়
নীল পাহাড়ের সবুজ দেশে
কে যাবি আয় পাখির ডানায় ভর করে—
ওই পরীর দেশে-গহন বনে।

প্রকৃতি : কেন?
কাক : যেন গদি না উলটোয়।
প্রকৃতি : ও—
(মন্ত্রী প্রবেশ করে। পেছনে পেছনে উদ্ধব। হাতে একটা মোটাখাতা।)
রাজা : এতো দেরি হল কেন?
উদ্ধব : না মহারাজ; এই আর কি; মানে তথ্যগুলো হাতে আসতে একটু সময় লেগে গেল।
রাজা : মন্ত্রী
মন্ত্রী : মহারাজ
রাজা : দরজা বন্ধ করে দিতে বল।
মন্ত্রী : বলে এসেছি মহারাজ।
রাজা : তাহলে শুরু করো।
(উদ্ধব তাড়াতাড়ি খাতা খুলে বিশেষ পাতাটি খোঁজে।)
প্রকৃতি : উনি বুঝি মন্ত্রী?
কাক : হ্যাঁ।
প্রকৃতি : (উদ্ধবকে দেখিয়ে) আর এ?
কাক : রাজার বিশেষ কর্মচারী। রাজার শ্যালক। পুথি পড়ার ব্যাপার-স্যাপার উনিই তো দেখছেন।
(উদ্ধব কাঙ্ক্ষিত পৃষ্ঠাটি পেয়ে যায়।)
উদ্ধব : তাহলে শুরু করি মহারাজ—
মন্ত্রী : তাই করুন—
রাজা : একটু দাঁড়াও—
(রাজা আঙুল দিয়ে এক নাক বন্ধ করে শ্বাস নেয়। পরে অন্য নাকেও তাই করে। দুটো চোখ বোজা।)
প্রকৃতি : এটা কী করছেন?
কাক : নাকের স্বর বিচার
প্রকৃতি : মানে?
কাক : সংস্কার। যাতে ভালো খবর শুনতে পান। এক নাক বন্ধ থাকলে কারো কথা শুনবেন না।
প্রকৃতি : ও—
(রাজা চোখ খোলে)
রাজা : শুরু করো।
মন্ত্রী : শুরু করুন—শুরু করুন।
উদ্ধব : মহারাজ। যা তথ্য পেয়েছি, তাতে আপনার নতুন চালু করা শিক্ষার কাজ ভালোই চলছে।
রাজা : বাঃ।
মন্ত্রী : অতি সফল উদ্যোগ—
উদ্ধব : সব পড়ুয়ারাই দেবভাষা পাঠ করছে, সেইসঙ্গে নানা শাস্ত্র পাঠও শুরু করেছে। তা ছাড়া আমাদের পূর্ব পুরুষদের গৌরব-গাথাও মনোযোগ সহকারে পড়ছে।
রাজা : বাঃ! চমৎকার (রাজা আসনে দোল খায়)

উদ্ধব : বিজ্ঞান আর কারিগরি পাঠের ভাগ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।
কাক : এ তথ্য সম্পূর্ণ কী?
রাজা : কে বলল? (দুলুনি থামে)
মন্ত্রী : (চকিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাককে দেখতে পায়) ও একটা কাক ; ওই কার্নিশে বসে আছে।
রাজা : ও ! বায়স (নিশ্চিন্ত হয়।)
মন্ত্রী : মানে?
রাজা : মূর্খ! বায়স মানে কাক। (মন্ত্রী লজ্জা পায়।)
উদ্ধব : হুস্—হুস্—(তাড়াতে যায়।)
মন্ত্রী : বায়স। থাক না-
উদ্ধব : থাকবে কেন? ফোড়ন কাটছে যে।
মন্ত্রী : ওর কথায় কী যায় আসে?
রাজা : তাই তো। বৃথা সময় নষ্ট। তবে হ্যাঁ, এ তথ্য সম্পূর্ণ তো? অবাধ্য কেউ—
উদ্ধব : আজ্ঞে বলছি। (পাতা উলটোয়)
প্রকৃতি : আমাকে দেখতে পাবে না জানি। কিন্তু তুই আর ওদের কথার মাঝখানে কিছু বলতে যাস্ না।
কাক : আমি বাপু বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারি না।
উদ্ধব : (পেয়ে যায়) পেয়েছি মহারাজ। একটি ছেলে, নাম ভোলা। ভোলানাথ। তার পাঠে মন নেই। শুধু ঘুরে বেড়ায়। গুরুমশাইদের কথা শুনছে না। শাস্ত্র পড়ছে না। (প্রকৃতি কাকের দিকে তাকায়। উৎকণ্ঠিত হয়।)
রাজা : কী! মন্ত্রী—
মন্ত্রী : মহারাজ—
রাজা : একটা পুঁচকে ছেলে, কী যেন নাম বললে?
উদ্ধব : ভো-ভোলা—ভোলানাথ।
রাজা : তাইতো? ওর মা বাবা?
উদ্ধব : মা নেই বাবা আছে।
মন্ত্রী : বাবা কী করে? (রাজা বিরক্ত হয়।)
রাজা : আঃ! ছেলেকে নিয়ে আমার মাথাব্যথা, বাবাকে নিয়ে নয়। (একটু নীরবতা।) আর কী? বল
উদ্ধব : আরও আছে মহারাজ।
রাজা : হ্যাঁ হ্যাঁ বল।
উদ্ধব : ভোলা, ভরা দিঘিতে সাঁতার কাটে।
রাজা : এ্যাঁ।
উদ্ধব : আম গাছের মগডালে উঠে আম পাড়ে।
রাজা : মন্ত্রী কী।
উদ্ধব : ছিপ হাতে যখন তখন ঝিলের ধারে বসে
রাজা : মন্ত্রী তাই নাকি!!

উদ্ধব : খোলা মাঠে উদ্দাম ছুটে বেড়ায় (একটু নীরবতা। রাজা গম্ভীর হয়। কঠিন হয় মুখ।)
রাজা : আর কী করে?
উদ্ধব : আর, আর (মাথা চুলকে খাতা দেখে)
কাক : গান গায় আর কবিতা বলে
উদ্ধব : (খেই পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে) গান গায় আর কবিতা বলে। (রাজা উঠে দাঁড়ায়। মুখ রাগে লাল হয়ে যায়।)
প্রকৃতি : বললি কেন?
কাক : খাতা দেখে তো শ্যালকমশাই বলতোই—
প্রকৃতি : এখন কী হবে?
কাক : তাইতো ভাবছি—
রাজা : মন্ত্রী
মন্ত্রী : বলুন মহারাজ
রাজা : ছেলেটাকে ধরে এনে কষে সাজা দেওয়া উচিত-
মন্ত্রী : তাই উচিত মহারাজ।
রাজা : কী শাস্তি দেওয়া উচিত?
উদ্ধব : জামাইবাবু (রাজা রেগে তাকায়) মানে মহারাজ, ওর যখন পাঠে মন নেই, তখন ওকে রাজবাড়িতে চারদেয়ালে আটকে রেখে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।
মন্ত্রী : যেতে পারে নয় ; তাই করা হোক।
রাজা : হুম্! ভালোই ভেবেছ তো! অবাধ্যকে বাধ্য করা, অমনোযোগীকে মনোযোগী করা—, বেশ একটা নতুন ধরনের পরীক্ষাও হবে।
মন্ত্রী : যথার্থ বলেছেন মহারাজ।
উদ্ধব : তবে বেশকিছু খরচ হয়ে যাবে জামাইবাবু-
রাজা : আঃ! — (উদ্ধব অপ্রস্তুত হয়।)
উদ্ধব : মানে, মহারাজ।
মন্ত্রী : কত আর খরচ হবে।
উদ্ধব : মন্দ নয়।
রাজা : কী রকম?
উদ্ধব : গণ্ডি তৈরি করা, থাকা খাওয়ার খরচ। তা ছাড়া পুথি ক্রয় করা—গুরুমশাইদের বেতন থেকে শুরু করে—
কাক : শ্যালাক বাবাজির কমিশন—
রাজা : আঃ। মোট কত পড়বে তাই বলো।
উদ্ধব : এই ধরুন গিয়ে বছরে লাখ দুই—
মন্ত্রী : এত্তো!
রাজা : এ আর কত।
উদ্ধব : এছাড়া মগজ ধোলাই করা। ধর্মে-কর্মে মতি আনা। মহান শাস্ত্রজ্ঞ তৈরি করার প্রাথমিক খরচতো—

রাজা : বুঝেছি বুঝেছি। মন্ত্রী

মন্ত্রী : বলুন মহারাজ।

রাজা : ছেলেটিকে ধরে আনো।

প্রকৃতি : একী বলছে!

রাজা : এক্ষুণি সেপাই পাঠাও—(মন্ত্রী 'প্রহরী', প্রহরী, বলে ডাকতে ডাকতে ছুটে বেরোয়।)

প্রকৃতি : না—না—

কাক : কা—কা—কাক ডানা ঝাপটায়

উদ্ধব : হুস্—হুস্ (উদ্ধব ফিরে) জামাইবাবু

রাজা : বল শ্যালক বাবাজি—

উদ্ধব : রাজকোশ থেকে আগাম কিছু

রাজা : নিয়ে যাও। ছেলেটিকে নিয়ে লেগে যাও। আগে যা শিখেছে সব ভুলিয়ে দাও—আমি কদিন পর এসে দেখব কেমন শিখেছে।

উদ্ধব : যথা আজ্ঞা জামাই—মানে মহারাজ।

রাজা : ধর্মের পুথিগুলো গুলে খাইয়ে দাও। (রাজার প্রস্থান। উদ্ধব এগিয়ে দেয় wings পর্যন্ত।)

প্রকৃতি : কী হবে রে?

কাক : তাই তো ভাবছি। (উদ্ধব ফিরে আসে)

উদ্ধব : যাক্। রাজকোশ থেকে আরও কিছু হাতিয়ে নেওয়ার একটা ব্যবস্থা হল। যাই, গুরুমশাইদের সঙ্গে কথা পাকা করে আসি। (উদ্ধবের প্রস্থান)

প্রকৃতি : আমার ভোলানাথকে ওরা তাহলে—

কাক : আগে বলো—আমার সব কথা বিশ্বাস হল তো?

প্রকৃতি : হ্যাঁ রে। আমার খারাপ লাগছে, তোকে এ নিয়ে অনেক খারাপ কথা বলেছি।

কাক : ওসব আমি গায়ে মাখি না—

প্রকৃতি : আমার যে ভোলার জন্য চিন্তা হচ্ছে রে!—ও এখন কোথায় থাকতে পারে বল তো?

কাক : এ সময় ? (একটু ভেবে) উম্, নদীর ধারে কাশ বনে। হয়তো ফড়িং ধরছে, নয়তো প্রজাপতির পিছু নিয়েছে।

প্রকৃতি : ও যদি ধরা পড়ে? আঃ! (প্রকৃতি হাঁপায়)

কাক : কী হল?

প্রকৃতি : আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

কাক : তা–তো হবেই। এতক্ষণ এই বন্ধ জায়গায় আছো। চলো, বাইরে চলো—

প্রকৃতি : না, আমি দেখে যাব, ভোলাকে নিয়ে ওরা, আঃ।

কাক : তোমার এসব দেখে কাজ নেই। আমি আছি তো! আমি তোমায় খবর দেব—কখন কী হচ্ছে

প্রকৃতি : সত্যি তো! আঃ—

কাক : তিন সত্যি। এখন চলো তো

প্রকৃতি : চল্—

(ওরা চলে যায়। আলোর পরিবর্তন হয়। হ্যান্ডস্পটের আলো-আঁধার। তাল বাজে। ৬ জন অভিনেতার কোমরে গেরুয়া রঙের কাপড় বাঁধা। ওদের হাতে একমাপের লাঠি। ছন্দে ছন্দে পা ফেলে ঢোকে।)

সমবেত : কিত্ কিত্ কিত্ কিত্ কিত্ কিত্ কিত্ কিত্ (৪ বার)
আতি-পাতি খোঁজ কর পেয়ে যাব ঠিক।
আম পাকে বৈশাখে ; কুল পাকে ফাগুনে।
কাঁচা মাটি পাকা হয় ; পোড়ালে তা আগুনে।
আধপেটা খেয়ে বাবা-হাড়ভাঙা খাটুনি,
আমাদের কিযে দশা, বুঝবে তা কজনে?
(লয় কমে যায়। ধীরে লয় বলে)

ওরে বাবা—আর পারি না—কত তাকে খুঁজব—ছুটে ছুটে পায়ে ব্যথা—উপায় নেই যে বসব।
(ঝপ্ করে সব থেমে যায়। ওরা হাঁপায়, ঘাম মোছে। ওদের মধ্যে একজন হঠাৎ wings—এর দিকে তাকায়। পা টিপে এগিয়ে গিয়ে দেখে ফিরে আসে। চাপা গলায় বলে)

দলনেতা : ওই আসে—, যাকে চাই—,
চল সবে আড়ালে যাই—,
(ভোলার গানের তাল শুরু দলনেতার লক্ষ করার সময় থেকেই। এই তালেই ওরা মঞ্চে ছড়িয়ে যাবে। ভোলা এবার গাইতে গাইতে ঢোকে।)

ভোলা : কান পেতেছি, চোখ মেলেছি।
ধরার বুকে-প্রাণ ঢেলেছি,
জানার মাঝে অজানারে, করেছি সন্ধান
বিস্ময়ে তাই জাগে জাগে আমার প্রাণ।
(গানটার মুখড়ায় ফিরে আসতেই আড়ালের—৬জন ওকে মঞ্চের মাঝখানে ঘিরে ধরে। তাল শুরুর সঙ্গে সঙ্গে হা-ডু-ডু-ডু খেলার ভঙ্গিতে ঘুরতে ঘুরতে সমস্বরে বলে)

সমবেত : কিত্ কিত্ কিত্ কিত্ কিত্ কিত্ কিত্ কিত্
খোঁজে খোঁজে তবে শেষে পেয়ে গেছি ঠিক।
(ওরা ক্রমে ওই দু-লাইন বলতে বলতে হাতের লাঠিগুলো পরস্পর ধরে ওকে ঘিরে গন্ডি তৈরি করে। ভোলা চিৎকার করে বেরোতে চাইলেও পারে না।)

ভোলা : ছেড়ে দাও-ছেড়ে দাও আমাকে, ছেড়ে দাও

সমবেত : হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ নিয়ে চল রাজবাড়ি কিত্ কিত্ কিত্ (প্রস্থান) (আলো নেভে।)
(ঘরেও আলোর বৃত্ত। বৃত্তের মাঝাখানে একটি কালো বাক্স। আলো ম্লান, হলদেটে। জোরালো মিউজিক বাজে। প্রহরী ভোলার হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে মঞ্চে। ধাক্কা মেরে মঞ্চের মাঝখানে ফেলে বাক্সটার সামনে। ভোলা পড়ে যায় আর্তনাদ করে।)

ভোলা : আঃ! (পড়ে যায়) একি! এখানে আমাকে নিয়ে এলে কেন?

প্রহরী : রাজার আদেশ।

ভোলা : কী দোষ করেছি আমি? বল, চুপ করে আছ কেন?

প্রহরী : যথাসময়েই জানতে পারবে
(উদ্ধব প্রবেশ করে, প্রহরী সেলাম করে।)

উদ্ধব : এই যে, ভোলানাথ, একি! চোখ ছলছল কেন?

ভোলা : আমাকে ছেড়ে দাও—(হাঁটু গেড়ে অনুনয় করে)

উদ্ধব : নিশ্চয়ই ছেড়ে দেব—(কাছে বসে)

ভোলা : আমাকে ধরে এনেছ কেন?-বল?

উদ্ধব : তোমার ভালোর জন্য।

ভোলা : চাই না আমার ভালো ; আমাকে যেতে দাও

উদ্ধব : যাবে। তার আগে যে তোমায় কিছু শিখতে হবে

ভোলা : কী শিখব?

উদ্ধব : শাস্ত্র, মন্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, আর হস্তরেখা বিচারের পাঠ

ভোলা : ওসব কেন শিখতে যাব?

উদ্ধব : বড়ো হবার জন্য ; পণ্ডিত হবার জন্য, আমাদের জাতির, ধর্মের—গৌরব বাড়াবার জন্য!

ভোলা : এ পাঠ আমার ভালো লাগে না (ভোলা দাঁড়ায়।)

উদ্ধব : (কঠিন হয় ; 'তুমি' ছেড়ে 'তুই' করে কথা বলে। দাঁড়ায়।) তাই বুঝি আর পাঠাশালাতে যাস না! গুরুমশাইদের কথা শুনিস না। পড়া ছেড়ে মাঠে বনে আর নদীর ধারে ছুটে বেড়াস! ফড়িং ধরিস, প্রজাপতির পেছনে ছুটিস, আর কাঠবেড়ালির কাছে একটি পেয়ারা দেবার জন্য আবদার করিস।

ভোলা : হ্যাঁ। তাইতো করি।

উদ্ধব : (টেনে টেনে বলে।) কিন্তু এসব যে আর এদেশে চলবে না ভোলানাথ।

ভোলা : আমার ওসব পড়তে মন চায় না। দেখ, তোমার দুটি পায়ে পড়ি; আমাকে ছেড়ে দাও।

উদ্ধব : তা কী করে হয়? রাজার আদেশ অমান্য করেছিস, গুরুমশাইদের অবাধ্য হয়েছিস ; তোর নামে অনেক অভিযোগ। তা ভালোই হল, কী বলিস?

ভোলা : কীসের কী ভালো হল?

উদ্ধব : এখন রাজার খরচে খাবি, পড়বি—, রাজবাড়িতে

ভোলা : আমি চাই না রাজবাড়িতে থাকতে। দোহাই, আমায় ছেড়ে দাও।

উদ্ধব : ছেড়ে দেব! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ; আরে তুই যে আমার সোনার ডিম পাড়া হাঁসরে! শোন

ভোলা : না, আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না। আমি এখান থেকে যেতে চাই, আমাকে যেতে দাও—(ভোলা পালাতে চায়। প্রহরী বর্শা উঁচিয়ে পথ আটকে দাঁড়ায়।)

উদ্ধব : আরে আরে যাচ্ছিস কোথায়? এখানে আয় ; আয় বলছি। (উদ্ধব যেন এবার আসল রূপে দেখা দেয়।)
(ভোলা ভয়ে ভয়ে আগের জায়গায় আসে।) এখানটায় চুপ করে দাঁড়া—! প্রহরী!

প্রহরী : আজ্ঞে আদেশ করুন।

উদ্ধব : ও নড়লেই বর্শার খোঁচা দেবে-

উদ্ধব : আজ্ঞে তাই করব - (বর্শা উঁচিয়ে দাঁড়ায়।)

উদ্ধব : পালাবি? নারে ভোলা, পালানো তোর হবে না।
(পকেট থেকে একটা সাদা খড়ি বের করে ভোলার চারদিকে বড়ো করে গণ্ডি আঁকে। ভোলা অবাক চোখে দেখে।)

উদ্ধব : গণ্ডি দিয়ে দিলাম। বুঝতে পারছিস? (বোঝায়) কেন এমন করছিস বল তো? আমার কথামতো চললে মানুষের মতো মানুষ হবি। তা ছাড়া—

ভোলা : আমি চাই না এমনভাবে মানুষ হতে। শোন, তোমার কী এতটুকু দয়ামায়া নেই? আমাকে যেতে দাও—

উদ্ধব : প্রহরী

প্রহরী : আজ্ঞে আদেশ করুন

উদ্ধব : গুরুমশাইদের খবর দাও।

প্রহরী : আজ্ঞে যাচ্ছি। (প্রহরীর প্রস্থান।)

ভোলা : আমি কিছুতেই এখানে থাকব না। না-না-কিছুতেই না (ছুটে বেরিয়ে যেতে চায়। গণ্ডি রেখার অদৃশ্য দেয়ালে বাধা পেয়ে ফিরে আসে। উদ্ধব হাসতে থাকে) একি! আমি বেরুতে পারছি না কেন?

উদ্ধব : গণ্ডির ভিতর আটকা পড়েছিস! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ

ভোলা : না- (ভোলা চিৎকার করে দু-হাতে মুখ ঢেকে আস্তে আস্তে বসে পড়ে। কান্নার দমক উঠে। এমন সময় কাক 'কা-কা' বলে ডানা ঝাপটিয়ে প্রবেশ করে। উদ্ধবকে আক্রমণ করতে যায়।

উদ্ধব : অ্যাই!-অ্যাই! হুঁস্ হুঁস্। (আত্মরক্ষা করে দু-হাতে) দূর-হ এখান থেকে। যাঃ-যাঃ, আরে আরে অ্যাই (এ অবস্থায় প্রথমে প্রহরী ও পেছনে ৬ গুরুমশাই ঢোকে। গুরুমশাইদের ধুতি-ফতুয়া, গলায় গেরুয়া গলবস্ত্র। কপালে গেরুয়া টিপ। উদ্ধব ওদের দেখতে পায়।) প্রহরী, মারো-মারো এটাকে। খুন করে ফেলো—

প্রহরী : হ্যাট, হ্যাট!
(বর্শা উঁচিয়ে ধাওয়া করে। কাক পালায় পেছনে পেছনে প্রহরীর প্রস্থান। গুরুমশাইরা যারপর নাই ভীত ত্রস্ত।)

উদ্ধব : কী বজ্জাত কাকরে বাবা! হঠাৎ ক্ষেপে গেল কেন?

গুরুমশাইরা : বায়স পুঙ্গাব! কী হেতু কলরব?

উদ্ধব : আপনাদের জেনে লাভ নেই ওসব। কাজের কথা বলি। এখানে আসুন। (সবাই উদ্ধবের কাছে আসে) যেজন্য আপনাদের ডাকা হয়েছে, সে কাজটি শুরু করুন। আজি, এখুনি—

গুরুমশাইরা : অবশ্যি! বালকটি কোথায়?

উদ্ধব : (ভোলাকে দেখিয়ে) এই যে, হেথায়।

গুরুমশাইরা : সুকোমল বালক। যেন হরিণ শাবক।

উদ্ধব : প্রশংসায় আর কাজ নেইকো! শুনুন, এর কথাতো আপনাদের আগেই বলেছি। কী করতে হবে তাও বলেছি। রাজা মশাইয়ের হুকুম। অল্পদিনেই ফল মেলা চাই। আর তা যদি না হয়—

গুরুমশাইরা : হবে সাজা অতিশয়।

উদ্ধব : হুম্ তাহলে? লেগে যান—

গুরুমশাইরা : পুথিগুলো আগে আনান।

উদ্ধব : প্রহরী (প্রহরী প্রবেশ করে) পুথিগুলো নিয়ে এসো তো।

প্রহরী : যথা আজ্ঞা (প্রহরী চলে যায়।)
উদ্ধব : ছেলেটি অবাধ্য। কথা না শুনলে কড়্‌কে দেবেন। পড়া না শিখলে মচ্‌কে দেবেন। মনোযোগী না হলে—
গুরুমশাইরা : খাম্‌চে দেবেন।
উদ্ধব : আমি না। আপনারা (গুরুমশাইরা অপ্রস্তুত হয়।) আরও শুনুন। আগে যা শিখেছে—
গুরুমশাইরা : ভুলিয়ে দেব—
উদ্ধব : নতুন সব পাঠ—
গুরুমশাইরা : পড়িয়ে দেব।
উদ্ধব : পূজার মন্ত্র—
গুরুমশাইরা : শিখিয়ে দেব।
উদ্ধব : নয়া ইতিহাস? (গুরুমশাইরা খুব চাওয়া-চাওয়ি করে।) কী হল? নয়া ইতিহাস—
গুরুমশাইরা : (হঠাৎ করে) গিলিয়ে দেব।
উদ্ধব : বেশ! (পুথিগুলো নিয়ে প্রহরী ঢোকে। কালো রঙের মলাটে ঢাকা বড়ো বড়ো—৬ টি বই হাতে।) হ্যাঁ এইতো। পুথিগুলো এসে গেছে। আপনারা তাহলে শুরু করুন। এই ফাঁকে রাজামশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসছি। আপনারা শুরু করুন। প্রহরী—
প্রহরী : যে আজ্ঞে!
উদ্ধব : (wings দেখিয়ে) দরজার বাইরে পাহারা দেবে। কেউ যেন না পড়ায় ব্যাঘাত ঘটায় দেখবে।
প্রহরী : যে আজ্ঞে!
(উদ্ধব ও প্রহরীর প্রস্থান। ওদের কথা বলার সময় গুরুমশাইরা একটা করে পুথি নিয়ে প্রস্তুত হয়। ওরা ক্রমে ভোলার কাছে যায়। অর্ধবৃত্তাকারে ওকে ঘিরে ধরে।)
সমবেত : বৎস, বাছা—
ভোলা : (দু-হাঁটুতে মুখ ঢেকে বসেছিল। ধীরে ধীরে মাথা তুলে ওদের দিকে তাকায়) কে তোমরা?
সমবেত : গুরুমশাইয়েরা।
ভোলা : না, আমি তোমাদের কাছে পড়ব না—(দাঁড়ায়)
সমবেত : না বলিতে নাই; শাস্ত্র বলে তাই—।
ভোলা : তোমরা এখন যাও দেখি—
সমবেত : তোমার নামটা আগে বলো তো কী?
ভোলা : (একটু পরে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও।) ভোলা, ভোলানাথ।
সমবেত : (হঠাৎ করে।) বোম্ ভোলানাথ, বোম শিবশঙ্কর, জয় শিবশম্ভু, জয় অভয়ঙ্কর। (ওপরের দিকে তাকিয়ে সবাই কপালে হাত রেখে প্রণাম করে)
ভোলা : (আঁতকে ওঠে) এ আবার কী?
গুরু-১ : তোমার নাম শুনে খুশি হয়েছি।
গুরু-২ : এবার পাঠে মন দাও দেখি—
গুরু-৩ : মনকে সংযত করো—
গুরু-৪ : মস্তিষ্ককে শান্ত করো—

গুরু-৫ : চক্ষু মুদ্রিত করো—

গুরু-৬ : কর্ণেন্দ্রিয়কে সজাগ করো—

সমবেত : মুখ ব্যাজার করে! হাঁ — (সবাই শব্দ করে হাঁ করো।)

ভোলা : (ওদের অনুকরণ করো) হাঁ—,

সমবেত : এবার গলাধঃকরণ করো—।

(গুরুমশাইরা অর্থহীন শব্দ করে ওকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। ভোলা প্রথমে কৌতূক অনুভব করবে, পরে অবাক হবে। সবশেষে দু-কান ঢেকে চিৎকার করে ওঠে। এর অভিব্যক্তি গুরুমশাইদের নজরে আসবে না। অর্থহীন শব্দগুলো শুনতে মন্ত্র পাঠের মতো হবে। একঘেয়ে এবং বিরক্তিকর। অন্তত ৫/৭ বার প্রদক্ষিণ করতে হবে মধ্যলয়ে।)

সমবেত : ও-আ-ই-ই উ-উ এ-এ।
এ-এ-উ-উ-ই-উ-আ-ও।।

ভোলা : আঃ! চুপ্ করো চুপ করো তোমরা। (ওরা থেমে যায়। অর্ধবৃত্ত করে দাঁড়ায়।)
তোমরা কী বলছ, আমি এক বর্ণও বুঝতে পারছি না!

সমবেত : শুনে যাও—পারবে।
শুনে মনে—রাখবে।(ওরা একইভাবে ভোলাকে ছয়বার প্রদক্ষিণ করে।আগের চাইতে লয় বাড়ে)

সমবেত : ও-আ-ই-ই উ-উ এ-এ।
এ-এ-উ-উ-ই-ই-আ-ও।

ভোলা : না, না, তোমরা থামো, থামো। (ওরা থামে) বিশ্বাস করো। (হাঁপায়) তোমাদের ভাষা আমি বুঝি না। এ আমাকে কীসব শোনাচ্ছে। এর আগে তো এসব পড়িনি, শুনিনি। (চোখে জল আসে।)

সমবেত : এ আমাদের পূর্বজদের ভাষা, দেবতাদের ভাষা।

ভোলা : আমি এ ভাষা বুঝি না। আমার ভাষা বল, (কান্না) মানুষের ভাষা বল, মানুষের ভাষা বল।
(উগ্ধবের প্রবেশ)

উগ্ধব : কী হল? ও' কাঁদছে কেন?

সমবেত : প্রথম প্রথম এমন হবে,
শূন্য থেকে শুরু সবে।

উগ্ধব : আচ্ছা, আজকের মতো আসুন তবে। (ওরা যেতে পা বাড়ায়।) হলো।
শুনুন। কাল সময় মতো আসবেন। কদিন পরেই রাজামশাই এসে দেখে যাবেন, কেমন শিক্ষে হল।

সমবেত : সে তো খুবই ভালো। চলো সবাই চলো। (ওদের প্রস্থান)।

উগ্ধব : (ক্রন্দনরত ভোলার পেছনে এসে দাঁড়ায় ভাবে। কী মনে করে ভোলার পাশে এসে বসে।)

উগ্ধব : ভোলা, এ কী করছিস বলতো! নিজেও কষ্ট পাচ্ছিস, আমাকেও কষ্ট দিচ্ছিস। ভোলা-(ভোলা নির্জীবের মতো)
শালা ঢং হচ্ছে? আমাকে চিনিস না তো! আমি কিন্তু এর শেষ দেখে ছাড়ব। তোকে বাজি রেখে লক্ষ মুদ্রা কামাই করার সুযোগটা এমনিতেই হাতছাড়া হতে দেব নাকি? আমি কি

এতোই বোকা? ভোলা—
(ভোলা কখন ঘুমিয়ে পড়ে)
ভোলা, ঘুমিয়ে পড়েছিস? হাড়ে হাড়ে বজ্জাত। যে কদিন হাতে সময় আছে তার মধ্যেই তোকে! —যাঃ, কার সঙ্গে কথা বলছি? দূর—(প্রস্থান)

॥ স্বপ্ন দৃশ্য ॥

(উদ্ধবের প্রস্থানের পর মঞ্চে হালকা নীল আলো ছড়িয়ে পড়ে। সেই আলোতে প্রকৃতি প্রবেশ করে। প্রথম দৃশ্যে গাওয়া গানটা তাল ছাড়া টেনে টেনে গায়। সঙ্গে মিষ্টি সুরের আবহ।)

ভোলা : (ঘুমের ঘোরে) মা! প্রকৃতি মা! মা, আমাকে তোমার কোলে নিয়ে চলো মা, আমি যে আর পারছি না। দেখ না, ওরা আমাকে আটকে রেখে কী সব শেখাচ্ছে! মা (কথাগুলো বলতে বলতে ভোলা উঠে বসে।)

প্রকৃতি : ভোলা—(ভোলার দিকে মমতাভরা হাত বাড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে গুরুমশাইদের সমবেত হাসি শোনা যায়। প্রকৃতি আঁতকে ওঠে। ক্রমে পেছন হটে যায়, যখন গুরুমশাইয়েরা সমানে পা ফেলে "হুম্ হুম্" শব্দ করে প্রবেশ করে। ওদের মুখে ভয়ংকর সব মুখোশ। প্রকৃতি প্রস্থান করে। মুখোশধারী গুরুমশাইয়েরা ভোলাকে ঘিরে ধরে হাসতে থাকে বিকৃতভাবে। "না" বলে চিৎকার করে ভোলা আতঙ্কে চোখ মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে।) (আলো নেভে) (আলো জ্বলে উঠলে দেখা যায় গুরমশাইয়েরা ভোলার পেছনে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে। সবার মুখ নীচের দিকে। সামনে উদ্ধবের অস্থির পদচারণা। ভোলা শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে আছে।)

উদ্ধব : দেখতে দেখতে পক্ষকাল পেরিয়ে গেল। এখনও এক বর্ণও শেখাতে পারেননি। আজই রাজামশাই আসবেন। কী জবাব দেব তাকে?

সমবেত : চেষ্টার কসুর করিনি। ওর বেলা এমনটা হবে ভাবিনি।

উদ্ধব : (ভোলাকে) এ্যাই হতচ্ছাড়া অবাধ্য ছেলে। তুই কী মনে করেছিস এমনি করে পার পেয়ে যাবি? উল্লুক, বাঁদর, পাজি, নচ্ছার। (গুরুমশাইদের) আপনারা দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছেন কী? শুরু করুন, যত্ত সব।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী : রাজামশাই আসছেন। সবাই সাবধান—(সবাই সচকিত হয়। ভোলা নির্বিকার) রাজা ও মন্ত্রী পর পর প্রবেশ করে।

উদ্ধব : আসুন মহারাজ, আসুন।

গুরুমশাইরা : জয় জয় রাজন। প্রজানুরঞ্জন।
তব জয় গাঁথা গায় অলখ নিরঞ্জন।

রাজা : আদিখ্যেতা থাক। আগে দেখি ছেলেটার শিক্ষা কতদূর হল? আসুন মন্ত্রীমশাই।

মন্ত্রী : হ্যাঁ। (রাজা-মন্ত্রী ভোলার দু-পাশে দাঁড়ায়। অন্যরা পেছনে।)
রাজা : এ্যাই যে শুনছো! কী যেন নাম এর?
উদ্ধব : আজ্ঞে, ভোলা। ভোলানাথ।
রাজা : হ্যাঁ, বাবা ভোলানাথ। একটু সুভাষিত বলে শোনাও তো! (ভোলা চুপ।) কী হল? লজ্জা কী? শোনাও—
মন্ত্রী : এ যে কথাই বলে না—
রাজা : নড়ে না চড়ে না।
মন্ত্রী : উদ্ধব বাবাজি! (উদ্ধব এগিয়ে আসে। গুরুমশাইরা অস্বস্তিতে।)
উদ্ধব : আজ্ঞে কথা বলবে। নিশ্চই বলবে। (তোয়াজ করে ভোলাকে বলে) ভোলা। এই দেখ; তোমাকে দেখতে মহারাজ নিজে এসেছেন। (ভোলা উদ্ধবের দিকে তাকায়।)
রাজা/মন্ত্রী : তাকিয়েছে—তাকিয়েছে—(উৎফুল্ল দেখায়।)
উদ্ধব : (ভোলাকে) দেখ, ইনি হলেন রাজামশাই। আর উনি হলেন মন্ত্রীমশাই (ভোলা অভিব্যক্তিহীন মুখে দু-পাশে দাঁড়ানো দুজনকে দেখে।)
রাজা : এবার কিছু জিজ্ঞাসা করা যাবে তো?
মন্ত্রী : নিশ্চই যাবে মহারাজ। তাকিয়েছে, দেখলেন না?
রাজা : আচ্ছা বলোতো—(আটকে যায়) কী যেন নাম?
উদ্ধব : আজ্ঞে ভোলা—
রাজা : হ্যাঁ, বলোতো ভোলা, বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো ধর্ম কী?
মন্ত্রী : কোন্ শাস্ত্র বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো?
রাজা : কোন্ জাতি বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ?
মন্ত্রী : বিশ্বে কোন্ বর্ণ শ্রেষ্ঠ?
রাজা : ম্লেচ্ছ কারা?
মন্ত্রী : অচ্ছুৎ কারা?
রাজা/মন্ত্রী : কেন ওরা ঘৃণ্য?
[এতক্ষণ রাজা ও মন্ত্রীর দিকে প্রতিটি প্রশ্ন করার সময় ভোলা তাকাচ্ছিল। শেযে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। ওকে ক্লান্ত ও নির্জীব দেখায়।]
রাজা : দাঁড়িয়েছে—দাঁড়িয়েছে-
মন্ত্রী : প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে - (সবাই আগ্রহে অপেক্ষা করে)
ভোলা : "ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে দয়াহীন সংসারে
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে', বলে গেল 'ভালোবাসো অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো'।
রাজা : এটা, এটা কি হল? উদ্ধব—(রেগে)
উদ্ধব : জা-জামাইবাবু-
রাজা : চুপ্!
উদ্ধব : মানে মহারাজ।
রাজা : এই বুঝি শিক্ষার হাল?
মন্ত্রী : বোঝেনিতো, কত ধানে কত চাল।
রাজা : তুমি শ্যালক বলেই আরও এক সপ্তাহ সময় দিলাম। তাতেও যদি সামান্য ফলটুকুও না

মেলে—পরমাত্মীয় বলে রেয়াত করব না বলে দিলাম।
(রেগে গুরুমশাইদের সামনে গিয়ে।) আপনারাও পার পাবেন না, (যেতে গিয়ে ফেরে।) সব কটার গর্দান নেব। শূলে চড়াব। আসুন মন্ত্রীমশাই—, (ভোলা বসে যায়।)
(রাজা, মন্ত্রী ও প্রহরী প্রস্থান করে)

উদ্ধব : (গুরুমশাইদের।) হল তো? জানতাম এমনটা যে হবে। পাঠশালাগুলোতেও এই করেন? মহারাজকে বলে কমিশন বসাব—

সমবেত : প্রাণটা থাকলে তবে তো?

উদ্ধব : যাতে প্রাণটা থাকে সে ব্যবস্থা করুন। আপনারা যান্ তো। ওই বিশ্রামকক্ষে বিশ্রাম করুন। একে আমি দেখছি। প্রয়োজনে ডেকে পাঠাব।
(গুরুমশাইরা চলে যায়। উদ্ধব ভোলার দিকে এগিয়ে যায়।)
এ্যাই হতচ্ছাড়া, পাজি-বদ্‌মাস। তোকে কী করে শায়েস্তা করতে হয় আমি জানি। তোকে আমি—(উদ্ধব কথা অসমাপ্ত রেখে অভিব্যক্তি পালটায়।

ভোলা : বাবা আমার। এইদিকে তাকা বাবা—, কী খাবি বলতো? মণ্ডা-মিঠাই? লুচি-হালুয়া? মিহিদানা-সন্দেশ? নাকি রাজভোগ-দরবেশ?

ভোলা : আমি কিছু চাই না।

উদ্ধব : এ্যাই তো কথা বলেছিস্। ভা-লো ছেলে। দাঁড়া (ছুটে বাইরে গিয়ে কিছু ছবি নিয়ে আসে। ভোলার পাশে মেঝেতে বসে।)

উদ্ধব : আয় ; আমরা ছবি দেখি—(ভোলা ধীরে তাকায়।) (একটা ছবি দেখায়।) এই ছবিটায় যাকে দেখছো, বলোতো কে? কোন্ ধর্মের?

ভোলা : এতো মানুষ।

উদ্ধব : দুর বোকা! এ হল হিন্দু। আর এটা? (ছবি দেখায়)

ভোলা : এওতো মানুষ।

উদ্ধব : হ্যাট্! এ হল যবন—

ভোলা : এরা আগে তো মানুষ! (উদ্ধব রেগেও সামলে নেয়।)

উদ্ধব : (প্রথম ছবি দেখিয়ে) এরা হল শ্রেষ্ঠ, (অপর ছবি।) আর এরা হল ম্লেচ্ছ!

ভোলা : "গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান!"

উদ্ধব : (রেগে উঠে দাঁড়ায়।) উফ্! ব্যাটা হাড়ে হাড়ে শয়তান।

ভোলা : রেগে যাচ্ছ কেন? এগুলোইতো শিখেছি। সত্য বলে জেনেছি।

উদ্ধব : ওসব ভুলে যা—ভুলে যা (অস্থির দেখায়।) না, তুই এমনিতে ঠিক হবি না। -প্রহরী (প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী : আজ্ঞা করুন।

উদ্ধব : গুরুমশাইদের বল- (অস্থির পায়চারি করে।)

প্রহরী : যথা আজ্ঞা-
(প্রহরী প্রস্থান করে। গুরুমশাইরা ঢোকে।)

উদ্ধব : এসে গেছেন! শুনুন, যতক্ষণ না এ, পথে আসছে, ততক্ষণ বিরামহীন ভাবে চালিয়ে যান। ছাড়বেন না। আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব আপনারা শুরু করুন। আমি এক্ষুনি আসছি।

সমবেত : আসুন, আমরা দেখছি!
(ওরা ভোলাকে আগের মতো ঘিরে দাঁড়ায়। সমস্বরে)
অস্যাং, কস্যাং, তস্যাং যস্যাং।
পশ্যাং, দৃশ্যাং শুষ্কং শয্যাং।
(লয় বাড়িয়ে ৬ বার ঘোরে। ৬ বারের পর ভোলা দাঁড়ায়।)

ভোলা : থামো থামো—আমি যে পারছি না, থামো—(কাঁপতে কাঁপতে নীচে বসে পড়ে। ওরা থমকে দাঁড়ায়।) উদ্ধব প্রবেশ করে।

উদ্ধব : কী হল? দাঁড়িয়ে কেন?

ভোলা : দোহাই তোমাদের, আমি যে আর পারছি না। এই বদ্ধগণ্ডিতে থেকে-থেকে আমার যে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে! বিশ্বাস করো। আমাকে বাইরে নিয়ে চলো! মাঠে, নদীর ধারে, খোলা আকাশের নীচে, সবুজ পাহাড়ে, পাখি আর প্রজাপতিদের মাঝখানে! ওখানে আমাকে নিয়ে চলো। এই বদ্ধ ঘরে আমি আর শ্বাস নিতে পারছি না। আমায় নিয়ে চলো (কাঁদে)।

উদ্ধব : আবার নাকি কান্না শুরু হয়েছে? ঢং! দাঁড়িয়ে দেখছেন কী, শুরু করুন।
(গুরুমশাইরা আগের মতো করে। ভোলার যন্ত্রণা বাড়ে। ওদের পরিক্রমণের মাঝখানে "আঃ" বলে ধীরে ধীরে ঢলে পড়ে। ও পড়ে গেলে সবাই থামে।)

সমবেত : মরে গেল নাকি? (উদ্ধব এগিয়ে আসে।) এখানে থাকা আর নিরাপদ কী?

উদ্ধব : এ্যাই, এ্যাই ভোলা! (গা ধরে ঝাঁকুনি দেয়। ভোলার সাড়া নেই। অবস্থা দেখে গুরুমশাইয়েরা চুপি চুপি পালায়।) ভোলা! এখন কী করি। রাজবদ্যিকে ডেকে আনি। (প্রস্থান)

ভোলা : লুন্ডা-১, লুন্ডা-২, লুন্ডা-৩, লুন্ডা-৪, লুন্ডা-৫ (সংখ্যাগুলো বলতে বলতে ক্রমে জড়িয়ে আসে। এমন সময় কাক ঢোকে। ভোলার কাছে গিয়ে ভোলার অবস্থা দেখে 'কা কা' করে ডাকতে ডাকতে মঞ্চে একপাক ঘোরার পর বাইরে যায়। সঙ্গে যন্ত্র অনুষঙ্গে চারদিক ভরে ওঠে। আলো শুধুমাত্র ভোলাকে ঘিরে ধরে। মাঝখানে নীরবতা আলোর পরিবর্তনের সময়। নীরবতা ভাঙে মিষ্টি বাঁশির সুরে। লালপেড়ে শাড়িপড়া প্রকৃতিকে দেখা যায় মায়ের বেশে। মায়াবী কণ্ঠে ডাকে—)

প্রকৃতি : ভোলা,—ভোলা—

ভোলা : কে? কে ডাকছ আমায়?

প্রকৃতি : আমি। দেখো তো, চিনতে পারো কিনা?

ভোলা : (ধীরে ধীরে তাকায়।) মা!

প্রকৃতি : হ্যাঁ, আমি মা। সব শিশু ভোলানাথদের মা। (ভোলার কাছে এসে পরম মমতায় ওর মাথা কোলে নিয়ে হাত বুলিয়ে দেয়।)

ভোলা : আঃ! কি ভালো লাগছে! জানো, ওরা আমাকে তোমার কোল থেকে ছিনিয়ে এনে আমাকে এখানে বন্দি করে রেখে, কীসব যেন শেখাতে চাইছিল।

প্রকৃতি : আমার ভোলাদের কি কেউ বন্দি করে রাখতে পারে? যদি এ চেষ্টা কেউ করে, তবে আগল ভেঙে বেরিয়ে আসবি। ওরে সবুজ, ওরে আমার কাঁচা। আধমরাদের তো তোর মতো ক্ষ্যাপা ভোলারাই ঘা মেরে মেরে বাঁচিয়ে তুলবে।
(আস্তে আস্তে প্রকৃতি দাঁড়ায়)

তোরা রুখে দাঁড়া। মাথা তোল। অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে এক হয়ে দাঁড়া। কোনো কিছু জোর করে চাপিয়ে দিতে চাইলে ঝেড়ে ফেলে দিবি। উঠে দাঁড়া ; শক্ত হয়ে দাঁড়া। কোমর সোজা করে দাঁড়া। ভাঙ, আগল ভাঙ।

(সংলাপগুলো বলতে বলতে প্রকৃতি পিছিয়ে যাবে ক্রমে ক্রমে। অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে। কথাগুলোর সঙ্গে সেতারের ঝংকার থাকলে ভালো। কথা শেষ হলে ভোলা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। সেতারের জায়গায় তবলার র‍্যালি শোনা যাবে।)

(ভোলা সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তবলা থামে। পাখির ডাক শোনা যাবে। ভোরের আলো ওর মুখে।)

ভোলা : আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান।
না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।

(ভোলার চোখে-মুখে প্রতিজ্ঞা। "ভাঙ ভাঙ" বলে দু-হাতে হাতুড়ি মারার ভঙ্গিতে গণ্ডি ভাঙে। গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসে। বলতে থাকে)

আমি ঢালিব করুণা ধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণ কারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।
(ভোলা এবার দু-হাত দু-পাশে ছড়িয়ে ঘুরে ঘুরে)
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল গেয়ে কল কল তালে তালে দিব তালি।
ওরে চারিদিকে মোর
একী কারাগার ঘোর
ভাঙ ভাঙ ভাঙ কারা, আঘাতে আঘাত কর
ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখি,
এসেছে রবির কর। (বাক্সে উঠে দাঁড়ায়)

(হ্যান্ড স্পটে ভোরের আলো ওর সারা শরীরে। ভোলার আবাহনের ভঙ্গি। পেছনে সমস্ত অভিনেতা লাইন করে ঢোকে। সমবেত কণ্ঠে গায়।)

গান : তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়,
সেই ভয়ের টুঁটিই ধরব টিপে করব তারে লয়,
মোরা আপনি মরে মরার দেশে আনব বরাভয়
মোরা পরে ফাঁসি আনব হাসি মৃত্যু-জয়ের ফল।
শিকল-পরা ছল মোদের এই
শিকল-পরা ছল।

(ভোলাকে মাঝে রেখে বাকিরা শপথদৃপ্ত মুষ্টিবদ্ধ হাত উর্ধ্বে তুলে ধরে।)

যবনিকা

বিজ্ঞানীদের ঘুড়ি

শ্যামল চক্রবর্তী

মাঠে-ময়দানে, শহরের উঁচু বাড়ির ছাদ থেকে ছোটোবড়ো সবাই রং বেরঙের অনেক ঘুড়ি ওড়ায়।

বাড়িতে বড়োরা যখন বলেন যে রোদ বড্ড বেশি, ঘুড়ি ওড়াতে যাস না, নিজেদের ছোটোবেলায় কথা কি তাঁদের মনে পড়ে না?

দেশি-বিদেশি কতরকমের ঘুড়ি। কোনো কোনো দেশের ঘুড়ির আবার খুব নামডাক। যেমন জাপানের ঘুড়ি।

সারাবছরই তো আকাশে নানারকমের ঘুড়ি দেখা যায়। কখনও কম, কখনও বেশি। আনন্দ আর উৎসবের দিনে আকাশ ঘুড়িতে ছেয়ে যায়। একটু আগে জাপানের কথা বলছিলাম। ওদেশের 'ঘুড়ি উৎসব' খুবই বিখ্যাত। বিশ্বকর্মা পুজোর সময় কলকাতার আকাশে তো ঘুড়ি ছাড়া কিছুই দেখা যায় না।

আমরা সবাই আনন্দ পেতে ঘুড়ি ওড়াই। অন্যের ঘুড়ি কাটতে পারলে মন খুশিতে ভরে ওঠে। তবে বিজ্ঞানের গবেষণায় কেউ কেউ ঘুড়ি ওড়ান, কথাটা শুনলে প্রথমে আমাদের বেশ অবাকই লাগে।

যত অবাকই লাগুক কথাটা সত্যি। ১৮২০ সাল। জর্জ পোকক নামে একজন ইংরেজ স্কুলমাস্টার প্রথম ঘুড়ি নিয়ে গবেষণার কাজ শুরু করেন। ব্রিস্টল শহরের কাছাকাছি এক মফস্বল এলাকায় তিনি থাকতেন। আমরা

ছোটোবেলা থেকেই গোরু, ঘোড়া, মোষ উট এমনকি কুকুরদেরও গাড়ি টেনে নিয়ে যাওয়ার কথা জানি। বরফের দেশে কুকুরেরা স্লেজগাড়ি টেনে নিয়ে যায়। জর্জের মাথায় বুদ্ধি এল তিনি ঘুড়ি দিয়ে গাড়ি টানবেন।

তোমরা বলতে পার, জর্জ পোককের আগে যে আর কেউ ঘুড়ি নিয়ে গবেষণা করেননি, আমরা জানলুম কেমন করে?

না, জানি না। কেউ যদি না লিখে যান বা না বলে যান, আমরা জানব কেমন করে? জর্জ পোকক-ই প্রথম তাঁর কাজের কথা নিয়ে বই লিখেছেন। পুরোনো আমলে সবাই লম্বা লম্বা নাম দিয়ে বই লিখতেন। জর্জের বইয়ের নামও বেশ লম্বা। দি এয়ারোপ্লুয়েস্টিক আর্ট অর নেভিগেশন ইন দ্য এয়ার, বাই দ্য ইয়ুজ অফ কাইট্স্ অর বয়্যান্ট সেইল্স্।

ছবিটা দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে। দুখানা ঘুড়ি গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে। উপরের ঘুড়িটা ছোটো। নীচের ঘুড়িটা বড়ো। উপরের ঘুড়ির সাইজ বারো ফুট। নীচের ঘুড়ির সাইজ পনেরো ফুট।

নানারকমের জিনিস দিয়ে ঘুড়ি তৈরি হয়। কাগজের ঘুড়ি ও পলিথিনের ঘুড়ি আমরা পাড়ার ছোটোখাটো দোকানে দেখতে পাই। বড়ো দোকানে বা শোরুমে নাইলনের ঘুড়ি ও প্লাস্টিকের ঘুড়ি পাওয়া যায়। কাগজের ঘুড়ির চেয়ে এই সব ঘুড়ি অনেক হালকা অথচ টেকসই। কাগজের ঘুড়িতে কয়েক ফোঁটা জল পড়লে কী দশা হয় তোমরা জান। অন্য ঘুড়িতে জল পড়লে কিছু হয় না।

২০০৩ সালে আমরা উড়ানের একশো বছর পালন করেছি। উইলবুর রাইট আর অরভিল রাইট নামের দুই ভাই ১৯০৩ সালে প্রথম আকাশে উড়তে পেরেছিলেন। মাত্র বারো সেকেন্ড ওঁরা আকাশে ছিলেন। তোমরা যখন এই দুই ভাইয়ের জীবনকথা পড়বে, দেখবে, শুরুতে ওঁরা বড়ো বড়ো ঘুড়ি তৈরি করে আকাশে ওড়াবার চেষ্টা করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে শত্রুপক্ষের মিলিটারিদের গোপন আস্তানা খুঁজতে ঘুড়ি চড়ে অনেকে আকাশে উড়তে চাইতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান সেনারা সাবমেরিনের সঙ্গে ঘুড়ি বেঁধে সমুদ্রে শত্রুর খোঁজ করতেন। জার্মানদের ওই সব ঘুড়ির একটা নাম ছিল, অটোজাইরো ঘুড়ি। হেলিকপটারের পুরোনো নাম অটোজাইরো। এখন অবিশ্যি এই নামে কেউ ডাকে না। নাই বা ডাকুক, পুরোনো নাম কি মিথ্যে হয়ে যায়?

১৯৫০-এর দশকে ঘুড়ি নিয়ে একটা হইচই পড়ে গেল। কেন? অস্ট্রেলিয়ায় বিল বেন্নেট ও তাঁর বন্ধুরা নৌকোয় টানা ঘুড়ি তৈরি করেছেন। নৌকো চলবে। মানুষ নিয়ে ঘুড়িটাও দিব্যি এগোবে। কিছুদিন পর ঘুড়ির ওয়াটারস্কি চালু হল। তবে এই ঘুড়িগুলোর গড়ন সাদামাটা নয়। এদের পাখনা লাগানো থাকে। একই সময়ে আমেরিকায় নাসা-র বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস রোজাল্লো অস্ট্রেলিয়দের মতোই ঘুড়ি তৈরি করেন।

কোনো একটা জায়গায় হাওয়া কেমন জানতে চাইলে ঘুড়ি নিয়ে গবেষণা খুব কাজের হয়। হাওয়ার গতি কেমন, উপরের দিকে হাওয়া কতটা কী বদলাচ্ছে, এসব ভালোভাবেই জানা যায়।

আমরা যত উপরে যাই, হাওয়া ভারী থেকে হালকা হয়। তবে হাওয়ার গতি একটু একটু করে বাড়ে। গতি বেশি হয় বলেই উপরে শক্তির পরিমাণও বাড়তে থাকে। দশ কিলোমিটার পর্যন্ত উপরে উঠলে ছবিটা এমন থাকে। বিজ্ঞানী গুস্তাভসনের কথা বলছি। আমেরিকার বিখ্যাত লরেন্স লিভারমুর ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে তিনি কাজ করতেন। দু'জায়গার শক্তি মেপেছিলেন গুস্তাভসন। আমাদের যেখানে ঘরবাড়ি সেই পৃথিবীর বুকে হাওয়ার মোট শক্তির সঙ্গে দশ কিলোমিটার উপরে হাওয়ার মোট শক্তির তুলনা করেছিলেন। ফলাফল দেখে অবাক হয়ে যান তিনি। আমরা সারা পৃথিবীতে মোট যে পরিমাণ শক্তি খরচ করি, দশ কিলোমিটার উপরে

তার চেয়ে কুড়ি গুণ বেশি শক্তি রয়েছে। শক্তির কোনো অভাব নেই। জরুরি কথা হল সেই শক্তি আমরা কাজে লাগাব কেমন করে?

হাওয়া বন্দী করার জন্য চাই হাওয়া কল। পৃথিবীর অনেক দেশে উঁচু উঁচু স্তম্ভের উপরে হাওয়া কল লাগানো থাকে। এক একটা হাওয়া কল এক একরকম হাওয়ার গতিতে কাজ করে। হাওয়ার গতি আগে না জেনে আমরা হাওয়া কলের নমুনা ঠিক করতে পারব না। আমরা আগেই বলেছি, ঘুড়ি দিয়ে হাওয়ার গতি কেমন বুঝে নিতে হয়।

একটা হাওয়া কল এক মেগাওয়াটের কাছাকাছি শক্তি তৈরি করতে পারে। জোর হাওয়া থাকলে এক মেগাওয়াট ছাড়িয়ে যায়। সমুদ্রের ধারে হাওয়া কল বসালে সুবিধে হয়। আমাদের দেশে এমন হাওয়া কল আছে। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া শহরে কয়েকশো মাইল জায়গা জুড়ে এক হাজারের বেশি হাওয়া কল রয়েছে। এক হাজার মেগাওয়াটের মতো শক্তি আমরা এই হাওয়া কলগুলো থেকে পাই।

আবহাওয়া বিভাগ হাওয়ার রকম-সকম বুঝতে উঁচু জায়গায় অ্যানিমোমিটার নামের এক যন্ত্র বসায়। এই যন্ত্র পাকাপাকি ভাবেই বসানো থাকে। যন্ত্র থেকে হাওয়ার গতি কোন্‌দিকে ও কত জানা যায়।

হাওয়া কল বা আবহাওয়া বিভাগের যন্ত্র একটা কাজ করতে পারে না। উচ্চতা কম-বেশি হলে হাওয়া কেমন বদলায় তা মাপতে পারে না। এখানে ঘুড়ি ছাড়া উপায় নেই।

তোমরা ডু পন্ট কারখানার নাম শুনেছ কি? বহুজাতিক কারখানা। নানারকমের জিনিস তৈরি করে। এরা একরকমের প্লাস্টিক বানায় যা দিয়ে টালা (TALA) ঘুড়ি তৈরি হয়। এই ঘুড়ির আয়ু অনেক। ঝড়-জলে কিছু হয় না। ঘুড়ি যখন আকাশে থাকে, মাটিতে দাঁড়িয়েই হাওয়ার দিক ও গতি মাপা যায়। তোমরা ভাবছ এ বড়োদের কাজ। তা নয় কিন্তু। আমেরিকার একটা কোম্পানি ক্লাস টেনের ছাত্রদের দিয়ে নানা জায়গায় হাওয়ার গতির মান কত ও হাওয়া কোন্‌দিকে মাপিয়েছিল। কথাটা বলতে গেলে আমাদের আইজাক নিউটনের কথা মনে পড়ে। মাঠে গরু চরাতে নিয়ে গিয়েছেন ছোটোবেলায়। ঝড় উঠেছে। যে যার মতো পড়িমরি করে দৌড়ে বাড়ি ফিরছে। নিউটন একবার হাওয়ার দিকে লাফাচ্ছেন, একবার হওয়ার উল্টোদিকে লাফাচ্ছেন। হাওয়ার জোর কেমন, হাওয়া কতটা বাধা দেয়, এসব জানবেন। বড়োরা অনেকে বলেছেন, সেসময় ছেলেটা কি পাগল হয়ে গেল?

টালা ঘুড়ির কদর ভীষণ। পৃথিবীর সব দেশেই আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা এই ঘুড়ি কাজে লাগান। কোথাও হাওয়া কল বসাতে চাইলে ঠিক হবে, কি ভুল হবে, তা টালা ঘুড়ি দিয়ে যাচাই করে নেওয়া হয়।

উনিশশো সালের গোড়ায় যেসব ঘুড়ি ছিল, এদের চার কিলোমিটারের বেশি উঁচুতে নিয়ে যাওয়া যেত না। ঘুড়িগুলো টেঁকসই ছিল না। হাওয়ায় বিগড়ে যেত। এখনকার ঘুড়ি দশ কিলোমিটার উঁচুতেও দিব্যি থাকে।

অস্ট্রেলিয়ায় অনেক বিজ্ঞানী ঘুড়ি নিয়ে গবেষণা করেন। এমন ঘুড়ি বানিয়েছেন এঁরা যাদের একটু দূর থেকে দেখলে হেলিকপটার মনে হয়। হাওয়া কল যেমন ছোটোখাটো মেশিন চালাতে পারে, ঘুড়িও তাই। ঘুড়ি উপরে উঠে হাওয়া থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারে। সেই বিদ্যুৎ পরিবাহী তার দিয়ে নীচে নামে। তখন তাকে ইচ্ছেমতো কাজে লাগানো হয়।

পাখনাওয়ালা ঘুড়িতে যেমন সুবিধে আছে, অসুবিধেও রয়েছে। উপরে তুলতে গেলে খেয়াল রাখতে হয়। নীচে নামাতে গেলেও খেয়াল রাখতে হয়। বেলুনের বেলায় অসুবিধে অন্যরকমের। ওর ভেতরে হিলিয়াম গ্যাস থাকে একটু একটু করে গ্যাস বেরোয়। আবার তখন গ্যাস ভর্তি করতে হয়। আট কিলোমিটারের বেশি উঁচুতে বেলুন নিয়ে যাওয়া যায় না।

ঘুড়ির নিত্য নূতন নমুনা আমরা দেখতে পাচ্ছি। কেভলার আর গ্রাফাইট মিলিয়েও ঘুড়ি তৈরি হয়েছে। এই ঘুড়ি তেরো মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারে। বিজ্ঞানীরা এখন কুড়ি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরির ঘুড়ি বানানো যায় কি না দেখছেন। শক্তি এই পৃথিবীতে একটু একটু করে ফুরিয়ে আসছে। আমরা কয়লা আর তেলের কথা বলছি। বিজ্ঞানীরা তাই সৌরশক্তি আর হাওয়াশক্তির উপর জোর দিচ্ছেন।

হাওয়ার গতি ফুরোবে না। ঘুড়িও যত খুশি তৈরি করা যাবে। একদিন এমন আসতেই পারে যখন দেখব পৃথিবীর নানা দেশে বড়ো বড়ো ঘুড়ি থেকে হাজার হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। কলকারখানা ওই বিদ্যুতেই চলছে। পথঘাট, স্কুল-কলেজ, হাট-বাজার আলোকিত হচ্ছে। এখন বিদ্যুৎ তৈরির কেন্দ্রগুলোকে পরিবেশ দূষণের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। ঘুড়ি থেকে বিদ্যুৎ পেলে পরিবেশ একটুও দূষিত হবে না। প্রতি একক বিদ্যুৎ তৈরির খরচ এখনকার মতোই হবে।

খরচের বিচারে সৌরবিদ্যুতের চেয়ে হাওয়াবিদ্যুৎ ভালো। আজকাল জোর কদমে এই গবেষণা চলছে। সাধারণ গবেষণাগারে যেমন কাজ হচ্ছে, মিলিটারিদের গবেষণাগারেও প্রচুর কাজ হচ্ছে। সামরিক গবেষণার ক্ষেত্রে টাকা-পয়সা অনেক বেশি। গাদাগুচ্ছের বন্দুক-কামান ও বোমা না বানিয়ে যদি এই গবেষণা হয় তবে মানুষের উপকার হয়। বড়ো বড়ো দেশের সরকার কী কথাটা ভেবে দেখবেন?

সবশেষে একটা মজার কথা বলে এই লেখা শেষ করব। আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের নাম তোমরা সবাই জান। অত বড়ো মাপের আবিষ্কর্তা পৃথিবীতে মাত্র অল্প ক'জন রয়েছেন। টেলিফোন দেখলেই তাঁর কথা মনে পড়ে। তিনিই টেলিফোনের সবসেরা 'A T & T' কোম্পানি তেরি করেন। তাঁর নামে আমেরিকায় জগৎবিখ্যাত 'বেল ল্যাবরেটরি' গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর সবসেরা বিজ্ঞান জার্নাল বলতে আমরা 'নেচার' আর 'সায়েন্স'-এর নাম বলি। 'সায়েন্স' জার্নালের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল।

বেলের জীবনকথা হল মজার কথা বলা হল কই। বেল ছিলেন একজন ঘুড়ি-পাগল লোক। তিনি নিজে নানারকমের প্রচুর ঘুড়ি তৈরি করেছেন। আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে ১৯০৪ সালে মিসৌরিতে এক ঘুড়ির মেলা বসেছিল। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে অনেকেই ঘুড়ি নিয়ে গিয়েছেন। গ্রাহাম বেল ছিলেন তাঁদের একজন। অনেক রকমের ঘুড়ি সাজিয়ে বসে রয়েছেন সবাই। ছবিতে দেখছি আমরা, গ্রাহাম বেল নিজে তাঁর দোকানের সামনে বসে রয়েছেন। ভাবতে আমাদের কেমন লাগে।
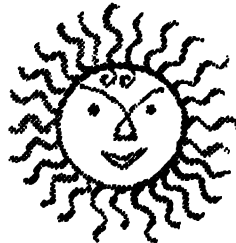
টরে টক্কা

পীযূষকান্তি পাল
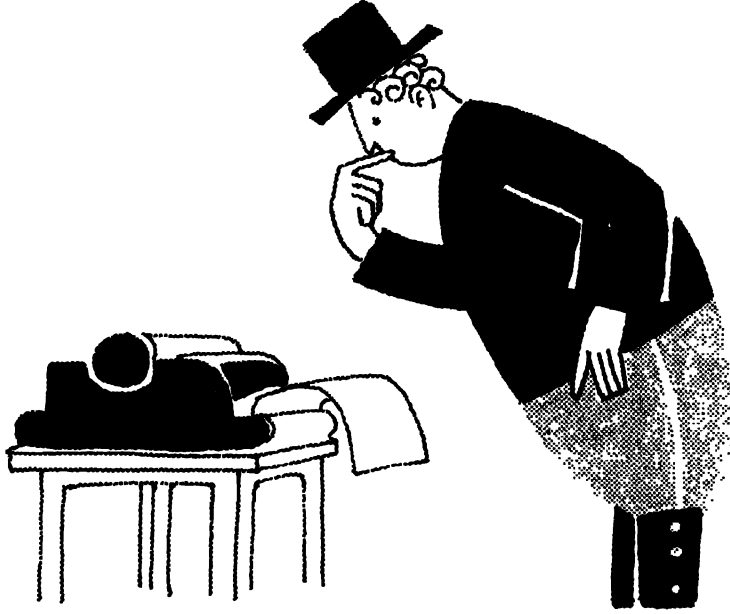
টেলিগ্রাফের অর্থ হল দূর-লিখন। বিজ্ঞানী ওয়রস্টেড প্রথম আবিষ্কার করেন যে তড়িতের গতিবেগ খুব দ্রুত এবং এজন্য তা দ্রুত সংবাদ পাঠানোর কাজে ব্যবহার করা যায়, পরে তিনি আবিষ্কার করেন যে, একটি তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ পাঠালে তার নিকটস্থ চুম্বক স্থানচ্যুত হয়। এ সত্যকে ধরে নিয়ে বিজ্ঞানী কুক এবং হুইটস্টোন টেলিগ্রাফ প্রবর্তন করেন। ১৮২০ সালে বিজ্ঞানী গকস পাঁচটি অক্ষরের জন্য পাঁচটি চুম্বক এবং পাঁচটি চুম্বকের জন্য পাঁচটি তার ব্যবহার করে টেলিগ্রাফ তৈরি করেন।

বর্তমানের টেলিগ্রাফের আবিষ্কর্তা হলেন বিজ্ঞানী স্যামুয়েল কিনলে ব্রীজ মর্স। ১৮০২ সালে জাহাজের মধ্যে ভ্রমণরত অবস্থায় তিনি প্রথম তারযন্ত্র বা টেলিগ্রাফের কথা শুনে টেলিগ্রাফের উন্নয়নে গবেষণা শুরু করেন। বিজ্ঞানী ব্রীজ মর্স এবং তাঁর সহযোগী মিলে কয়েকমাসের চেষ্টায় আধমাইল লম্বা তারের সংযোগ করতে পারলেন ল্যাবরেটরির মধ্যেই। ধীরে ধীরে প্রাচীন টেলিগ্রাফের উন্নতি ঘটতে লাগল এবং একটিমাত্র তারের মধ্য দিয়ে। সমস্ত সংবাদ গ্রহণ এবং পাঠানো যেত। ১৮৩৫ সালেই বিজ্ঞানী ব্রীজ মর্স ও তার সহযোগী আধমাইল দূরত্বে সংবাদ আদানপ্রদান করে তাঁদের উন্নত টেলিগ্রাফ যন্ত্র প্রমাণ করেন। এজন্য তিনি ১৮৩৭ সালে একটি নতুন সঙ্কেত বা কোড আবিষ্কার করেন।

প্রেরক যন্ত্রের বোতাম টিপে তড়িৎ-প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয় আর গ্রাহক যন্ত্রে তড়িৎ প্রবাহের স্থায়িত্বকাল অনুসারে টরে এবং টক্কা অর্থাৎ Dot and Dash দু-রকম শব্দ হয়। এই টরে এবং টক্কা নানাভাবে সাজিয়ে ইংরেজির ২৬টি অক্ষর এবং শূন্য থেকে ৯ অব্দি সংখ্যাগুলি অক্ষরে সংকেত স্থির করা হয়। এর নাম দেওয়া হয় মর্স-কোড। এই কোডের সাহায্যে টেলিগ্রাফে সংবাদ আদানপ্রদান শুরু হয়। দেশে দেশে টেলিগ্রাফের লাইন বসতে শুরু করে টেলিগ্রাফের খুটির সাহায্যে। ভারতবর্ষে প্রথম টেলিগ্রাফের লাইন স্থাপনের কৃতিত্বে আছেন কলকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডা. গৌগণেগীর। তাঁর চেষ্টায় ১৮৩৯ সালে কলকাতা থেকে ডায়মন্ডহারবার পর্যন্ত (২১ মাইল) প্রথম টেলিগ্রাফ—লাইন স্থাপিত হয়।

লেখক পরিচিতি

স্মৃতিকথা

বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য ঃ ত্রিপুরার শেষ মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর সাহিত্য সংস্কৃতির একজন বড়ো পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু তখন তিনি নাবালক থাকায় তাঁর পক্ষে শাসন পরিচালনার জন্যে একটি শাসন পরিষদ গঠিত হয়েছিল। ১৯২৮ সালে তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়। তাঁর আমলে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় 'শ্রীরাজমালা' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বীরবিক্রম নিজেও ছিলেন একজন কবি। তিনি হোলি বিষয়ক একটি সঙ্গীত-গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এছাড়াও তাঁর লেখা সোনামুড়া ও উদয়পুর বিভাগ পরিভ্রমণ ডায়েরি সমাদৃত হয়।

শচীন দেববর্মণ ঃ জন্ম ১৯০৬। মৃত্যু ১৯৭৫। সঙ্গীত শিল্পী, সুরকার ও চলচ্চিত্রের সঙ্গীত পরিচালক। প্রথম জীবনে ত্রিপুরার রাজদরবারে উচ্চপদে চাকরি করতেন। কলকাতা চলে আসার পর ওস্তাদ বদল খাঁ, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণচন্দ্র দে-র সান্নিধ্যে প্রশিক্ষণে তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা বিকশিত হয়। ধীরে ধীরে তিনি জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে যান। অজস্র রেকর্ড প্রকাশিত হয়। সঙ্গীত-নাটক আকাডেমি ও এশিয়ান ফিল্ম সোসাইটি (লন্ডন) তাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিত করে। ভারত সরকার দেয় পদ্মশ্রী উপাধি।

শান্তিদেব ঘোষ ঃ জন্ম ১৯১০। মৃত্যু ১৯৯৯। সুখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী। শান্তিনিকেতনে তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষা। আমৃত্যু ছিলেন শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা। কবিগুরুর আগ্রহে নানা দেশের নানা ঘরানার নৃত্যকলা শিখে ছিলেন। তিনি শুধু নৃত্য-সংগঠক ছিলেন না, ছিলেন গুণী নৃত্যশিল্পীও। বিশ্বভারতী তাঁকে দিয়েছে দেশিকোত্তম উপাধি। বর্ধমান ও রবীন্দ্রভারতী ডি.লিট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছে। রচিত গ্রন্থ—জীবনের ধ্রুবতারা, রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা, রূপকার নন্দলাল প্রভৃতি।

বিশেষ রচনা

সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মণ ঃ মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের পুত্র। ত্রিপুরায় বাংলা গদ্যের বিকাশে তাঁর অবদান স্মরণীয়। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—'আগ্রার চিঠি', 'ত্রিপুরার স্মৃতি', 'ভারতীয় স্মৃতি, 'জেবুন্নিসা বেগম' প্রভৃতি।

কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত ঃ জন্ম ১৮৬২ সাল। মৃত্যু ১৯৩৪। রাজন্যযুগে ত্রিপুরায় উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। তাঁর ছিল প্রশ্নাতীত পাণ্ডিত্য। 'শ্রীরাজমালা' গ্রন্থ সম্পাদনা তাঁর অক্ষয় কীর্তি। এছাড়াও সে যুগে রাজধানী আগরতলার 'রবি' পত্রিকাসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত তাঁর মূল্যবান রচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ ঃ জন্ম ১৯১৪। মৃত্যু ১৯৫১। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটির জন্য বাংলা সাহিত্যে তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। গল্প-উপন্যাসের অন্যান্য গ্রন্থ—সাদা হাওয়া, রাঙামাটি, সাগরতীর্থে, নাটকীয় কাহিনি ও দল বেঁধে। শিশুপাঠ্য কবিতাও লিখেছেন। কলকাতায় এসে 'ত্রিপুরা' পত্রিকায় কর্মজীবনের শুরু। পরবর্তীকালে নবশক্তি, দেশ, নবযুগ, আজাদ, কৃষক প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে কর্মসূত্রে যুক্ত ছিলেন। মাত্র ৩৭ বছর বয়সে যক্ষায় আক্রান্ত হয়ে অকালে প্রয়াত হন।

ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা ঃ জন্ম ১৯০১। মৃত্যু ১৯৯৫। ত্রিপুরার সম্মানিত উজির পরিবারে জন্ম। চিত্রশিল্পী হিসাবে সুখ্যাত। শান্তিনিকেতনে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর কাছে শিল্প-শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মালয়, সিঙ্গাপুর, জাভা ও বালিদ্বীপ ভ্রমণ করেছেন। ১৯৫১ তে কলাভবনে যোগ দেন। ১৯৫৪ তে অধ্যক্ষ পদে আসীন হন। সরকারি আমন্ত্রণে বহু দেশ ঘুরেছেন। চিত্রকলার স্বীকৃতি স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিয়েছেন অবনীন্দ্র পুরস্কার। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত করে।

নারায়ণ চৌধুরী ঃ জন্ম ১৯১২। মৃত্যু ১৯৯১। সাহিত্য ও সঙ্গীত-বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা পঞ্চাশের বেশি। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি—বাংলার সাহিত্য, বাংলার সংস্কৃতি, আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন, সঙ্গীত পরিক্রমা, নজরুলের গান, বাঙালির গীতচর্চা প্রভৃতি। শিশির পুরস্কার, নজরুল পুরস্কার ও বিদ্যাসাগর পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের উপদেষ্টা ছিলেন।

জীবনকথা

ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ঃ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। এক সময় আগরতলার ঐতিহ্যমণ্ডিত উমাকান্ত একাডেমির প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ছয় দশকের অধিককাল আগে প্রকাশিত তাঁর রাজমালা গ্রন্থটি আজও ত্রিপুরার পাঠকদের কাছে সমান সমাদৃত।

পুরঞ্জনপ্রসাদ চক্রবর্তী ঃ জন্ম ১৯৩৪। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সচিব। নিয়মিত শিশুসাহিত্য রচনা করেন। ছোটোদের জন্য কয়েকটি জীবনীমূলক গ্রন্থও রচনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—অমৃতরসিক শ্রীরামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রস্মৃতিধন্য ত্রিপুরা, ত্রিপুরার রাজমালা, মজাদার মানুষ শরৎচন্দ্র, কর্মযোগী বিবেকানন্দ প্রভৃতি।

গল্প

সাগরময় ঘোষ ঃ জন্ম ১৯১২। মৃত্যু ১৯৯৯। দেশ পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় দীর্ঘকাল প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—সম্পাদকের বৈঠক, ঝরাপাতার ঝাঁপি, একটি পেরেকের কাহিনি, দণ্ডকারণ্যের বাঘ। সম্পাদিত গ্রন্থ—শতবর্ষের শতগল্প। ভালো গান গাইতেন। অভিনয় ও আবৃত্তিতে দক্ষ ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মারক, আনন্দ পুরস্কার ও বিশ্বভারতীর দেশিকোত্তম সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

শ্যামল ভট্টাচার্য্য ঃ জন্ম ১৯৬৪। মূলত গল্পকার। বহু পাঞ্জাবী গল্পের অনুবাদ করেছেন। নিয়মিত বড়োদের ও ছোটোদের জন্য গল্প লেখেন। উল্লেখযোগ্য বই—'বুখারী।'

সুবীর ভট্টাচার্য ঃ মূলত কথাসাহিত্যের চর্চা করেন। বড়োদের জন্য নিয়মিত লেখেন। মাঝেমধ্যে ছোটোদের জন্যও লিখে থাকেন।

দীপালিকা দাস ঃ জন্ম ১৯৭৭। পত্র-পত্রিকায় বহু গল্প প্রকাশিত হয়েছে। ছোটোদের জন্যেও নিয়মিত লেখেন।

দীপক দেব ঃ জন্ম ১৯৫৫। মূলত গল্পচর্চা করেন। বড়োদের জন্য যেমন লেখেন, তেমনি ছোটোদের জন্যও প্রচুর লিখেছেন। আশির দশক থেকে লেখালেখির শুরু। প্রকাশিত গ্রন্থ—কামারশালা (গল্প সংগ্রহ), সালোকসংশ্লেষ (গল্প সংগ্রহ), রক্ত মাংসের শরীর (উপন্যাস), পরিত্যক্ত প্রদেশ (উপন্যাস), পারিজাত পুষ্পবৃক্ষ (উপন্যাস) ও বিজু—১ (উপন্যাস)।

অলক দাশগুপ্ত ঃ জন্ম ১৯৬৬। কবি ও গল্পকার। কবিতা ও গল্পের পাশাপাশি নিয়মিত ছবি আঁকেন। ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস ও উপকথা নিয়ে তার কমিক্সের বই 'রায় কছাগ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুজয় রায় ঃ জন্ম ১৯৪৮। বড়োদের জন্য শুধু নয়, ছোটোদের জন্যও নিয়মিত লিখে থাকেন। প্রকাশিত গ্রন্থ—এই জীবন এইদাহ (গল্প সংকলন) শরীর জমিন (গল্প সংকলন), দূরের কুয়াশা (উপন্যাস), বধ্যভূমি প্রভৃতি। ত্রিপুরা সরকারের 'তথ্যসংস্কৃতি পর্যটন দপ্তরে সহ-অধিকর্তা পদে কর্মরত।

মীনাক্ষী সেন ঃ জন্ম ১৯৫৪। মূলত গল্প লেখেন। উল্লেখযোগ্য বই, 'জেলের ভেতর জেল'।

শংকর বসু ঃ জন্ম ১৯৪৩। ছাত্রজীবন থেকেই কবিতা ও গল্প লেখার শুরু। প্রকাশিত গ্রন্থ—ফিরে এসো খেলাঘরে। অবসরপ্রাপ্ত কলেজ-শিক্ষক।

নিলিপ পোদ্দার ঃ জন্ম ১৯৪৭। ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্যচর্চার শুরু। 'পৌলমী' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক। কয়েকটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। পেশায় সরকারি চাকুরে।

সুধীর সরকার ঃ জন্ম ১৯৫৪। রম্যরচনা লিখে পাঠকসমাজে সমাদৃত হয়েছেন। ছোটোদের জন্যও নিয়মিত লেখেন। প্রকাশিত গ্রন্থ—অবোধবেলা (কবিতা), ব্যায়ামবিলাস ও অন্যান্য গল্পকথা। পেশায় দূরসঞ্চার নিগমের কর্মী।

নকুল রায় ঃ জন্ম ১৯৫০। কবি, গল্পকার। ছোটোদের জন্যেও নিয়মিত লেখেন। জাগরণ, গণসংবাদ, পত্রিকার ছোটোদের পাতা দীর্ঘদিন পরিচালনা করেছেন। বেশ কয়েকটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে।

দেবযানী বিশ্বাস ঃ জন্ম ১৯৬৪। ছোটোদের জন্য নিয়মিত গল্প লেখেন। বহু গল্প ছোটো বড়ো পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ছোটোদের জন্যও গল্প লেখেন।

হরিহর দেবনাথ ঃ মূলত ছোটোদের জন্য লেখেন সাময়িকীসহ সংবাদপত্রের ছোটোদের পাতায় নিয়মিত তাঁর গল্প প্রকাশিত হয়।

সন্তোষ রায় ঃ জন্ম ১৯৫১। কবি, গল্পকার। সম্পাদনা করছেন 'জলজ' পত্রিকা। ছোটোদের জন্যেও নিয়মিত গল্প লেখেন।

দেবব্রত দেব : ১৯৫৬। মূলত গল্পকার। গল্প—পত্রিকা 'মুখাবয়বের' সম্পাদক। ছোটোদের জন্যেও নিয়মিত গল্প লেখেন।

জয়া গোয়ালা : ত্রিপুরার বিশিষ্ট গল্পকার। ছোটোদের জন্য লিখে থাকেন। প্রকাশিত গ্রন্থ—ছড়া জলের ছবি, গল্পগুচ্ছ, অন্য মানুষ, ভিন্ন রং, ২০০৪ সালে 'অন্য মানুষ ভিন্ন রং' উপন্যাসের জন্য 'সলিলকৃষ্ণ দেববর্মণ স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

বিমল চৌধুরী : জন্ম ১৯২৩, মৃত্যু ২০০১। প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ—মানুষের চন্দ্রবিজয় ও তারানাথ, ভগীরথের তালা, নায়কের জন্ম প্রভৃতি। ১৯৯৮ সালে ত্রিপুরা সরকার তাঁকে রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত করেন।

কিশোররঞ্জন দে : জন্ম ১৯৫৩। কবি ও গল্পকার। মূলত কবিতা লিখলেও বড়োদের ও ছোটোদের জন্যে গল্প লিখে থাকেন। উল্লেখযোগ্য কবিতার বই 'কবিকে পাথর ছুঁড়ে মারো।'

চন্দন আচার্য : সাম্প্রতিককালে ত্রিপুরায় ছোটোদের জন্য নিয়মিত লিখছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত তাঁর গল্প প্রকাশিত হচ্ছে। ছোটোদের জন্য তাঁর গল্প গ্রন্থ 'ঘুড়ি' পাঠকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

সুবিমল রায় : জন্ম ১৯৩৬। স্কুল এবং কলেজজীবন থেকেই লেখার সূত্রপাত। প্রকাশিত গ্রন্থ—বিবর্ণ আবির, আত্মজ, যাত্রী, রবীন্দ্র সঙ্গীতের চর্চা (প্রবন্ধ) প্রভৃতি। কর্মসূত্রে ত্রিপুরা সরকারের শিল্প দপ্তরের সহ-অধিকর্তা ছিলেন।

সুমন ভট্টাচার্য : জন্ম ১৯৬৯। ছোটোদের জন্যে গল্প ও কবিতা লেখেন। অনুবাদ কার্যেও দক্ষ। ত্রিপুরা দর্শনের 'শৈশব' বিভাগের সঙ্গে যুক্ত।

সোমা গঙ্গোপাধ্যায় : পেশায় শিক্ষিকা। পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখা প্রকাশিত হয়। গল্পই লেখেন বেশি।

জহর দেবনাথ : বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছোটোদের জন্য নিয়মিত লিখে থাকেন। একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'জালনোটের বেড়াজাল'। ত্রিপুরার ধলাই জেলার বাসিন্দা।

নন্দকুমার দেববর্মা : জন্ম ১৯৫০। মূলত বড়োদের জন্য লিখলেও মাঝে মাঝে ছোটোদের জন্যও লিখে থাকেন। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস গ্রন্থ 'ঠিকানা ফিরাতভূমি'। কবিতার পাশাপাশি তিনি বহু নাটকও লিখেছেন। 'গীতা', 'ছোটোদের মহাভারত' তিনি বাংলা থেকে ককবরকে অনুবাদ করেছেন। গীতিকার এবং সুরকার হিসাবেও তাঁর পরিচিতি রয়েছে। ২০০২ সালের রবীন্দ্রপুরস্কার লাভ করেন।

পারুল দাশ : ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য শিশুসাহিত্য পত্রিকা 'কাকলি'র সম্পাদিকা। বর্তমানে রাজ্যের অনেক প্রতিষ্ঠিত লেখকের একদা হাতেখড়ি হয়েছিল 'কাকলি'তে। তিনি নিজেও নিয়মিত ছোটোদের জন্য লিখেছেন।

পান্নালাল রায় : জন্ম ১৯৫৪। ত্রিপুরার কৈলাসহরে। প্রাবন্ধিক হিসাবে সুপরিচিত। এক সময় ত্রিপুরার দৈনিক সংবাদের সঙ্গে সাংবাদিক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। এখন ত্রিপুরার তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরে কর্মরত। এ পর্যন্ত নয়টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি—শচীনকর্তা, রবীন্দ্রনাথের ত্রিপুরা, রানি কাহিনি, ও সজনী গো প্রভৃতি।

রূপকথা-লোককথা

শ্যামলাল দেববর্মা : জন্ম ১৯৫১। কক্‌বরক্ ভাষায় সাহিত্যচর্চায় তাঁর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে বাংলাতেও ছোটোদের ও বড়োদের জন্য লিখে থাকেন। প্রকাশিত গ্রন্থ—দুন দুবুকথা (গল্প সংকলন), চবা কায়সানি, উল (গল্প সংকলন), আদঙ (সম্পাদিত গল্প সংকলন), বেংসৌনাল (নাটক), খঙ (উপন্যাস), চিংচং চিংচং মাচিং চং (ছড়া) ও কাতাং বাঁতাং (ছড়া)। সলিলকৃষ্ণ দেববর্মণ স্মৃতি পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার, ত্রিপুরা রত্ন সম্মান লাভ করেছেন।

রমেন্দ্রনারায়ণ সেন : বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বড়োদের জন্য লেখার পাশাপাশি ছোটোদের জন্যও লিখে থাকেন। ত্রিপুরার লোককথা নিয়ে তাঁর লেখা পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছে।

নির্মল দাশ : জন্ম ১৯৫৯। পেশায় শিক্ষক। লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গবেষক। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখছেন। ছোটোদের জন্যও লিখে থাকেন। একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো 'ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', 'ত্রিপুরার লোককথা'।

নিরঞ্জন চাকমা : জন্মস্থান উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর। ত্রিপুরার বিশিষ্ট প্রবন্ধকার। ভাষা, নৃতত্ত্ব, সংস্কৃতি, লোকজীবন বিষয়ে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখছেন। চাকমা ভাষায় কবিতাও লিখে থাকেন। ছোটোদের জন্যও মাঝেমধ্যে লেখেন।

কবিতা

অনঙ্গমোহিনী দেবী : মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা। সে যুগের বিশিষ্ট কবি। জানা যায়, পিতা মহারাজার

বিশেষ অনুপ্রেরণাতেই রাজকুমারী কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'কণিকা, 'শোকগাথা', 'প্রীতি'।

গিরিজানাথ চক্রবর্তী : এক সময় প্রায় নিয়মিত পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বড়োদের জন্য লেখার পাশাপাশি ছোটোদের জন্যও লিখেছেন।

হরেন ঘটক : জন্ম ১৯০৪। মৃত্যু ১৯৯৩। শিশুসাহিত্যে নিবেদিত প্রাণ। সারাজীবন ধরে শুধুই ছোটোদের জন্য লিখেছেন। এক সময়ে যুগান্তরের ছোটোদের পাততাড়ি বিভাগের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। যুগান্তর থেকে অবসর গ্রহণের পর যোগ দেন সত্যযুগে। সত্যযুগের নয়া পাঠশালা বিভাগের তিনি ছিলেন পরিচালক। প্রকাশিত গ্রন্থ— মাছরাঙা, টুনটুনি, টাপুরটুপুর, আহাম্মক দি গ্রেট প্রভৃতি। শিশুসাহিত্যে রাষ্ট্রীয় ও বিদ্যাসাগর পুরস্কার লাভ করেন।

অজয় ভট্টাচার্য : জন্ম ১৯০৬। মৃত্যু ১৯৪৩। কবি, গীতিকার, নাট্যকার ও চিত্র পরিচালক। তাঁর গানে সুর দিয়েছিলেন শচীন দেববর্মন। রচিত গানের সংখ্যা প্রায় দু-হাজার। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ—রাতের রূপকথা, ঈগল ও অন্যান্য কবিতা। পূর্বাশা সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টচার্য তাঁর অনুজ।

চুনী দাশ : জন্ম ১৯৩৬। ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ছোটোদের ত্রৈমাসিক 'কাকলির' পরিচালনা করেছেন। ছোটোদের জন্য নিয়মিত লিখছেন। উল্লেখযোগ্য বই 'টুকির জন্য ছড়া', 'পরির দেশের ছড়া', 'মানুষের জন্য ছড়া'। ত্রিপুরার শিশুসাহিত্যে তাঁব উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

করবী দেববর্মণ : জন্ম ১৯৩২। ছাত্রাবস্থাতেই সাহিত্যচর্চা শুরু। প্রকাশিত গ্রন্থ—লুণ্ঠিত সময় সীতা, মেরুদণ্ড দাও, কবিতা আমার সময় অসময়, কিছু স্বগতোক্তি কিছু ব্যাক্তিগত সংলাপ প্রভৃতি।

অপরাজিতা রায় : জন্ম ১৯২৯, কবি, প্রাবন্ধিক ও ছড়াকার। ছোটোদের জন্যে গল্পও লেখেন। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—বাইরে বাউল, ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা, দ্বিতীয় শরীর ইত্যাদি। অনেক সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন, পেয়েছেন ত্রিপুরা সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কার।

অনিল সরকার : জন্ম-১৯৩৯। বিশিষ্ট কবি। বড়োদের পাশাপাশি ছোটোদের জন্যও লিখে চলেছেন। এ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা চোদ্দ। এছাড়াও রয়েছে ছড়া, কবিতার বহু ফোল্ডার। রাজ্য বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার প্রবীণতম সদস্য। বর্তমানে তথ্যসংস্কৃতি ও পর্যটন ইত্যাদি দপ্তরের মন্ত্রি। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ : স্বনির্বাচিত কবিতা, শতপুষ্প, প্রিজন ভ্যান, শেষ পর্যটন, ব্রাত্যজনের কবিতা, বন থেকে এল টিয়া, রসমালাই প্রভৃতি।

বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী : জন্ম ১৯৫৩। ত্রিপুরার শিশুসাহিত্যের একটি উজ্জ্বল নাম। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'ঝিনুক'। মূলত ছোটোদের জন্য লিখে থাকেন। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা আঠারো। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি—রাবণরাজা, ঘুমভাঙা নদী, রেলের চাকা ঝমঝম প্রভৃতি।

প্রত্যূষ দেব : মূলত কবিতা লেখেন। ছোটোদের জন্যেও ছড়া-কবিতা লেখেন। পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখা প্রকাশিত হয়।

সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় : জন্ম ১৯৪৮। মূলত কবি। 'স্পন্দন' সাহিত্যপত্রের সম্পাদক। ছোটোদের জন্যেও নিয়মিত লেখেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—'ভালোবাসার চাতাল জুড়ে, 'সোজা কথার সহজপাঠ' প্রভৃতি। অকালে প্রয়াত হয়েছেন তিনি।

অনিলকুমার নাথ : জন্ম ১৯৪৬। মূলত কবি। নিয়মিত ছড়াও লিখে থাকেন। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ—আর এক পৃথিবী, সুজনেরা শোনো ও কৃষ্ণচূড়া সাক্ষী থেকো।

অমল চক্রবর্তী : জন্ম ১৯৬৪ সাল। মূলত ছোটোদের জন্যে লিখে থাকেন। নানাধরনের লেখা-লিখলেও ছড়া-কবিতা রচনাতেই সিদ্ধহস্ত।

কৃষ্ণধন নাথ : জন্ম ১৩৫৪ বাংলা। কবিতা, ছড়া, গল্প, প্রবন্ধ নিয়মিত লেখেন। বেশ কয়েকটি বই বেরিয়েছে। 'ইলচা চিলচা' উল্লেখযোগ্য বই।

ফুল্লরা ধর : জন্ম ১৯৫৩। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখে থাকেন। প্রকাশিত গ্রন্থ—সারারাত জেগে থেকে।

রণেন্দ্রনাথ দেব : জন্ম ১৩৩৩। প্রাবন্ধিক। ছোটোদের জন্যেও বহু গল্প লিখেছেন। 'শ্রীহট্ট পরিচয়' তাঁর লেখা সমাদৃত গ্রন্থ।

দক্ষিণারঞ্জন চক্রবর্তী : পেশায় ছিলেন শিক্ষক। এক সময়ে পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। 'উদিতি'র—ছোটোদের বিভাগের পরিচালক ছিলেন। প্রয়াত হয়েছেন তিনি।

সুব্রত দেব : জন্ম ১৯৪৬। নিয়মিত ছড়া-কবিতা লিখে থাকেন। এ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা সাত। এর মধ্যে পাঁচটি ছড়া সংকলন—বকবকম, টরে টক্কা, ব্যালসিস্টি, চাবি, রঙবেরঙ। কবিতা সংকলন—পাসপোর্ট, গল্প সংকলন—জীয়ন কাঠি। পেশায় ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার।

বিজয়কুমার দেববর্মণ ঃ প্রাবন্ধিক, কবি, গল্পকার। ভারত সরকারের অধীনে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর ছিলেন। চাকুরিকালে দেশের প্রতিনিধি হিসাবে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানি, নরওয়ে, জর্ডন প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেছেন।

দিলীপ দাস ঃ জন্ম ১৯৫৩। মূলত কবি। কলেজজীবনে সাহিত্যকর্মের সূত্রপাত। এক সময় 'জ্বালা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তী সময়ে 'সংশপ্তক' সম্পাদনা করেন। মূলতঃ বড়োদের জন্য লিখলেও মাঝে মাঝে ছোটোদের জন্য লিখে থাকেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি —সময় ছুটছে, সহযোদ্ধা, জল ছুঁয়ে আছে এপার ওপার প্রভৃতি।

রাখাল রায়চৌধুরী ঃ জন্ম ১৯২৮। ছোটোদের জন্য গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ছড়া, নাটক সবই লিখে থাকেন। রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করেন ১৯৯৩ সালে। প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে অন্ধকারের গর্ভ থেকে, শতপুষ্প, উন্মেষ, তিন হাটে বিকিয়ে যাই, তিন ভুবনে, তৃষ্ণা, খুকুর ছড়া, ছড়া বিচিত্রা, সন্ধ্যা সৈকতে একা যখন প্রভৃতি।

শ্যামলকান্তি দে ঃ জন্ম ১৯৬৫। উত্তর ত্রিপুরার জেলাসদর কৈলাসহরের বাসিন্দা। ১৯৮০ সাল থেকে লেখালেখি করছেন। বড়োদের পাশাপাশি ছোটোদের জন্যও নিয়মিত লিখে থাকেন।

স্বপন সেনগুপ্ত ঃ মূলত কবি। স্কুলজীবন থেকেই সাহিত্যচর্চার শুরু। 'নান্দীমুখ' পত্রিকার সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ— নীলাকাশ পাখি, লাল ঘাসে নীল ঘোড়া, ধুলোমাখা পিঁড়িতে একাকি, এ আমার ভিখিরি হাত নয় যুগলবন্দী তুফান। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী।

দেবীস্মিতা দেব ঃ জন্ম ১৯৮১। প্রকাশিত গ্রন্থ—হা রে রে রে (ছড়া সংকলন) পেয়েছেন শৈশব পুরস্কার, শিশুমহল পুরস্কার।

প্রভাসচন্দ্র ধর ঃ জন্ম ১৯৪০। জীবনের বড়ো অংশই ত্রিপুরী জনগণের ভাষা 'কক্‌বরক্‌'-এর সাধনায় ব্যয় করেছেন। কক্‌বরক্‌ রামায়ণ অনুবাদ করেছেন। ইংরেজিতে করেছেন ভাষান্তর। 'শ্রীরাজমালা' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—'উলটপুরাণের দেশ আমেরিকার কথা'।

জ্যোতির্ময় দাস ঃ তরুণ ছড়াকার। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত ছড়া প্রকাশিত হচ্ছে। আগরতলার যোগেন্দ্রনগরের বাসিন্দা।

অশোক দেববর্মা ঃ অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারি পদস্থ আধিকারিক ছড়া কবিতা নিয়মিত লেখেন। এখন পর্যন্ত দুটো ছড়ার বই প্রকাশিত হয়েছে। ছোটোদের ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য বই।

দিনেশ দেবনাথ ঃ জন্ম ১৯৫৭। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, লিখে থাকেন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখা প্রকাশিত হয়। মূলত বড়োদের জন্য লিখলেও মাঝেমাঝে ছোটোদের জন্যও লিখে থাকেন। বর্তমানে তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরে বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক পদে কর্মরত।

নাটক

অগ্নিকুমার আচার্য ঃ জন্ম ১৯৩৪। সাহিত্যের নানা শাখায় বিচরণ করেন। গান, নাটক, প্রবন্ধ, ছোটোগল্পের পাশাপাশি ছোটোদের জন্যও নিয়মিত লেখেন। দূরদর্শনের জন্য তথ্যচিত্র ও টেলিফিল্ম তৈরি করেছেন। পেয়েছেন রাষ্ট্রপতি-পদক।

হীরেন সিন্‌হা ঃ মূলত নাট্যকার। নাটক রচনার জন্য নানা পুরস্কারও লাভ করেছেন। মাঝেমধ্যে ছোটোদের জন্যও লিখে থাকেন।

বিজ্ঞান

শ্যামল চক্রবর্তী ঃ জন্ম ১৯৫৭। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান-চেতনা জাগাতে সতত সক্রিয়। বিজ্ঞান-বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। পেয়েছেন বেশ কয়েকটি পুরস্কার।

পীযূষকান্তি পাল ঃ জন্ম ১৯৪৩। বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ নিয়মিত লিখে থাকেন। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা চোদ্দ। ত্রিপুরা সরকারের বহু উচ্চপদে আসীন ছিলেন। গবেষণা কর্মে স্বীকৃতি স্বরূপ ডক্টরেট ডিগ্রিতে ভূষিত হয়েছেন।

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ জন্ম ১৯৬৪, হাওড়ার সালকিয়ায়। এই সময়ের সুখ্যাত শিশুসাহিত্যিক। ছড়া-কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত, ছোটোদের জন্য গল্প-উপন্যাসও লেখেন। শিশুসাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু গবেষক। অবনীন্দ্রনাথের ওপর ডক্টরেট। ছড়া নিয়ে গবেষণা করে পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি ডি-লিট। শিশুসাহিত্যের হারানো মণিমাণিক্য, বিস্মৃত ঐতিহ্যের সঙ্গে একালের পাঠকের পরিচয় ঘটাতে সতত সক্রিয়। বেশ কয়েকটি দুর্লভ গ্রন্থ পুনরুদ্ধার ও সম্পাদনা করেছেন। অবনীন্দ্রনাথের দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি 'স্বপ্নের মোড়ক' তাঁরই আবিষ্কার। রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা সত্তরেরও বেশি। পেয়েছেন বেশ কিছু পুরস্কার ও স্বীকৃতি।
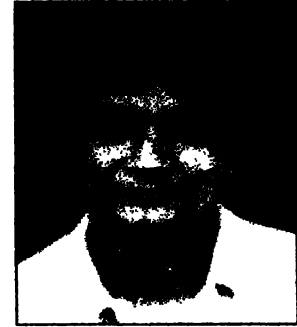
পান্নালাল রায় ঃ জন্ম ১৯৫৪, ত্রিপুরার কৈলাসহর। প্রাবন্ধিক হিসাবে ত্রিপুরায় সুপরিচিত। স্কুলজীবন থেকেই লেখালেখির সূচনা। কিশোর-বয়সে বসুমতী পত্রিকার ছোটদের পাতায় নিয়মিত লিখতেন। পরবর্তীকালে যুগান্তরেও অনেক লিখেছেন। এক সময় ত্রিপুরার দৈনিক সংবাদের সঙ্গে সাংবাদিক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। এখন ত্রিপুরার তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরে কর্মরত। এ পর্যন্ত নয়টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি— শচীনকর্তা, রবীন্দ্রনাথের ত্রিপুরা, রানি কাহিনি, ও সজনী গো প্রভৃতি।